চলনবিলের পদাবলী

শফীউদ্দীন সরদার

চলন বিলের পদাবলী

শফীউদ্দীন সরদার

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

চলন বিলের পদাবলী

শফীউদ্দীন সরদার

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ -অগস্ট-২০১২

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ২০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০১
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

CHALAN BILER PADABOLI Writen by: SHAFIUDDIN SARDER, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.200.00 US : 5/- **ISBN. 984-493-076-6**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মাদার গানের ভক্ত ভাই
মরহুম তফিরউদ্দীন সরদারকে

শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

চলন বিলের ভৌগলিক বিবরণ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ সাহেবের "চলন বিলের ইতিকথা" গ্রন্থটি আমাকে বেশ খানিকটা সাহায্য করেছে। এজন্যে তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্রায় তিনশত বছর আগের চলনবিল এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এটি একটি উপখ্যান ধর্মী উপন্যাস। আসলে এও একটি ইতিহাস, একটি প্রামান্য চিত্র। তৎকালীন চলন বিলের এটি একটি হুবহু প্রতিচ্ছবি। লেখক এখানে একজন ফটোগ্রাফার মাত্র। তথ্যে, কাহিনীতে ও জনশ্রুতিতে যা এসেছে, লেখকরে কলমে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকের নিজের কোন হাত নেই এখানে। নেই কোন ইচ্ছে অনেচ্ছার বালাই।

শফীউদ্দীন সরদার
লেখক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জীবন প্রবাহের গতিময়তায় বিদগ্ধ মননের সাবলীল তন্ময়তায় চিন্তাশীলদের চেতনার স্ফুরণ ঘটে সাহিত্যের আঙ্গিকে উপন্যাস নামক উপস্থাপনায়। দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণক্ষম এরূপ চেতনা থেকেই একটি সুন্দরতর প্রায়গিক প্রয়াস চলনবিলের পদাবলী ঐতিহাসিক উপন্যাসটি।

লেখক শফিউদ্দীন সরদার সাহিত্যের চলমান আঙ্গিকের গতানুগতিক তথাকথিক আধুনিকতার বিলাস প্রবনতার কল্পনা সুন্দর প্রয়াসকে পাশে ঠেলে দেশ ও জাতির চির সুন্দরতর ঐতিহ্য আঙ্গিকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ধারণে সৌষ্ঠবময় ঔপন্যাসিক উপস্থাপনায় আমাদের জাতীয় চেতনাকে পাঠকের মনোদর্পনে প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করণ সহ প্রতিটি পাঠকের চিন্তার সহজাত চাহিদা পুরণের সৌকর্যময় দোলায় আন্দোলিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন বলেই পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন বলে আমরা আশাবাদি।

সাহিত্যের সম্ভাবনাময় সম্ভার মেলায় চলন বিলের পদাবলী উপন্যাসটি বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটির সংযোজন উপন্যাস পাঠক মাত্রই জাতীয় ঐতিহ্যগত চেতনায় পুলকিত হবেন বলে আমাদের সহজাত ধারণা।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

চলন বিলের পদাবলী

[এক]

ছুটে আসছে। তীর বেগে ছুটে আসছে। চলন বিলের বুক চিরে একটানা ছুটে আসছে লাল মিয়ার ছিপ্ নৌকা। একতালে বৈঠা মারছে লাল মিয়ার শক্ত শক্ত জোয়ান জোয়ান সঙ্গীরা। কণ্ঠে তাদের নৌকা বাইচের গানঃ "হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা-"।

অনেক দিন আগের কথা। নবাবী আমল শেষ হয়েছে। বাংলার বুকে জোরেশোরেই চেপে বসেছে ইংরেজ। বাংলার বিদ্রোহ আপাততঃ শান্ত। শেষ হয়েছে ফকিরদের হামলা। সতেরশো ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষও বাংলার মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। আবার ধান উঠেছে গৃহস্তের গোলায়। গান ফুটেছে রসিক জনের কণ্ঠে। বারো মাসে তের পার্বনের মাঝে গ্রাম বাংলার মানুষ আবার মন দিয়েছে চিরন্তন দিন যাপনে।

ঝড়-ঝাপটা থেমে যাওয়ায় ইংরেজদের হাতে এসেছে অখন্ড অবসর। তারা এবার শাসন ব্যবস্থা শক্ত করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। একেবারেই আলাদা এই ভাবভাষার দেশে শাসনভার হাতে নিয়ে ঘেমে উঠে ইংরেজেরা। প্রথম দিকে তাদের অবস্থা হয় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। ইংল্যান্ডের প্রচলিত রীতিনীতি এই নদীনালা বিল-হাওরের দেশে খেই খুঁজে পায়না। ফলে, নবাবী আমলের শেষ আর ইংরেজ আমলের শুরুর সন্ধিক্ষণে বাংলার বুকে নেমে আসে নিঃসীম নৈরাজ্য। সারাদেশে বিরাজ করে নজীরবিহীন অরাজকতা। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের নাম-গন্ধও গ্রাম বাংলার গাহিনে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর পুরোপুরি সুযোগ নেয় দুবৃত্তেরা। সমাজের দুষ্টক্ষত দুরাচার লোকেরা। তারা লিপ্ত হয় লুটতরাজে। দেখা দেখি অন্যেরাও আকৃষ্ট হয় এই কাজে। তরতর করে বেড়ে যায় চোর ডাকাত আর লুটেরার সংখ্যা। কালগ্রাসী ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও আরো শতগুণে বাড়িয়ে দেয় ডাকাত দস্যুর দল। ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জরিত মানুষ অন্য কোন পথ না পেয়ে প্রবৃত্ত হয় লুণ্ঠনে। প্রকাশ্য দিবালোকে চলতে থাকে লুটতরাজ। লুটতরাজ চলতে থাকে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র। চলতে থাকে চুরি ডাকাতি রাহাজানী। খুন জখমও একটা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে দস্যুবৃত্তিকে একটি অর্থকরী পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অনেক উচ্ছৃঙ্খল ও কর্ম বিমুখ মানুষ। প্রকাশ্য লোকালয়ে বসতি স্থাপন করে ডাকাত দস্যুর দল। যখন তখন চড়াও হয় শান্তি প্রিয় গৃহস্তের বাড়ীতে। লুটে আনে সে অভাগার সর্বস্ব। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের লেশমাত্রও গ্রাম গঞ্জে না থাকায়, গ্রাম বাসীরা বড়ই অসহায় হয়ে পড়ে। এই সংঘবদ্ধ

www.pathagar.com

ডাকাত দস্যুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধই কেউ গড়ে তুলতে সাহসী হয়না। ভয়ে সবাই অহোরাত্র কাঁপে, মুখফুটে কিছুই বলতে পারেনা। সকলের সামনে দিয়ে ডাকাত দস্যুরা সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় সদম্ভে।

ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থা শক্ত হওয়ার পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। লোকালয় ত্যাগ করে ডাকাত দস্যু লুটেরারা ক্রমশঃই প্রত্যন্ত এলাকায় সরে আসতে থাকে। শেষ অবধি তারা এসে আশ্রয় নেয় দুর্গম এলাকায়। ডেরা খোলে অরণ্যে ও সুবিশাল বিল হাওড়ে। এদের উপর ইংরেজদের নজর সর্বদাই সজাগ। ফকিরদের হামলা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ হয়নি সে হামলার আতংক। বিশুষ্ক তটিনীর ক্ষীণ ধারার মতো সে আতংক তখনও তির তির করে বইছে কোম্পানীর আমলাদের হৃদপিন্ডের গভীরে। কোন হাঙ্গামার খবর এলেই আঁতকে উঠে তারা। ভাবে-এই বুঝি ফকির এলো। জনগণের কল্যানে নয়, একারণেই তাই ডাকাত দস্যু দমনে তৎপর হয় তারা। কে জানে, চোর ডাকাতের আবরণে আবার কোন আপদ এসে ঘাড় মটকায় তাদের। ডাকাত দস্যুর খবর পেলেই হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায় কোম্পানীর আমলারা। সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে দস্যুদের ধাওয়া করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

কিন্তু এতটার পরও ডাকাত দস্যুর দলকে তারা বাগে আনতে পারে না। প্রবেশ করতে পারে না তাদের দুর্গম ডেরায়। এদের পেছনে ইংরেজদের সচেষ্ট থাকতে হয় দীর্ঘকাল। নদী নালা, বনজঙ্গল আর বিল হাওরের দেশ এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ। এর এক একটি অঞ্চল দুর্গম ও বিপদ সংকুল। পলাশীর জয় দিয়ে ইংরেজেরা এসব অঞ্চল জয় করতে পারে না। তাদের সামনে অনেক অঞ্চল দুর্জেয় থেকে যায় দীর্ঘদিন।

চলন বিল বাংলার বুকে এমনি এক দুর্জেয় ভূখন্ড। এক দুর্গম এলাকা ও দুস্তর অঞ্চল। ডাকাত-দস্যু-দুর্জনদের নিরাপদ আস্তানা। এ বিলে গা এলালে তাকে খুঁজে পায় সাধ্য কার।

রাজশাহী জেলার সদর তখন নাটোর। চলন বিলকে নিয়ে সে সময় দুর্ভাবনার শেষ ছিলনা নাটোরের ইংরেজ সুপার ভাইজার আর কালেক্টারদের। চলন বিলকে বাগে আনতে তাদের বেগ পেতে হয় প্রচুর। ব্যয় করতে হয় কষ্টবহুল সুদীর্ঘ সময়। বিল চলনের চোর ডাকাতের উৎপাত ইংরেজ প্রশাসনের এক চরম বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এদের পেছনে প্রশাসনকে একদল সশস্ত্র সেপাই নিয়োগ করে রাখতে হয় সার্বক্ষণিকভাবে।

এই ডাকাত দস্যুদের অনেকেই আজও অমর হয়ে আছে জনশ্রুতিতে। স্থান পেয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এদের কারো কারো কাহিনী বড়ই রোমাঞ্চকর। বাহবা ও প্রশংসার হকদার। কারো কারো কাহিনী ঘৃণ্য ও কলংকময়। মুঘল আমল থেকেই এদের সদম্ভ অস্তিত্ব এই চলন বিলে বিদ্যমান। বাংলার রাজস্ব চলন বিল পাড়ি দিয়ে দিল্লীর রাজকোষে পৌছানো মস্ত বড় সমস্যা ছিল তৎকালে। দশটার পাঁচটাও ঠিকমতো পৌছানো সহজ সাধ্য ছিল না। অথচ পথ এই একটাই। এই

www.pathagar.com

চলন বিলের উপর দিয়ে। চলন বিলের ডাকাতেরা অহর্নিশ ওঁৎপেতে থাকতো আর লুটে নিতো দিল্লীর বাদশাহর সম্পদ।

এই ডাকাত দস্যুর দলে কেবল সমাজ বিরোধী দুর্জনেরাই ছিলনা। কিছু রাজা জমিদার আর বিত্তবান লোকেরাও অর্থকরী পেশা হিসাবে বেছে নিতো এই কাজ। লিপ্ত হতো ডাকাতিতে। ইংরেজদের আগেও তাই নবাব-বাদশাহ-সুবাদারদের মাঝে মাঝেই ফৌজ হাঁকাতে হতো চলনবিলের ডাকাতদের বিরুদ্ধে।

চলন বিল। হিন্দু-বৌদ্ধ মুঘল-পাঠানের বহু ইতিহাস বিজড়িত চলন বিল। এর জলরাশি কোন সময় স্থির হয়ে থাকেনি এক জায়গায়। চলতেই থাকে অবিরাম। তাই এই বিলের নাম চলন বিল। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া এই তিন জেলার এক একটা বিশাল বিশাল অংশ জুড়ে তৎকালীন এই চলন বিলের বিস্তৃতি। রৌদ্রদগ্ধ নিদাঘের নিদারুণ মৌসুমেও মাইলের পর মাইল থৈ থৈ করে চলনবিলের পানি। তলহীন অন্তহীন। এককালে তিন জেলার এই সুবিশাল এলাকাটা গোটাই খরা বর্ষা সব সময় জল মগ্ন থাকতো। যুক্তছিল বঙ্গোপসাগরের সাথে। এখানে এসে পদ্মা-যমুনা এক হয়ে ঢেলে পড়তো সাগরে।

এই বিল তখন বিল নয়, সাগর। কালীদহ সাগর। কেউ বলে ক্ষীরনদী সাগর। এ সাগরে তখন আর ঐ লাল মিয়াদের ছিপ্ নৌকা ছুটতোনা। "হাঁইয়ো মারো রে ও ভাইয়েরা", বলে উৎফুল্ল গান কারো মুখে ফুটতো না। এ সাগরে এসে চুপ্‌সে যেতো মুখ সবার। মনে জপতো ইষ্টনাম। মুখে বলতো বদর বদর। বদর পীরের সাহায্য মাঙ্গতো এই বিষম দরিয়া পাড়ি দিতে।

এই সাগরে ভাসতো তখন বড় বড় বাণিজ্য যান। ময়ূর-পঙ্খী ডিঙ্গার বহর। কিংবদন্তির ধনাই সওদাগরের ডিঙ্গা ভাসতো এই সাগরে। চম্পক নগরের ধনমন্ত, ওরফে ধনাই সওদাগর। চম্পক নগর বগুড়া জেলায় অবস্থিত ছিল এমনই অনুমান। ধনাই সওদাগর লংকার বাণিজ্যে যেতেন এই কালীদহ সাগর পেরিয়ে। তাকে নিয়ে আজও আছে লোকগীতি। বিলুপ্ত প্রায় হলেও আজও আছে জের তার। দুই স্ত্রী এই ধনাই ওরফে ধনমন্ত সওদাগরের। আপন দুইবোন ললনা ও খুলনা তাঁর স্ত্রী। ললনাকে বিবাহ করার কিছুকাল পরে ললনার ছোট বোন খুলনাকেও বিবাহ করেন সওদাগর। কিন্তু বোন সতীনের ঘরে এসে নিদারুণ দুঃখে পড়ে খুলনা। বড় বোন ললনার একচ্ছত্র প্রতিপত্তি সওদাগরের সংসারে। তাই সওদাগরের অনুপস্থিতির সময় বড় বোন যারপর নেই নির্যাতন চালায় ছোট বোনের উপর। এর একটি কারণ, খুলনার গর্ভে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। সওদাগর তার নাম রাখেন শ্রীমন্ত সওদাগর। বন্ধ্যা ললনা খুলনার এই সৌভাগ্য সহ্য করতে পারেনা। জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। আক্রোশ চরিতার্থের মওকা খুঁজতে থাকে সে। মওকাও এসে যায় অচিরেই। কথিত আছে, লংকার বাণিজ্যে গিয়ে এক সময় লংকার রাজা শালী বাহনের সাথে সংঘর্ষ হয় ধনমন্ত সওদাগরের। সেই সংঘর্ষে শালীবাহনের হাতে বন্দী হন ধনমন্ত সওদাগর। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে বন্দী ধনমন্তকে কারারুদ্ধ করে রাখেন লংকার রাজা শালী বাহন।

www.pathagar.com

সওদাগরের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময় বড় বোন ললনা ছোট বোন খুলনার উপর গায়ের ঝাল আচ্ছামতো ঝাড়তে থাকে। খাস মহল থেকে বের করে দাসীর দলে ভর্তি করে খুলনাকে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটায় সকাল সন্ধ্যা অষ্টপ্রহর। এতেও তৃপ্তি হয় না ললনার। প্রাসাদ থেকে উচ্ছেদ করে খুলনাকে স্থান দেয় পশুশালায়। কাজ দেয় ছাগল চরানোর। মাঠে গিয়ে ছাগল চরাতে হয় তাকে। ছাগল চরায় আর খুলনা রানী কেঁদে কেঁদে গায়-

"হায় কপালে এই ছিল, ছাগল চরাতে রে হলো।
নাইকো মাতা নাইকো পিতা নাইকো সুদ্দের ভাই,
বোন সতীনের ঘরে আমার দুঃখের সীমা নাই।
হায় কপালে এই ছিল, ছাগল চরাতে রে হলো॥"

এই গানের কলি আজও শোনা যায় চলন বিলের নানা স্থানে। শোনা যায় বাংলা দেশের আরো অনেক অঞ্চলেও।

কালক্রমে বড় হয় খুলনার পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর। পিতা ধনমন্ত সওদাগর লংকায় বন্দী আছে খবর পেয়ে, বীরপুত্র শ্রীমন্ত স্থির থাকতে পারে না। ডিঙ্গার বহর ভাসিয়ে সেও যায় লংকার বাণিজ্যে। উদ্দেশ্য পিতাকে উদ্ধার করা। লংকায় গিয়ে সদলবলে আক্রমণ করে শালী বাহনকে। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হয় শালী বাহন। পিতাকে মুক্ত করে বন্দী শালী বাহন সহ দেশে ফেরার উদ্যোগ করে শ্রীমন্ত সওদাগর। নিরূপায় শালীবাহন তাঁর একমাত্র কন্যাকে শ্রীমন্তের সাথে বিয়ে দিয়ে মুক্তি ভিক্ষা করে নেয়। অতঃপর পিতাপুত্র দেশে ফিরে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে দুষ্টমতি ললনার।

এই দীর্ঘ কাহিনীর ভাসা ভাসা অস্তিত্ব চলন বিল এলাকায় আজও বিদ্যমান। এই কালীদহ সাগর নামটাও টিকে আছে ধনমন্ত ওরফে ধনাই সওদাগরের বাণিজ্যকে ঘিরে। গায়কেরা আজও গায় "দক্ষিণে বন্দনা করি কালীদহ সাগর, সেই সাগরে বাণিজ্ করে ধনাই সওদাগর।"

কিংবদন্তি শেষ হয় না এখানেই। শেষ হয়না ধনাই সওদাগরের সাথেই। ধনাই সওদাগরের উত্তর পুরুষ চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যানেও চলনবিলের এই কালীদহ নাম জীবন্ত হয়ে আছে। কিংবদন্তির চন্দ্রকান্ত সওদাগর ওরফে চাঁদ "সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর" তলিয়ে যায় এই সাগরে। কথিত আছে, সাপের দেবী পদ্মাবতী বা মনসার আক্রোশেই ডুবে যায় তাঁর সপ্তডিঙ্গা মধুকর। চন্দ্রকান্তের পূজা চায় মনসা। চন্দ্রকান্ত তাতে রাজী না হওয়ায় পদ্মাবতী এই প্রতিশোধ নেয়। প্রতিশোধটা থেমে থাকে না এখানেই। চন্দ্রকান্ত তথা চাঁদ সওদাগরের সাতটা পুত্রেরও সে সলিল সমাধি ঘটায় এই কালীদহ সাগরে। এই প্রতিহিংসার জের চলে চন্দ্রকান্তের শেষ সন্তান লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত। এই কিংবদন্তির অবসান ঘটে মৃত স্বামী লক্ষ্মীন্দরসহ বেহুলার ভেলায় ভাসা কাহিনী নিয়ে।

www.pathagar.com

এই সব উপাখ্যানের পেছনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকলেও, চম্পকনগর ও এই সব সওদাগরদের অস্তিত্বের কথা লোকগীতি ও জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাসমতে তারা এ অঞ্চলেরই লোক। ছোটখাটো ঐতিহাসিক নিদর্শনও বিদ্যমান। চলন বিলের কিছু স্থানের নামকরণও এই সব উপাখ্যানের সাথে সম্পৃক্ত।

থাক সে কথা। আসল কথা, এই সব কিংবদন্তির উত্তর কালেও চলন বিল বিল নয়, বিশাল এক দরিয়া বা জলভাগ। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ঈশায়ী সপ্তম শতাব্দিতে বগুড়ার মহাস্তান গড় থেকে এই দরিয়া পেরিয়েই আসামের কামরূপে পৌঁছেন। চলন বিল তখনও জাগেনি। লোক বসতি শুরু হয়নি বিশাল এই জলমগ্ন এলাকায়। লোকবসতি শুরু হয়েছে অনেক অনেক পরে। অনেক অনেক পরে মূল বিলের ইতি উতি চরপড়ে সৃষ্টি হয়েছে ছোটবড় হরেক রকম উপবিল। চর এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি। অধিকতর উচু জায়গায় স্থাপিত হয়েছে লোক বসতি। গড়ে উঠেছে গ্রামগঞ্জ। কোনটা পাশাপাশি, কোনটা বা বিচ্ছিন্ন। চলন বিলের এই বিপুল জলরাশির উৎস নানা নামের ছোট বড় নদনদী। বিভিন্ন দিক থেকে এই নদ নদীগুলো ধেয়ে এসেছে চলন বিলের দিকে। বিলের কোলে মাথা রেখে হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। এক হয়ে মিশে গেছে সেই বিশাল জলধারায়। এই নদ নদীরও তীরে তীরে গড়ে উঠেছে জনবসতি। বাঁকে বাঁকে হাট বাজার।

বিশুষ্ক মৌসুমে কিছুটা স্থবিরতা নেমে আসে চলন বিলের অঙ্গে। ধীর হয় জলস্রোত, শান্ত হয় ঊর্মি। অগভীর এলাকায় ধীরে ধীরে মাথা তুলে নল-খাগ্ড়া। জেগে উঠে দল দাম। নিরাপদ বিবেচনায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে চলন বিলের আকাশে। ধারে কিনারে মাছ খোঁজে জন্মগত মৎসজীবি। সারি সারি- নৌকা চলে পূব- পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ।

কিন্তু বর্ষাকালের চলনবিল মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর, তখন তার উত্তাল তরঙ্গ স্পর্শ করে আকাশ। তার বিপুল গর্জন বধির করে শ্রবনেন্দ্রিয়। ঘুর্ণীয়মান জলস্রাত পাকে পাকে সৃষ্টি করে পাতালগামী মৃত্যুকূপ। জলরাশির বিস্তৃতি দিগন্তে ঢেকে যায় আকাশের ঢালে। এ সময়ে লুপ্ত হয় মাঝি-মাল্লার দিক-নির্ণয় শক্তি। বস্তুতঃ চলনবিল বিল থাকে না তখন। চলনবিল তখন এক সীমাহীন সাগর। এ সাগরে নাও ভাসানোর কথায় কেঁপে উঠে পাষন্ডেরও হৃদপিন্ড।

বর্ষাকালের গ্রামগঞ্জ টিম টিম করে ভাসতে থাকে মূল বিলের চার দিকে। মূল বিলের বহু দূরে। ভাসতে থাকে নদীকুলের লোক বসতি। ভাসতে থাকে আঁকে-বাঁকের গোলা-গঞ্জ। এক একটা এলাকা এক একটা দ্বীপ হয়ে যায় তখন। একটার সাথে অন্যটার হারিয়ে যায় যোগ সূত্র। দ্বীপগুলির মাথার উপর বিরাজ করে অনন্ত আকাশ, চারপাশে-পানির পর পানি। সেই পানির উপর ঢেউ খেলে সবুজ ধানের ডগা। বিঘের পর বিঘে। সতেজ ও নিবিড়। দিনে দিনে শক্ত হয় কচি ধানের মাথাগুলো। এক ডগা থেকে আরো দশ ডগা বেরোয়। সুগভীর আবরণে ঢেকে

www.pathagar.com

ফেলে জলরাশি। সবুজের গালিচায় ঘিরে রাখে গ্রামগঞ্জ। সেই সবুজের বুক চিরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে যায় অসংখ্য শাদা পানির ফালী। বর্ষাকালের হারিয়ে যাওয়া নদীনালার রেখা এরা। নিঃঝুম চাঁদনীরাতে এদের শোভা মনোরম। পেটা-রুপোরপাতের মতো এই ধবল পানির পথগুলো ঝিকিমিকি নক্সা কাটে সবুজের আস্তরণে। এই পথে অহোরাত্র ভেসে বেড়ায় বোট-বাড্ডি, ডোংগা-ভেলা। ভেসে বেড়ায় বড় বড় পানসী আর লম্বা লম্বা ছিপ নৌকা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন এরাই। বর্ষা কালের একমাত্র বাহন।

এই সময়ের আশ্বিন মাস। শরৎ কালের উষা। বর্ষার রুদ্রমূর্তি হাঁপানীর রুগীর মতো ঝিমুচ্ছে বসে বসে। গ্রীষ্মবর্ষা লড়াই করে পবন এখন পঙ্গু। দশদিক নীরব ও নিথর। মেঘ মুক্ত আকাশে নীলিমার পলেস্তেরা। দিগন্তের আঁচলে কুয়াশার আভাষ। পূর্ব আকাশের বুকচিরে উঁকি মারছে বলের মতো সূর্য। গায়ে তার কাঁচা সোনার রং। সেই রং এর পরশ এসে উপচে-পড়া নদীনালা ছুঁই ছুঁই করছে। এই রং-পানির খেলার মাঝে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে লালমিয়ার ছিপ নৌকা। আঠারো মাল্লার ছিপ। চরাট-পাটাতন বিহীন একেবারেই উদাম। দুই পাশে গুড়ায় গুড়ায় বসে এক তালে বৈঠা মারছে তার ষোলজন সঙ্গী। নৌকার মাথায় বসে টান মারছে আর একজন সহচর। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে নায়ের মালীক লাল মিয়া। নায়ের মাঝি লাল মিয়া নিজেই। নৌকা বাইচের গান ধরে এগিয়ে আসছে তারা। দাঁড়িয়ে থেকে হাঁক দিচ্ছে লাল মিয়া। বৈঠা মারার তালে তালে ধূয়া ধরছে সঙ্গীরাঃ

লালমিয়া ঃ (আ-র) ঐ দেখা যায় ট্যাঁকের মুড়া,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) লাগাও টান জুয়ান বুড়া,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) চলন বিল আর কলম গাঁও,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) একটানে যায় সাধুর নাও,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) রাজকন্যা করবে দান,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) সোনার হাতে সাঁচি পান
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) আগে গেলে পানের বাটা,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
লালমিয়া ঃ (আ-র) পিছে পড়লে মূড়ো ঝাঁটা,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা॥

www.pathagar.com

লালমিয়ার সঙ্গীরা সকলেই যুবক। লালমিয়াও নওজোয়ান। সুশ্রী ও সুঠাম। ধানক্ষেত পেরিয়ে নদী-নালার এবাঁক সে বাঁক ঘুরে ছিপখানা থামলো এসে বিলবাথান গাঁয়ে। একটা মরানদী বাঁক খেয়েছে এখানে। বিলবাথান গ্রামটি সেই বাঁকের উপর দাঁড়িয়ে আছে ছিলে-টানা ধনুকের মতো। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই শুকিয়ে যায় নদীটি। কিন্তু এখন তার সর্বাঙ্গে অনন্ত যৌবন। বর্ষার অকৃপন ধারায় তার দুইকুল প্লাবিত। ও কূলে ঢেউ খেলছে ধানভরা ক্ষেত, এ কূলে সবুজ ঘেরা এই বিলবাথান গাঁ। লালমিয়ার নৌকা যখন বিলবাথানের বড়ঘাটে ভিড়লো, তখন পেরিয়ে গেছে পান্তার বেলা। ঘাট তখন জমজমাট। বিশ-বাইশ খান বাইচ খেলা নৌকা ইতিমধ্যেই এসে জটলা করছে ঘাটে। কোনটা বা এলোপাতাড়ি বাইচ খেলছে একা একাই। দর্শকদের ছোটবড় হরেক রকম নৌকাও জড়ো হয়েছে অনেক। ভিড় করছে দুই কুলে।

ঘাটের দুইপাশে আবাল বৃদ্ধের ঠেলাঠেলী সমাবেশ। হল্লা করে এদিক থেকে ওদিক ছুটছে ছোকড়ারা। কোলে কাঁকালে মেতে উঠেছে শিশুরা। গাঁয়ের পর্দ্দানশীন মেয়েরাও লম্বা লম্বা ঘোমটা টেনে জড়ো হচ্ছে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে। একটু ফাঁকে নদীর ধারে কোনমতে টিকে আছে একটা ফোউতপড়া বাঁশঝাড়। দু'চারটে বাঁশ হেথা-হোথা দাঁড়িয়ে থেকে সনাক্ত করছে ঝাড়টাকে। সেই বাঁশঝাড়ে ভিড় করছে ষোড়শীরা, যুবতীরা। এ ওকে আলতোভাবে ঠেলা মারছে কৌতুকে। মুখে আঁচল দিয়ে হাসছে ভাঁজ খেয়ে দাঁড়িয়ে।

পরব-পার্বণ গ্রাম বাংলার অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য। পরব পার্বনে মেলা উৎসব চিরন্তন প্রথা। পূজা অর্চনা, ঈদ-মোহাররম, রাশ-রথ, দোল-বারুনী, স্নান-চরক ইত্যাদির সাথে আছে দরগা মাজার পীর পীঠস্থান ঘিরে হাজার রকম মেলা ও বাজার। তিথি পরবের বাইরেও আছে সরস মাটির মানুষের উদ্দাম আবেগ ও সহজাত সখ। এই সখ সাধের তাকিদেও মেলাবসে গ্রাম বাংলায়। সে সময়ে এমন মেলা বারো মাসই বসতো। সখের মেলা। সখের বাজার।

বিলবাথানের তরফদার মাতম আলী মোল্লা সখ করে এই সখের বাইচ লাগিয়েছেন। তিনি এ উৎসব এ সময়ে প্রতিবছরই করেন। এ কারনে প্রতিবছরই ছোটখাটো মেলা বসে ঘাটের উপর। এ বছরও বসেছে। বাঁশী-পুতুল, ছুরি-বটি, চুড়ি-বালা, আল্‌তা-ফিতে, হাঁড়ি-কুঁড়ি, মিঠাই মোণ্ডা --- নানা রকম জিনিষের ছোটখাটো দোকান এসে ইতিমধ্যেই বসতে শুরু করেছে। নৌকা বাইচে সময় লাগবে সামান্য। মেলা চলবে দিনভর।

ঘাটের উপর ছোট একটা সামিয়ানা টাঙ্গানো। তার নীচে তরফদার সাহেব আসন গ্রহণ করেছেন। প্রতিবছরই এই ভাবে আসন গ্রহণ করেন। তিনি জমিদার নন, তরফদার। জোতদার ছিলেন আগে। রানী ভবানীর উত্তরাধিকার রাজা রামকৃষ্ণের দরবারে ছোট একটা 'তরফ' নিলাম খরিদ করে তরফদারী পদ পেয়েছেন তিনি। তাও অনেক দিনই হলো। বছর পনের আগের কথা। নায়ের-গোমস্তা নিয়োগ করে কাচারী ঘর খুলে সেই থেকেই বেশ দাপটের সাথে তরফদারী করে আসছেন মাতম

www.pathagar.com

মোল্লা। প্রজারা বলে জমিদার, তরফদারী পাওয়ার পরই এই সখের মেলা লাগান তিনি। সেই থেকেই চলে আসছে রেওয়াজ।

সামিয়ানার নীচে ঠিক মাঝখানে বসে আছেন তরফদার সাহেব। তাঁর একপাশে খাতা খুলে বসে আছেন নায়েব-মিয়াজান আলী মিয়া। অন্যপাশে পাইক-পেয়াদা দন্ডায়মান। সকলের সম্মুখে ছোটবড় নানা মাপের কাঁসা-পেতলের কলসী থরে থরে সাজানো। কলম গাঁয়ের তৈরী। এগুলো সব নৌকা বাইচের পুরস্কার। একটা মেডেল আছে তরফদার সাহেবের পকেটে। আনা আষ্টেক ওজনের খাঁটি সোনার মেডেল। যার নাও সবার আগে যাবে- তারই প্রাপ্য এটা।

লাল মিয়ার ছিপখানা ঘাটের একপাশে ভিড়তেই বৈঠা হাতে ছুটে এলো সমজান আলী। লাল মিয়া অন্যতম সহচর। তাঁর চোখে মুখে উপছে পড়ছে আনন্দ। লালমিয়াদের অপেক্ষায় সে বসেছিল এতক্ষণ। সকাল থেকে একটানা প্রতিক্ষা। হতাশায় তার মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। এদের উপর নজর পড়তেই বিজলী বাতির মতোন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠেছে মুখ খানা। সে নায়ের কাছে ছুটে এলো আবেগে। লালমিয়াকে লক্ষ্য করে আপ্লুত কণ্ঠে বললো- "এই যে ওস্তাদ, এসেছো? বাহবা! বাহবা! আমি তো ভাবলাম- যতদূরে গেছো তোমরা, হয়তো এসে আর পৌঁছাতেই পারলেনা। বাড়ীর কাছের এতবড় খেলাটা বুঝি মাঠে মারাই গেল! উঃ ! কি যে দুঃখ হতো তা হলে।"

সমজান আলী টলতে লাগলো খুশীতে। লাল মিয়া হাসতে হাসতে জবাব দিলো-"পাগল! এখেলা ছাড়ি আমি? ওখান থেকে নাও ছেড়েছি শেষ রাতেই। শুকতারা উঠার বুঝি আগেই, তাই নারে বছির?"

বছির সামনে চেয়ে বসেছিল গুড়ার উপর। সে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলো- "আগেই মানে? কও কি ওস্তাদ? নিমগাছি ছেড়ে এসে খালের মুখে পড়ার পরে তো আমরা দেখতে পেলাম শুকতারা! ঢের রাত ছিল তখন।"

পাশে বসা বাহার আলী কৈফিয়াত দিয়ে বললো- "ওখানে কাল সারাদিন বাইচ খেলেছি বুঝ্লি ? শরীরটা খুব কাবু হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে রাতে আর ঘমুতে যাই কেউ? সাঁঝ রাতেই ছেড়ে দিতাম নৌকা।"

সমজান আলী খুশী হয়ে বললো- "সাব্বাস। এ না হলে খেলোয়াড়!"

এবার সে লাল মিয়াকে জিজ্ঞেস করলো- "তা ওখানকার খবর কি ওস্তাদ? ধরতে পারলে কিছু?"

বিজয়ের গর্বে লাল মিয়ার বুকখানা ফুলে উঠলো কয়েক ইঞ্চি। সে দরাজ কণ্ঠে উত্তর দিলো-"আলবত! পারবোনা মানে? পয়লা নম্বরের পুরস্কার।"

বিস্ফারিত নেত্রে সমজান আলী বললো-"এ্যাঁ! একেবারে পয়লা নম্বর?

লাল মিয়া ঐ একই কণ্ঠে জবাব দিলো-"আধমুনে কলসী! ইয়াব্বড়! দেখানারে মজু।"

নৌকার তলা থেকে কাঁসার একটা মস্তবড় কলসী টান দিয়ে বের করলো ময়জুদ্দীন মজু। কলসীটা মাথার উপর তুলে ধরে সমজানকে বললো- এই দ্যাখ,

www.pathagar.com

কত বড় আর কি ভারী! আধমুনে কোন কথাঃ কমছে কম তিরিশ সের পানি লাগবে এই কলসী ভরতে। এটার উপর সবারই নজর ছিল বুঝলি? কিন্তু সবার মুখে ছাই দিয়ে মেরে দিলাম আমরা।"

লাফ দিয়ে উঠে খাড়া হলে বছির। সমজানকে লক্ষ্য করে বললো-"শোন, তিরিশ মাল্লার এক শালার মস্তবড় ছিপ্ পয়লা থেকেই খুব বাহাদুরী দেখাচ্ছিল। শুনলাম, ওর সাথে ও তল্লাটের নাকি কোন নৌকাই পারে না। খেলা শুরু হওয়ার আগেই ওরা ওখানকার কর্তাদের ঠাট্টা করে বলছিল- আরে, ওটা দিয়ে দেন না আমাদের নায়ে তুলে। শেষ অবধি দিতে হবে তো তা-ই। আমাদের হারাবে, এমন মরদ কেউ এখানে নেই।"

শুনে সমজান আলী উৎফুল্ল হয়ে বললো-"আচ্ছা!"

বলেই চললো বছির-"বাছাধন ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি? নাও ছাড়ার পর দেখি, ডংকায় বাড়ি না দিতেই নাও ছেড়ে ওরা চলে গেছে অনেকখানী আগে। সব নাও তখন পেছনে। কিন্তু যাবে কোথায় চাঁদবদন? চোঁছা একটান মেরে চোখের পলকে আমরা বেরিয়ে এলাম সব নৌকার আগে। চেয়ে দেখি- বাছাধনেরা পঞ্চাশ হাত পেছনে। তখন যদি দেখতিস্‌রে সমজান! ওহ্! সবার সেকি হাত তালী!"

সমজান আলী ব্যস্ত হয়ে বললো-"সাববাস। তা ঠিক আছে। তোমরা এখন ঐ পিছের বাঁকে দপ্পার কাছে যাও। ঐ দপ্পা (ষ্টার্টিং পয়েন্ট) থেকেই সব নাও এক সাথে ছাড়া হবে। আমি যাই, নায়েব সাহেবের খাতায় ওস্তাদের নামটা তুলে দেই আগে। দেরী হলে হয়তো আর কোনো নামই সে নেবেনা।"

সমজান আলী চঞ্চল হয়ে ডঠলো। লাল মিয়া প্রশ্ন করলো-"তুই নায়ে উঠবি কখন?"

উত্তরে সমজান বললো-"উঠবো ওস্তাদ, তবে এখন নয়। নৌকা বাইচ হয়ে গেলে। জব্বার তো আগ্-গলুইতে আছেই। ও-ই কোন মতে চালিয়ে নিক।"

এর অর্থ লাল মিয়া বুঝলো না। সমজান আলী আগ-গলুইএর দবেজ মাল্লা। বাইচের সময় সে থাকবে না কেন! প্রশ্ন করলো-"নৌকা বাইচ হয়ে গেলে মানে?"

সমজান আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো-"নায়েবের ছেলে ঐ হুকুমদিও আজ খুব তোড়জোড়ের সাথে বাইচ খেলতে এসেছে। হুকুম্‌দির সাথে পেরে ওঠার সাদ্দি নাকি কারো এখানে নেই- এ কথা ঐনায়েবটা এখন থেকেই সবাইকে গেয়ে গেয়ে শুনাচ্ছে। নায়েবের পিছে ছায়ার মতো না থাকলে 'হয়' কে 'নয়' করতে ওর একদন্ড লাগবে না। যে বদ মানুষ!"

সমজান আলী দস্তর মতো সাহসী ছেলে। শক্তিশালী ও উচিৎ বক্তা। এমন কাজে তার মতো লোকই দরকার। এরপর আর লাল মিয়া উচ্চ বাচ্য করলোনা। আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সমজান আলী চলে গেল দ্রুতপদে।

লালমিয়ারা ছেড়ে দিলো নৌকা। তারা চলে গেল দপ্‌পার দিকে। পরে পরেই বাইচ খেলা সব নৌকা একে একে রওনা হলো সেই দিকে। পাতলা হলো ঘাটের

www.pathagar.com

ভিড়। ফাঁকা হলো মাঝ নদী। ঘাটটা ঠিক এই বাইচখেলা পাল্লা-পথের মাঝখানে। ঘাটের বামের দিকে বাঁকের পিছে দপ্পাঃ অর্থাৎ নৌকা ছাড়ার সেই নির্দ্ধারিত স্থান। ঘাটের ডাইনে আরো অনেক দূরে এই পাল্লা-পথের শেষ সীমানা। লম্বা একটা বাঁশের মাথায় নিশান উড়ছে সেখানে। লাল সালুর নিশান। দপ্পা থেকে শুরু হবে পাল্লা। শেষ হবে এই বাঁশের কাছে এসে।

[দুই]

গডাম্-গডাম্-গডাম্! বাড়ি পড়লো ডংকায়। শুরু হলো বাইচ। অল্পক্ষণ পরেই বহুদূরের অস্পষ্ট 'হেঁইয়ো-হেঁইয়ো' রব একটু একটু করে কানে এসে পড়তে লাগলো। দর্শক কুল উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলো সেই দিকে। এরই মধ্যে হঠাৎ করে বাঁকের মোড় কেটে বেরিয়ে এলো একখানা ডিংগি। একেবারেই এককভাবে বেরিয়ে এলো ডিঙ্গিখানা। তার সামনে পিছে কোথাও আর নৌকা নেই একটাও। এই ডিঙ্গির উপর নজর পড়তেই মেতে উঠলো জনতা। শুরু হলো ঠেলাঠেলী। প্রকট হলো কোলাহল।

তরফদারের ছাউনীর নীচে তখন ঝড় উঠেছে আনন্দের। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ছাতার উপর ভর দিয়ে নায়েব মিয়া জান আলী মিয়া তখন নাচতে শুরু করেছেন। সবেমাত্র বাঁক ছেড়েছে ডিঙ্গিটা। ঘাট ছেড়ে অনেক দূরে তখনও। বেপরোয়া হৈ-হুল্লোরের মাঝে ঘাটের আওয়াজ ডিঙ্গি'র কাছে পৌছানোর প্রশ্নই কিছু উঠে না। তবু আনন্দে আত্মহারা নায়েব সমানে জুড়ে দিয়েছেন চীৎকার। হেঁকে হেঁকে বলছেন- "সাব্বাস বেটা, সাব্বাস! টেনে আয়-টেনে আয়।"

নায়েবের উল্লাস দেখে উঠে দাঁড়ালেন তরফদার। ধাববান ডিঙ্গি'র দিকে আঙ্গুল দিয়ে প্রশ্ন করলেন-"কার নাও নায়েব? ঐ যে সবার আগে বেরিয়ে এলো, কার নাও ওটা?"

উল্লাসে দুলতে লাগলেন নায়েব সাহেব। বললেন -"হুকুম উদ্দীনের হুজুর, আমার হুকুম উদ্দীনের! বলেছিলাম না, আমার ছেলের সাথে পাল্লা দেয়ার মরদ এ অঞ্চলে নেই? কথাটা আমার ঠিক কিনা তা এবার নিজের চোখেই দেখুন। সব ব্যাটাকে পিছে ফেলে আমার হুকুম উদ্দীনের নাও কেমন জোরে বেরিয়ে আসছে গুলীর মতো।"

আনন্দের আধিক্যে নায়েব মিয়াজান আলী মিয়া বিলকুল ভুলে গেলেন স্থান কাল পাত্রের কথা। কণ্ঠের তেজ আরো দশগুণে বাড়িয়ে দিয়ে পুনঃ পুনঃ হাঁকতে লাগলেন -"মারোটান-মারো টান- আরো জোরে -আরো জোরে-হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-"

হাতের ছাতা বৈঠার মতো করে অবিরাম চালাতে লাগলেন নায়েব সাহেব। ঝুঁকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন সামনের দিকে।

ঠিক এই মুহূর্তে ছুটে এলো সমজান আলী। তরফদার সাহেবকে লক্ষ্য করে সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো-"এটা অন্যায় তরফদার সাহেব। ঘোর অন্যায়। ফেরফিত্তে নাও

www.pathagar.com

ছাড়ার হুকুম দেন।"

তরফদার সাহেবের লক্ষ্য ছিল অন্য দিকে। তিনি কানই দিলেন না কথাটায়। কিন্তু এতে বিঘ্ন ঘটলো নায়েব সাহেবের উল্লাসে। তিনি হাতের ছাতি ঠক করে মাটিতে মেরে বললেন-"ক্যান্, ফেরফিত্তে ক্যান্?"

উত্তরে সমজান আলী বললো- "সব নাও এক জায়গায় হবে, ডংকায় বাড়ি দিলে সব নাও একসাথে ছাড়া হবে, এইতো কথা। কিন্তু আপনার হুকুম্‌দি এটা করলো কি?"

গর্জে উঠলেন নায়েব সাহেব। বললেন, "এই ব্যাটা বেয়াদপ! হুকুম্‌দি কিরে? নামতো ওর হুকুম উদ্দীন। আদবের সাথে কথা বলতে পারিস্‌নে?"

আসল কথা চাপা পড়ে দেখে সমজান আলী অভিযোগটা মেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বললো-"আচ্ছা হলো না হয় ঐ হুকুম উদ্দীনই হলো। কিন্তু আপনার হুকুমউদ্দীনতো এক জায়গায় হয়নি। বাঁকের একদম এই মাথায় থেকে নাও ছেড়েছে ও।"

নায়েব সাহেব তার বক্তব্যটা এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে বললেন-" এ্যহ্! বললেই হলো? যা-যা। হয়েছে।

তরফদার সাহেব বিষয়টির গভীরে না গিয়ে একটা উড়ো প্রশ্ন করলেন- "কি হলো মিয়াজান? কি কয় ছোঁড়া?"

মিয়াজান মিয়া তরফদারের আগ্রহটা আরো পান্‌সে করে দিলেন। বললেন- "কিচ্ছু নয় হুজুর। সেরেফ আল্‌তু-ফাল্‌তু। ব্যাটারা আমার হুকুম উদ্দীনের সাথে পেরে উঠছেনা বলে আজগুবী এক বাহানা নিয়ে এসেছে। যতসব ফেরেব বাজের দল!"

দপ্ করে জ্বলে উঠলো সমজান আলীর চোখ দুটো। শক্ত হলো পেশী। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিলো নিজেকে। অনেকটা শান্ত কণ্ঠে বললো, "গাল দেবেন না নায়েব সাহেব। আমি যা বললাম তার মধ্যে একতিল ফাঁক নেই। ঐ যে ওরাও এই কথা বলার জন্যেই এসেছে।"

এক পাশে দণ্ডায়মান কিছু লোকের দিকে ইঙ্গিত করলো সমজান আলী। এরা সবাই ভিন্ন এলাকার লোক। তরফদার সাহেবের উদাসিনতা আর নায়েবের বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করে এরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। কোন প্রতিবাদ না করে এরা এবার ক্রোধভরে সরে পড়লো একে একে। যাবার সময় একজন শুধু বললো-"আরে চল্, যেখানে এমন অবিচার, সেখানে আর বারেক বাইচ খেলতে আসে কোন শালা!"

তরফদার সাহেবের টনক তবু নড়লোনা। একজন মাতবর গোছের লোকের সাথে কি একটা বিষয় নিয়ে তিনি মশগুল ছিলেন আলাপে। এর সুযোগ নিলেন নায়েব সাহেব। সমজানকে লক্ষ্য করে তিনি তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন- "আরে ভাগ্! সর এখন।"

তরফদার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সমজান তবু পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলো-"তরফদার সাহেব, মানে- হুজুর, দেখুন, কাজটা কিন্তু-"

www.pathagar.com

মাতবরের সাথে কথা সেরে তরফদার তখন বাইচের দিকে নজর দিতে যাচ্ছিলেন। সমজানের ডাকে তিনি বিরক্তি বোধ করে রুষ্টকণ্ঠে বললেন -'আহ্! ব্যাটাতো বড় জ্বালালো!

সঙ্গে সঙ্গে নায়েব সাহেব তেরিয়া কণ্ঠে বলে উঠলেন-"দূর হ, দূর হ ব্যাটা বদমায়েশ। হুজুর বাইচ খেলা দেখছেন আর তুই এসে জ্বালাচ্ছিস ক্যান্ এ্যাঁ? প্যান্ প্যানানীর জায়গা খুঁজে পেলিনে? ভাগ্, ভাগ্ শিগ্গির!"

আবারও জ্বলে উঠলো সমজান আলীর চোখ দুটো। আবারও সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল ওখান থেকে। যাবার সময় বললো- "ঠিক আছে! থাকুক আপনার হুকুম্দি এক বাঁক আগে। তবু ঐ হুকুম্দির মতো মরদ কি করে সবার আগে যায়, তাও এই দশজনেই দেখতে পাবে।"

কুঞ্চিত হলো মিয়াজান মিয়ার ভ্রুযুগল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। পুত্রের আসন্ন বিজয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেই তিনি মেতে উঠলেন আবার। হুকুমউদ্দীনের নাও তখন ঘাটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। চেনা যাচ্ছে সবাইকে। হালের মাঝি হুকুম উদ্দীন। সে হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কোন মতে। নাও সামলাতে তখন তার প্রাণান্ত অবস্থা। কিন্তু এদিকটা দর্শকদের দেখার দিক ছিলো না। সে-ই যে হা'লের মাঝি, আর তার নৌকাই যে সবার আগে, -এটেই ছিল সবার কাছে বড়। এ কারণেই তরফদার সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "আরে! হা'লের মাঝি কে ওটা? তোমার হুকুম উদ্দীন নয় নায়েব?"

ফুলে উঠলো মিয়াজান মিয়ার বুক। তিনি আবেগের সাথে উত্তর দিলেন- "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আমার হুকুম উদ্দীন। একে বারে বাঘের বাচ্চা। বলতে গেলে ও-ই তো গোটা নাওখানা চালাচ্ছে। ওর আগে নাও নিয়ে যায় এমন কোন ব্যাটাচ্ছেলে আজও এখানে জন্মেনি।"

তরফদার সাহেব তারিফ করে বললেন-" সাব্বাস!"

নায়েব এবার উড়ে উঠলেন আকাশে। বললেন -"একেবারেই ক্ষণজন্মা ছেলে হুজুর। শুধু নৌকা বাইচ কেন, যেখানেই লাগাবেন সেখানেই সে একাই একশো। কোন চেনাজানা মানুষ ওর সাথে কোন কাজেই পাল্লা দিতে এগোয় না। এ ছাড়া বিষয়-বুদ্ধি? কি বলবো হুজুর! জন্মেছে গরীবের ঘরে! কোন রাজা জমিদারের ঘরে যদি জন্ম নিতো, তাহলে তাঁরা বর্তে যেতেন এমন ছেলে পেয়ে।"

জনগণের বিপুল এক উল্লাসে ছেদ পড়লো মিয়াজান মিয়ার খেদে। ব্যাপারটা নাবুঝেই তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন- "মারহাবা! মারহাবা!"

কিন্তু নদীর দিকে নজর দিয়েই চুপ্সে গেলেন তিনি। বাইচ খেলার সব নৌকাই ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে বাঁকঘুরে। এদের ভেতর থেকে একখানা ছিপ নৌকা শাঁ করে বেরিয়ে এলো আগে। বৈঠার মুখে পানি উড়িয়ে তীর বেগে আসতে লাগলো সবাইকে পিছে ফেলে মাথার উপর বৈঠা তুলে হালের মাঝি ঘা মারছে পানিতে। এক এক ঘায়ে নৌকাখানা চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠছে শূন্যে।

www.pathagar.com

ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে এসে বিশ-ত্রিশ হাত সামনে। দেখতে দেখতে নৌকা খানা কাছে এলো অনেক খানি। উচ্ছাস মুখর জনতা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো হাল ধরে নেই কেউ। পিছ গলুইয়ের শেষ প্রান্তে পা রেখে দাঁড়িয়ে অনর্গল বৈঠা মারছে হালের মাঝি। নৌকার মাথা তিল পরিমাণ ডাইনে বাঁয়ে না বেঁকে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে সরল রেখায়- উড়ে আসছে পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মতো। হুকুম উদ্দীনের ডিঙ্গিটা ঘাট ছেড়ে অল্পখানিক সামনের দিকে এগুতেই ঘাটের কাছে পৌছে গেল ছিপখানা। সেদিকে নজর দিয়ে তরফদার সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন-" ওরে বাবা! এ যে দেখি আরো তুখোড়! কে নায়েব? কার নাও এটা?"

বিপদের ইঙ্গিতে নায়েব তখন শংকিত। তাঁর কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে ক্রমেই। করণীয় স্থির করতে না পেরে তিনি তখন উঠছেন একবার বসছেন একবার। নায়েবকে নীরব দেখে তরফদার সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন-" হা'লের মাঝিটাকে নায়েব? বাপরে শক্ত ছেলে! এমন মাঝিতো আর কখনও দেখিনি! নামটা কি ওর?"

'নায়েব এবার নিতান্তই ঠান্ডা কণ্ঠে জবাব দিলেন-"লালু হুজুর , লালু। ঐ সোনাকোলের লাল মিয়া।" কি যেন একটু চিন্তা করলেন তরফদার সাহেব। বললেন- "লাল মিয়া?"

- হ্যাঁ হুজুর, লোকে তাই বলে। বড্ড বাজে ছেলে হুজুর।
- বাজে!
- একেবারেই বিচ্চিরি। গাঁজা ভাঙ্গ খেয়ে দিনরাত কেবল হৈ হৈ করে বেড়ায়। বদের হাড্ডি হুজুর! গুন্ডা পান্ডার সর্দ্দার।
- ও। তা ওর বাপের নামটা কি?
- জসমত, মানে জসমত মিয়া।
- জসমত মিয়া? কোন জসমত?
- ঐ যে সেবার যার সাথে মামলা হলো আপনার, এক কালে আপনাদের সমান সমান সম্পত্তি ছিল বলে আপনাকে জমিদার বলে মানতেই চায়নি যে জসমত, সেই জসমত মিয়া। যেমন বাপ তেমনি ছেলে। বাপটাতো মারা গেছে। এটা আরো পাজির হদ্দ।

দর্শকদের আর এক দফা বিপুল উল্লাসে ধ্যান ভাঙ্গলো নায়েবের। নদীর দিকে নজর দিতেই তাঁর ঘুরে গেল মাথা। লাল মিয়ার ছিপ তখন ঘাট ছেড়ে চলে গেছে হুকুমউদ্দীনের ডিঙ্গির কাছে। ডিঙ্গিটাকে পিছে ফেলে চলে যাচ্ছে আগে। সে দিকে লক্ষ্য করে তরফদার সাহেব "গেল- গেল! হুকুম উদ্দীনকেও পিছে ফেলে সবার আগে বেরিয়ে গেল ছিপখানা! সাব্বাস!"

দিশেহারা নায়েব তখন হারিয়ে ফেললেন কান্ডজ্ঞান। বিকারগ্রস্ত রুগীর মতো বেঘোরে বলতে লাগলেন-"এ্যাঁ! হুকুমউদ্দীনেরও আগে গেলো! তাহলে নিশ্চয়ই হুকুমউদ্দীনের আগে থেকে নাও ছেড়েছে ও ব্যাটা! ও কক্‌খনো দপ্পার কাছে যায়নি। ও নৌকা বাতিল- ও নৌকা খারিজ -ও নৌকা-"

www.pathagar.com

নায়েব তাঁর মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। লাল মিয়ার ছিপখানা আগে বেরিয়ে যাওয়ায় বেসামাল হুকুমউদ্দীন তাল সামলাতে না পেরে ধপাশ্ করে পড়ে গেল গলুই থেকে। হাল বিহীন নৌকাখানা সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে সশব্দে তলিয়ে গেল মাঝ দরিয়ায়। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতোই সেই মুহূর্তে মার মার করে ছুটে এলো অবশিষ্ট নৌকাগুলো। গতিবেগ বিপুল। রাশ টানার বাইরে। তাই এক সাথে ঝড়ের বেগে সবগুলোই বেরিয়ে গেল হুকুমউদ্দীন ও তার সঙ্গীদের নৌকার তলে পিষে। হায় হায় রব উঠলো চার দিকে। "ওরে আমার হুকুমউদ্দীনরে-" বলে ডুকরে উঠে সামনের দিকে দৌড় দিলো বাঘের বাচ্চার বাঘা বাপ মিয়াজান আলী মিয়া।

শেষ হলো নৌকা বাইচ। উদ্ধারপর্ব শেষ হলে দেখা গেল- বৈঠার ঘায়ে কান ছিড়েছে হুকুমউদ্দীনের। ঘর্ষণ লেগে ছাল উঠেছে পিঠের। তার সঙ্গীরাও অনেকেই অনেকভাবে আহত। কারো ফেটে গেছে মাথা, কারো কেটে গেছে কপাল।

বাইচ শেষে ধীরে ধীরে ফিরে এলো নৌকাগুলো। লাল মিয়ার ছিপখানা নদীর একদম পাড় ঘেঁষে সেই ফোউৎ-পড়া বাঁশ ঝাড়ের তল দিয়ে ঘাটে এসে হারিয়ে গেল শত নায়ের ভিড়ে।

সেই ফোউৎ-পড়া বাঁশঝাড়ের একখানা কঞ্চিবিরল বাঁশ নদী-লম্বা হেলে পড়ে বেড়ার মতো আগ্‌লে ছিল নদীর পাড়। সেই বাঁশের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই যুবতী। মতিজান ও পরীবানু। তারা একদৃষ্টে চেয়ে ছিল লাল মিয়ার নৌকার দিকে। এরা একই গাঁয়ের মেয়ে। একে অন্যের সই। মতিজান পরিণীতা। পরীবানু অনূঢ়া। লাল মিয়ার নাওখানা অদৃশ্য হয়ে যেতেই পরীবানু বলে উঠলো- "চলো সই, ওদিকে যাই।"

মতিজান অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো-"ওদিকে মানে? ও দিকে কোথায়?"

- ঐ ঘাটের দিকে যাই।

- ঘাটের দিকে! মাথাটা খারাপ হলো নাকি? ওদিকে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? সবদিকেই তো গিজ্ গিজ্ করছে মানুষ।

- তাও তো ঠিক। কিন্তু ঐ ছিপনাওটা কি পুরস্কার পায় তাতো আর দেখা যাবে না এখানে থেকে।

- দেখবে আবার কি? যার নাও সবার আগে যায়, সব বছরই তো সে সোনার মেডেল পায়। এবারও সোনার মেডেলই পাবে। তোমার বাপজানের কাছে শুনোনি কিছু? গড়ায়নি এবার সোনার মেডেল?

- বাপজানকে জিজ্ঞেস করলে বলতো। আমি তো আর জিজ্ঞেস করিনি ওসব।

- সোনার মেডেল থাকলে ও সোনার মেডেলই পাবে।

- মাঝিটা খুব দবেজ মাঝি-তাই নয় সই ? বাপ্‌রে। গলুইয়ের একদম শেষ কিনারে পা রেখে বৈঠার পর বৈঠা মারছে সমানে, নাওখানা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, তবু মাঝিটা একতিল হেললোও না-দুললোও না। বাব্বা! কি শক্ত মানুষ। ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো মতিজানের ঠোঁটে। বললো-"মানুষটা খালি শক্তই

www.pathagar.com

নয় সই, দেখতেও খুব সুন্দর।"

- তা যা বলেছো সই! কি সুন্দর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর টানা-টানা চোখ! গায়ের রংটাও কি দপ্ দপে! ঠিক যেন রাজপুত্তুর!

আঁড় চোখে চেয়ে মুখটিপে হাসতে লাগলো মতিজান। কিন্তু পরীবানুর চোখে তখন আবির, মনে তখন আমেজ। সে কোন দিকেই চোখ না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলো- "ওর বাড়ী কোথায় সই? নামটা কি ওর?"

- নাম ওর লাল মিয়া। সোনাকোলের ছেলে।

- সোনাকোল ? কোন সোনাকোল?

- নাও বাবা! কোন সোনাকোল আবার ? ঐতো ঐখানে। ঐযে সেবার পুষ্নের সময় মেলা দেখতে গেলাম, সেই সোনকোল।

- ও! তাই নাকি? তা খুব খেলোয়াড় লোক, তাই নয় সই?

- হ্যাঁ। বাপ-মা মরা ছেলে। অনেক জমিজমা। বিয়ে-থাও হয়নি। ও এখন কি করবে? তাই এসব করেই বেড়ায়।

ঘাটের দিকে চোখ ফেরালো পরীবানু। দৃষ্টি তার উদাস। তার কাছে এলো মতিজান। কানের কাছে মুখ রেখে বললো- "মনে ধরেছে সই?"

পরীবানু চমকে উঠে বললো- "ধ্যাৎ!" কপটরোষে সে তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়ালো এক পাশে। লাল হলো তার মুখ মন্ডল। মাটির দিকে চোখ রেখে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে সে আনমনে মাটি খুটতে লাগলো। আবার তার কাছে এলো মতিজান। বললো -"রাগ করলে সই?"

পরীবানু নীরব। মতিজান এবার তার গালে একটা নাড়া দিয়ে বললো-"কিলো, বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না?"

ফিক্ করে হেসে ফেললো পরীবানু। মৃদু প্রতিবাদ করে বললো- "যাও।"

অনুশোচনার ভান করে মতিজান ফের বললো- "যাবো আর কোন্ চুলায় সই। মুখ পোড়া মাঝিটাও যে ঘুরে ফিরে এই দিকেই তাকাচ্ছিলো,- দেখোনি?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসির বেগ বন্ধ করলো পরীবানু। অল্প একটু মাথা হেলিয়ে জবাব দিলো-"-হুঁউ!"

এবার ফুঁপিয়ে উঠলো মতিজান। বললো, "তাইতো বলে, 'তলে তলে বউ পিঠা খায়, এত পিঠা কুন্ঠে পায়'! দৃষ্টি বদল এরই মধ্যেই সারা?"

গম্ভীরতার ভান করলো পরীবানু। বললো- "সই, ভাল হচ্ছে না কিন্তু।"

মতিজান কপট খেদে বললো- "ভাল আর কি করে হবে সই? মানুষের ভিড় ঠেলে তোমাকে ঐ লাল মিয়ার কাছে নিতে রাজী হচ্ছি না যখন, তখন কি আর ভাল কিছু আমাকে দিয়ে হয়!

এবার ফুঁশে উঠলো পরীবানুও। বললো- "মর আঁটকুড়ি! আমি সেই জন্যে বলছি? আমি বলছি- ওদিকে গেলে সব নৌকা দেখা যেতো তাই।"

একটু চিন্তা করলো মতিজান। চিন্তা করে বললো- "এক কাজ করি চলো।

www.pathagar.com

এখানে আর না দাঁড়িয়ে এখন চলো আমাদের পাড়ায় যাই। বাইচ খেলা তো শেষ। ফেরার সময় সব নাও কলমদির খাল হয়ে আমাদের ঘাট দিয়ে গাঙ্গে এসে পড়বে। বাঁক ঘুরতে আর কোন নাও যাবে না।

উজ্জ্বল হলো পরীবানুর মুখমন্ডল। সে উৎফুল্ল হয়ে বললো-"তাই?"

মতিজান জোর দিয়ে বললো- "হ্যাঁ তাই। ওখানে আমরা ঘাটে গিয়ে বসে থাকিগে চলো। কলসী ভরার নাম করে ঘাটে গিয়ে থাকলে সব নৌকাই দেখা যাবে আবার। ঘাটের একদম কোল ঘেঁষে গাঙ্গে পড়বে সব নাও।"

অধীর হলো পরীবানু। বললো- "সত্যি ? তাহলে সই তাই চলো। এক্ষুনি। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?"

মতিজানকে একরকম জোর করেই ঠেলে নিয়ে অগ্রসর হলো সে। রাস্তায় উঠে অল্পখানিক এগিয়েই কি যেন একটু চিন্তা করলো। অতঃপর মতিজানকে তার বাড়ীর দিকে ঠেলে দিয়ে বললো-"তুমি যাও তো সই, আমি এই এলাম বলে।"

ঝড়ের বেগে পরীবানু তার বাড়ীর দিকে ছুটলো।

কিছুক্ষণ পরে কলসীকাঁকে যখন সেই নির্ধারিত ঘাটে এসে হাজির হলো দু'জন, তখন দেখা গেল পাল্টে গেছে পরীবানুর পোষাক। সাদামাটার পরিবর্তে একখান লালটুক্‌টুকে শাড়ী তার পরণে। গলায় তার ফুলের মালা। খোপায় ফুলের গুচ্ছ। কাঁকের কলসী নামিয়ে রেখে ঘাটে বসলো উভয়েই। দু'চারটে কথার মাঝেই সামনের দিকে চেয়ে পরীবানু বললো- "কৈ সই, এখনও তো কোন নায়ের সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে?"

মতিজান হাসতে হাসতে বললো-"বাপ্‌রে। তর সয়না বুঝি। একটু ধৈর্য্য ধরে বসো, সকলকেই দেখতে পাবে।"

একটু থেমে পুনরায় সে বললো- "আর তুমি দেখবে কি? আসি বলে বাড়ী গিয়ে যে কান্ড করে এসেছো তুমি, তাতে আমি ভাবছি, তোমাকে দেখেই মাঝিরা সব নাও থেকে পড়ে নাযায় মাথা ঘুরে।"

পরীবানুর পোষাকের দিকে ইঙ্গিত করলো মতিজান।

আড় চোখে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করে পরীবানু বললো-

- "ইস্!"

- ইস্ নয়, ইস্ নয়। এমনিতেই এই একডালী রূপের উপর লাল শাড়ী পরনে। তার উপর আবার লাল-টুকটুকে ফুলের মালা গলায় দিয়ে যে লালপরী সেজেছো, তাতে আর ঐ লাল মিয়া কেন, সব মিয়ারই সাথাটা আজ বিগড়ে দেবে তুমি।

- তাই না কি? তা হলে মালা খুলি বাবা।

মালায় হাত দিলো পরীবানু। বাধা দিলো মতিজান। বললো-"থাক, থাক। পরেছো যখন তখন আর খুলো কেন? এত বয়সেও মালা যখন অন্য কারো গলায় দিতে পারলেনা, তখন ওটা যত্ন করে নিজের গলাতেই রাখো। নিজে পরেই সখটা কিছু মেটাও।"

এবার মতিজানের কোলের উপর ঢলে পড়লো পরীবানু। মতিজানের গলাটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে সে চিকন সুরে গান ধরলোঃ-

www.pathagar.com

"আমার গলার মালা কেঁদে বলে, আমায় পরো যতনে
মালা কি করি তোরে,
খুঁজে না পাই দেখার মানুষ, থাকি একা ঘরে-রে-
মালা কি করি তোরে॥
আমি দিবা রাতি মালা গাঁথি, মালা গাঁথি থরে থরে-রে-
মালা কি করি তোরে,
খুঁজে না পাই দেখার মানুষ, থাকি একা ঘরে-রে-
মালা কি করি তোরে॥

একটু জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো মতিজান। বললো-" নাও হয়েছে। খোঁজার মতো খুঁজলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়, আর দেখার মানুষ পাচ্ছেনা। কত যোগী এলো, কত যোগী গেল- একজনকেও মনে ধরতো যদি। কবে কোন রাজপুত্তুর পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসবে, তবে ওর মনে ধরবে।"

পরীবানু বললো-"সই!"

মতিজান বললো-"ঐ সাতখুড়ি তেলও পুড়বেনা, রাধাও নাচবেনা। নাও, কলসী মাজো।"

বলেই মতিজান তার কলসীটা টেনে নিয়ে পরী বানুর আগেই মাজতে শুরু করলো। পরীবানুও তার কলসীটা হাতের কাছে নিয়ে দু'একটা ঘষা দিলো আনমনে। অতঃপর সে দুষ্টুমী করে বললো- "আচ্ছা সই, সব রাজ পুত্তুরই কি ঘোড়ার চড়ে আসে? নৌকায় চড়ে একজনও আসে না?"

হাতের কলসী এক পাশে থপ্ করে রেখে তার দিকে কিছুক্ষণ মিটিমিটি চেয়ে রইলো মতিজান। পরে ধীরে ধীরে বললো- "এতদিন আসেনি। তবে তোমার ভাব দেখে বুঝতে পারছি, আজ তাহলে আসছে।

- মানে ?
- মানে ছিপ নৌকার গলুইয়ের উপর সওয়ার হয়ে আসছে।
- ও তো লাল মিয়া। রাজপুত্তুর নয়।
- রাজপুত্রের চেয়ে কমও নয়।
- তাই?
- ওর যেমনি রূপ, তেমনি গুণ, অতগুণ কোন রাজপুত্তুরেরও নাই।
- তোমার সব বানানো কথা।
- বানানো নয়, বানানো নয়। শুধু বাইচ খেলায় কেন, কোন কিছুতেই আশে পাশে ওর জুটি নাই। আমার চাচা কয়-ওর গান শুনলে দু'দন্ড না দাঁড়ায় এমন মানুষ এ তল্লাটে নাই।
- এ্যাঁ! ও গানও জানে?
- জানে মানে! দ্যাশে এমন গান নাই, যা ও জানেনা। আর গলার কথাতো

www.pathagar.com

বললামই। তোমার গলার চেয়ে কোন দিক দিয়েই কম নয়। বরং আরো ভাল। বিষয় সম্পত্তি অনেক। কিন্তু কথা বলার লোক নাই। তাই গান বাজনা করেই সময় কাটায়।

- ওর এত খবর তুমি কোথায় পেলে সই?

- তোমার সয়্যার কাছে। এ ছাড়া আমার ফুপুর বাড়ীও যে ঐ দিকেই। আমি আগে থেকেই জানি আর দেখেছিও।

- ওম্মা! তাই না কি? তা মন টন টলেনি?

মিটমিট করে হাসতে লাগলো পরীবানু। তেড়ে এলো মতিজান। বললো- "তবেরে পোড়ামুখী! আমার মন টলতে যাবে কোন দুঃখে ? আমার মন টলানোর মানুষতো আমার ঘরেই আছে। এবার তোমার নিজের মনটা সামলাও।"

ইতিমধ্যেই দূর থেকে ভেসে এলো নৌকা বাইচের গান। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠলো উভয়েই। মতিজান পরীবানুকে ঠেলা দিয়ে বললো-"ঐ শোনো, তোমার মন টলাতে আসছে।"

উভয়েই চেয়ে রইলো পথের পানে। প্রথম পুরস্কার প্রথম দিকে বিলি হওয়ায় লাল মিয়ারাই ফিরে আসছে সবার আগে। পুরস্কারের আনন্দে তারা আল্‌তো আল্‌তো বৈঠা মারছে আয়াসে, গান ধরেছে গলা ছেড়ে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে লম্বা করে কণ্ঠ দিচ্ছে লাল মিয়া। তা একই কণ্ঠে আওড়াচ্ছে তার সঙ্গীরাঃ-

লাল মিয়াঃ " বৈঠা টান দাও-টান দাও- মন করে খুশী,
সোনাকোলের হাটে গিয়ে কিনবো দাঁতের মিশি-
বৈঠা টান দাও।

সঙ্গীরা ঃ বৈঠা টান দাও- টান দাও মন করে খুশী
সোনাকোলের হাটে গিয়ে কিনবো দাঁতের মিশি-
বৈঠা টান দাও॥

লাল মিয়াঃ " বৈঠা টান দাও-টান দাও- যাবো তাড়াতাড়ি,
নাটোর যাবো, গোল্লা খাবো চড়বো ঘোড়ার গাড়ী
বৈঠা টান দাও।

সঙ্গীরা ঃ ঐ

লাল মিয়াঃ " বৈঠা টান দাও-টান দাও- দুঃখে ফাটে বুক,
একবার দেখা দিয়া কন্যা লুকালো তার মুখ-
বৈঠা টান দাও॥

সঙ্গীরা ঃ ঐ

ছিপখানা এগুতেই পরীবানু চিনতে পেরে বললো -" ও সই, ঐ যে ওরাই না?"

মতিজান চাপা কণ্ঠে বললো- "হয় লো, হয়। এবার নয়ন ভরে দেখো।"

ইচ্ছে থাকলেও পরীবানু তা পারলো না। ছিপখানা ঘাটের কাছে এগুতেই

www.pathagar.com

শরমে তার ঢেকে এলো দুই চোখ। দু'একবার তাকিয়েই সে নামিয়ে নিলো চোখ দুটি। ঘাটটা একটু আড়ালে। ভাল করে না চাইলে, নৌকায় বসে ঘাটের কাউকে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল বলেই পরীবানুকে সবার আগে দেখতে পেলো লাল মিয়া। তার উপর চোখ পড়তেই তার আটকে গেল গলা। সে থেমে গেল আচমকা। কান্ডাকান্ড জ্ঞান হারিয়ে সে ঘাটের দিকে চেয়ে রইলো একলক্ষ্যে। এতে করে বেতাল হলো হাল। ঘুরে গেল নায়ের মাথা। সঙ্গীরা তার হক চকিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো- "কি হলো ওস্তাদ ? থামলে যে?"

লালমিয়া নীরব। ঘাড় ঘুরালো সকলেই। লাল মিয়ার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললো " আরে ! কি দেখছো ওস্তাদ? কি দেখছো ওদিকে?"

চোখ দিয়ে ঘাটের দিকে ইঙ্গিত করলো লাল মিয়া। বললো, "ঐ দ্যাখ-! সে।"

ঘাটের দিকে এক সাথে চোখ ফেরালো সকলে। চোখ ফিরিয়েই অবাক হয়ে সবাই বললো-"আরে! তাইতো!"

সমজান বললো-"বাড়ীটা তাহলে এখানেই নাকি?"

বছির বললো- ইশ্‌রে! যেন ফেটে পড়ছে রূপ!"

মজু বললো- রূপ নয়, আগুন। গন্‌গণে আগুন। লাল মিয়া এবার চাপাকণ্ঠে বললো-" গলায়- আবার কি পরেছে দেখেছিস্?"

বছির বললো- "ফুলের মালা। টুকটুকে লাল।"

বাহার বললো-" ইশ্! মনে হচ্ছে মানুষ নয়, আস্ত একটা পরী। ফুলপরী।

মজু বললো- দুইজই মারাত্মক। তবে ঐ ফুল পরীটা সত্যি সত্যিই মেয়ে একখান বটে! মন মজানো কন্যা।

যদিও চাপা কণ্ঠেই কথা বললো সকলে তবু এদের কিছু কথা কানে পড়লো পরীদের। শুনে তারা সংকুচিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই হাতের হাল সোজা করে ধরে "ধর, গান ধর"- বলে সশব্দে গেয়ে উঠলো লাল মিয়া। তার সঙ্গীরাও ধূয়া ধরলো সাথে সাথেইঃ -

লালঃ ফুল কে পরায় গলে-
সঙ্গীরাঃ ফুল কে পরায় গলে।
লালঃ বাও ও বসন্তকালে পতি নাই যার ঘরে
সঙ্গীরাঃ ফুল কে পরায় গলে॥
লালঃ ওহে- তারা করে ঝিকিরে মিকি চাঁদে করে আলো
এমন সুন্দর রাধে
সঙ্গীরাঃ কৃষ্ণ কেনে কালো
ফুল কে পরায় গলে-
এ-ওরে বাও ও বসন্ত কালে পতি নাই যার ঘরে-
ফুল কে পরায় গলে॥

www.pathagar.com

লালঃ ওহে- পাহারেতে জন্মেরে নদী সাগরে যায় নামি-
রূপ থাকিতে যুবতনারী-
সঙ্গীরাঃ পায় না ক্যান্ সোয়ামী
ফুল কে পরায় গলে-
এ-ওরে বাও ও বসন্তকালে পতি নাই যার ঘরে-
ফুল কে পরায় গলে॥
লালঃ ওহে- টাকা বলো, কড়িরে বলো, গয়না পরিপাটি-
সোনার যৌবন বিফল গেলে-
সঙ্গীরাঃ জীবনটা তার মাটি-
ফুল কে পরায় গলে-
এ-ওরে বাও ও বসন্তকালে পতি নাই যার ঘরে-
ফুল কে পরায় গলে॥"

ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো নৌকা সহ লাল মিয়ারা। অসার হয়ে বসে রইলো হত বুদ্ধি দুই সখী। এতটা যে ঘটতে পারে, এমনটি কেউ ভাবেনি। পরবর্তী নৌকাগুলোর সশব্দ আগমনে সম্বিতে ফিরে এলো তারা। ক্ষীপ্রহস্তে কলসী ভরে ঘাট থেকে সরে গেল তৎক্ষণাৎ।

[তিন]

নায়েব মিয়াজান মিয়ার বাড়ীখানা ছোট খাটো। তরফদার সাহেবের দেয়া কাঠা পনের মাটির উপর ঘর। এটা হাল আমলের বাড়ী। এর আগের খবর অজ্ঞাত। তাঁর চাল-চুলার সঠিক হদিস অন্যকারো জানা নেই। তরফদার সাহেবেরও না। তাঁর পূর্বপুরুষের যে পরিচয় তিনি তরফদারকে দিয়েছেন, তা চোখ বুঁজে বিশ্বাস করা শক্ত। আগে তিনি বেগার খাটতেন সদরে। জীবিকার সন্ধানে অহোরাত্র ঘুরে বেড়াতেন দালাল ফোড়েলের পেছনে। জালিয়তি আর চুরি করে ধরা পড়েছেন কয়েকবার। সে কারণে কিছু উত্তম- মধ্যমও হজম করেছেন তিনি।

মিয়াজান মিয়ার কপাল ফিরেছে বছর পনের আগে। তরফদার সাহেবের তরফ কেনার পরে পরেই। নিজের ভাগ্য ফেরার পর সদর থেকে এনে মিয়াজান মিয়ার ভাগ্যটাও ফিরিয়ে দিয়েছেন তরফদার সাহেব।

সেও এক কাহিনী। তরফ সংক্রান্ত ব্যাপারে সদরে এলেন নতুন তরফদার মাতম আলী মোল্ল্যা। সদরের কাচারী-বারান্দায় উঠতেই এক লোক এসে হুমড়ি খেয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়লো। ঘর থেকে কে একজন গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে বাইরে ফেলে দিলো। তরফদার তাকে তুলে ধরতেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো লোকটা। তরফদার সাহেব ঘটনাটা জানতে চাইলে, লোকটা বললো- এই কাচারীতে আমি বেগার খাটি হুজুর। কাগজপত্রের তামামকাজ করে দিই। কিন্তু নাস্তাপানির

www.pathagar.com

সামান্য ক'টা পয়সা ছাড়া কোন বেতন আমি পাইনে। ঘরে আমার বউ বাচ্চা দুদিন ধরে অনাহারে। তাই বাধ্য হয়ে এক প্রজার নিকট থেকে কিছু বকশিশ নিয়ে তার কাগজপত্র ঠিক করে দিয়েছিলাম। এই অপরাধেই আমাকে কাচারী থেকে বের করে দিলো হুজুর। বকশিশের টাকা ক'টাও কেড়ে নিলো। বাল বাচ্চা নিয়ে এখন নির্ঘাত অনাহারেই মরতে হবে আমাকে।

ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো লোকটা। কিন্তু সে যা বললো তা সর্বৈব মিথ্যা। ব্যাপারটা জালিয়তির। কাগজপত্রের কাজ করার সুযোগে জালিয়তি করে ধরা পড়েছে সে।

টাকা নিয়ে একজনের জমি আর একজনের নামে পার করে দিয়েছে। হাতে নাতে ধরাপড়ায়, ম্যানেজারের হুকুমে কাচারীর পেয়াদা তাকে কাচারী থেকে বের করে দিয়েছে গলা ধাক্কা দিয়ে।

ভেতরের এ ঘটনা তরফদার সাহেব জানলেন না। জানার কোন প্রয়োজন বোধও করলেন না। লোকটার কান্না দেখেই গলে গেলেন তিনি। ঘটনাচক্রে এই সময় একজন আল্‌গা দরদী হঠাৎ করেই বলে উঠলো- আহা, কাগজপত্রের কাজ লোকটা এত সুন্দর বুঝে আর করে দেয়, তাকে কি এইভাবে বের করে দেয়াটা ঠিক হলো?

এই এক কথাতেই খুলে গেল লোকটার নসীব। নতুন তরফ কিনেছেন তরফদার সাহেব। কাগজপত্রের কাজ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন একা একা। কাগজপত্র বোঝে, এমন একজন লোক তিনি মনে প্রাণে খুঁজছিলেন। লোকটা কাগজপত্রের কাজ জানে শুনেই তিনি লোকটাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন- আমার সেরেস্তায় একজন লোক দরকার। সত্যিই কি তুমি জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র বোঝো ?

হাতে আকাশ পেলো লোকটা। দরাজকণ্ঠে বললো- বুঝি মানে কি হুজুর? তামাম কাজ বুঝি। দীর্ঘদিন ধরেই তো এই কাজে লেগে আছি এখানে। নক্সা, খতিয়ান, জমাবন্দি, দাখিলা-দলীল, খাতাপত্র সব কিছু বুঝি হুজুর। গোটা একটা সেরেস্তা চালানো আমার কাছে একবোরেই মামুলী এক ব্যাপার।

এই লোকটাই মিয়াজান মিয়া। চোরের সাক্ষী গাঁইট কাটা। মিয়াজান মিয়ার সহযোগী আর এক জালিয়াত সাথে সাথেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সায় দিয়ে বললো- আরে, বলতে গেলে আমি আর এই মিয়াজান ভাই-আমরা দু'জনেই এই সেরেস্তাটা চালাই। আমরা যা কাজ জানি, তার অর্ধেকটাও নাকি এখানকার নায়েব-গোমস্তা জানে?

সায় দানকারীর কোন ফায়দা এতে হোক না হোক, এর পুরো ফায়দা জুটে গেল মিয়াজান মিয়ার নসীবে। তরফদার সাহেব তাঁকে সেই দিন সদর থেকে নিয়ে এলেন এবং নিজের সেরেস্তায় বসিয়ে দিলেন। কাগজপত্র না বুঝলে জালিয়াতি করা যায়না। মিয়াজান মিয়া এত দিনে কাজটা বেশ ভাল করেই বুঝে নিয়েছিলেন। ফলে, তাঁর কাজ দেখে তৃপ্ত হলেন তরফদার সাহেব। এতে করে তিনি প্রথমে গোমস্তা এবং পরে

www.pathagar.com

পুরোপুরি নায়েব পদে বহাল করলেন মিয়াজানকে। স্থান দিলেন নিজের বসতবাটির পাশেই। সেই থেকেই নায়েব পদে বহাল আছেন মিয়াজান মিয়া।

বলা বাহুল্য, ধুরন্ধর লোক মিয়াজান। দিনে দিনে বেশ কিছু জোতভূঁই বেনামীতে হস্তগত করলেও, বিশ্বস্ততায় ঘাটতি পড়ার ভয়ে, বাড়ীর জৌলুস বাড়াতে যাননি। ওটাকে তিনি অনেকটা দীনদরিদ্রের কুটির করেই রেখেছেন।

বাড়ীতে তাঁর ঘর যদিও অল্প, ঘরনী তাঁর অনেক। গোটা তিনেক আগে থেকেই ছিল, নায়েব হওয়ার পর আরো বাড়িয়েছেন গোটা দু'য়েক। এদের একজন মারা গেছে আগেই। অন্য একজন বেঁচে থেকেও ঘর করছে অন্যের। নায়েবের ভাত খায়নি। ঘরনী তাঁর একে একে পাঁচ পাঁচটি হলেও মিয়াজান মিয়ার সন্তান মাত্র একটিই। সাকুল্যে ঐ হুকুমউদ্দীন। এর একটা কারণ ছিল মস্তবড়। 'চোরা-চুন্নীর' ভয় তখন প্রকট ছিল খুবই। 'চোরা-চুন্নী' এক ধরণের প্রেত দম্পতির নাম। কোন সদ্যজাত শিশু দেখলেই পানি আসে এই প্রেতদম্পতির জিহবায়। তারা কায়দা করে চুরি করে সেই শিশু। লিঙ্গানুসারে চোরা কিংবা চুন্নী শিশুর রূপ ধারণ করে পড়ে থাকে বিছানায়। অন্যজন শিশুসহ চলে যায় তাল গাছে। দিন দেড়েকের মধ্যেই সেই শিশুরূপী প্রেত হাতপাত খিঁচিয়ে মরে যায় অবিকল। মরা শিশু কবর দিয়ে এলেই সে উঠে যায় তাল গাছে। স্বামী স্ত্রী মিলে তখন তারা ফলার করে সেই চুরি করা বাচ্চা দিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে চিবোয় তার হাড় হাড্ডি। এই হলো তৎকালীন চোরা চুন্নী সমাচার।

এই চোরা-চুন্নীকে ঠেকিয়ে রাখার কারণেই গর্ভবতীর পেছনে নিয়তই ফকির রাখে গৃহস্তেরা। ফকিরের নির্দ্দেশ মতোই সন্তান ভূমিষ্ঠের পর মাছকুটা-ময়লাযুক্ত বটি দিয়ে নাড়ী কাটে সন্তানের। প্রসূতিকে সন্তান সহ সঙ্গে সঙ্গে ঘরে তুলে রুদ্ধ করে দরজা-জানালা। জাল ঝুলায় প্রবেশ পথে। মরা গরুর মাথা রাখে দুয়ারে। হরেক রকম তাবিজ পলতে বেড়া-চালে, গোঁজার পরও তেনা কানি গুঁজে দিয়ে ঘরের সমুদয় ফাঁক-ফুটো এমনই নিপুনভাবে বন্ধ করে যে, চোরাচুন্নীর প্রবেশ পথ থাকুক আর না থাকুক, মুক্ত বায়ু মাথা কুটেও বিন্দু পরিমাণ প্রবেশ করার পথ পায়না সে ঘরে। এ কাহিনীর শেষ হয় না এখানেই। চোরাচুন্নীকে ঠেকিয়ে রাখার তাকিদেই সেই বদ্ধ ঘরের অভ্যন্তরে ধূপধুনাসহ বড়ই গাছের কাঁচা খড়ি জ্বালিয়ে শুকনো মরিচ পুড়িয়ে এমনই এক দুর্বিষহ ধোঁয়ার সৃষ্টি করে যে, নিতান্তই কাছিমের জীবন ছাড়া অন্য কোন স্বাভাবিক জীবনই আজরাইলকে অধিকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। বেচারা সদ্যজাত শিশুর আর সাধ্য কত! চোরা চুন্নীতে ধরুক আর না ধরুক, ধনুষ্টংকার সঙ্গে সঙ্গে জাপ্‌টে ধরে শিশুকে। ভূতে ধরার মতোই বার কয়েক দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পঞ্চত্ব লাভ করে অভাগা।

মিয়াজান মিয়ার গোন্ডা কয়েক সন্তানের মধ্যে এই শুকুম-উদ্দীনের জীবনটা কচ্ছপের চেয়েও খানিক বেশী শক্ত ছিল বলেই এই তুলাধুনার পরও সে টিকে আছে আজও। শুধু হুকুমউদ্দীনই নয়, এ অঞ্চলের অনেককেই সে যুগে এই তূলাধুনায়

www.pathagar.com

পড়তে হয়েছে ভূমিষ্ট হওয়ার পর পরই। যাদের জীবন শক্ত তারাই শুধু টিকে গেছে সে সময়।

বিধাতা পুরুষ হুকুমউদ্দীনের জীবনটাই শুধু শক্ত করে গড়েছেন কিন্তু পদার্থ বলে কোন কিছুই তার মাথা মগজে দেন নি। এ কারণেই, তার মতো অপদার্থ আর দু'টি ছিল না আশে পাশে। মিয়াজান মিয়া নিজে এটা হাড়ে হাড়ে বুঝলেও মুখে সেটা স্বীকার করতে রাজী হন নি কোন দিন। সবার সামনে, বিশেষ করে এক অন্তর্নিহিত কারণে তরফদার সাহেবের সামনে, হুকুম- উদ্দীনকে পদার্থ বলে চালানোর অবিরাম চেষ্টা করছেন তিনি। এ প্রচেষ্টায় বার বার অপদস্থ হয়েও হা'ল ছাড়েননি এ যাবত।

কিন্তু এই নৌকা বাইচের ঘটনায় তিনি মুষড়ে পড়েছেন একেবারেই। এই অযোগ্যতার দরুণ তিনি ছেলের উপর বিষিয়ে গেছেন হাড়ে হাড়ে। নিদারুণ মর্মদাহে তাঁর সারারাত কেটে গেছে অনিদ্রায়। পরের দিন সকালেও তিনি শান্তি খুঁজে পাননি। ঘুম থেকে উঠেই খুঁটিনাটি এটা সেটা নিয়ে তিনি বেশ একচোট ঠেংগিয়েছেন গৃহিনীদের। অতঃপর অশান্ত মন নিয়ে বৈঠক খানায় এসে চুপচাপ বসে আছেন একা একাই। হুঁকোর নলে মুখ দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছেন হতাশাবিদ্ধ যাতনায়।

অধিক বেলায় ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানায় ছুটে এলো হুকুম উদ্দীন। কানে তার পট্টি বাঁধা। পিতার মনের অবস্থা বোঝার মতো বুদ্ধি তার ছিল না। তাই সে এসেই সরাসরি প্রশ্ন করলো- "বাপজান, কাল আমাকে বলেছিলেন, আমি সোনার মেডেল পাবো, এনেছেন মেডেল?"

নায়েবের মাথায় আগুন ধরলো আবার। তিনি মুখ তুলে বললেন-"মানে?"

হাসি হাসি মুখ করে হেলে দুলে হুকুম উদ্দীন বললো- "মানে, আমি কাল কি পুরস্কার পেয়েছি?"

একখন্ড বাঁশ ছিল ঘরের কোণে। মুগুর বানানোর জন্যেই বোধ হয় রাখা ছিল ওটা। ওদিকে আঙ্গুল দিয়ে মিয়াজান মিযা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন- "ঐটা! ঐ পুরস্কারই দেয়া হয়েছে তোমাকে! আহম্মক কাঁহাকার!"

হতবুদ্ধি হুকুম উদ্দীন ঘাবড়ে গিয়ে বললো- "বারে! ওটা হবে কেন? ওটা কি কোন পুরস্কার?"

গর্জে উঠলেন মিয়াজান মিয়া। বললেন-"তোমার মতো গাঁড়োল আর কি পাবে ওর বেশী? অপদার্থ-উল্লুক! এতখানি আগে থেকে নাও ছেড়েও আগে যেতে পারলে না? তিন চারশো গজ পিছের নাও আগে বেরিয়ে গেল, আর তুমি? তুমি করলে কি? ঠ্যাং তুলে চিৎ হয়ে ধপাশ করে পড়ে গেলে পানিতে! বৈঠার ঘায়ে কানটা যদি গোটাটাই খুলে যেতো, তবেই তোমার উচিত শিক্ষা হতো।"

হুকুম উদ্দীন এর জবাবে বললো- "তা আমার কি দোষ? আপনিই তো আমাকে বার বার করে হাল ধরতে বললেন! আমি হা'ল না ধরে যদি কালু হা'ল ধরতো-"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিয়াজান মিয়া ঐ একইভাবে বললেন- "তাহলে ঐ কালুই সবার চোখে পড়তো! ঐ কালুরই সুখ্যাতি করতেন তরফদার সাহেব!

www.pathagar.com

তোমার খোঁজ পথের একটা কুকুরেও করতো না।"

হুকুমউদ্দীন এবার মিন মিন করে বললো-"আমি যে হাল ধরতে পারিনে!"

নায়েব আরো ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন-"কোন্ কাজটা পারো তুমি? লেখাপড়ায় তো বকলম! কোন্ গুণটা আছে তোমার? গান গাইতে গেলে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ বেরোয় গলা দিয়ে! লাঠি খেলতে গেলে অন্যের হাতের পিটন খেয়ে লম্বা হও! বাইচ খেলতে গেলে হা'ল সামলাতে পারোনা। একটা কেচ্ছা-কাহিনীও জানোনা- শালীশ দরবারে বসে দু'টো কথা বলারও ঢং নেই! তোমাকে পুছে কে?

এই বেপরোয়া আক্রমণের মুখে হুকুম উদ্দীন জবাব খুঁজে পেলোনা। সে নিরুপায় হয়ে বললো-"আমি পারিনে তো করবো কি?"

নায়েব তাঁর অন্তরের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ উগ্‌ড়ে দিতে লাগলেন। বললেন-"গলায় দড়ি দেবে। পারিনে! পারো না কেন? খাওয়ার বেলা তো এক সাথে তিন শান্‌কি না হলে উদর পূর্তি হয়না, কাজের বেলায় না কেন? কোন না কোনভাবে যদি তরফদার সাহেবের নজরে পড়তে না পারো, তিনি কি তোমায় ঠুকবেন? না তাঁর অমন গুণবতী মেয়েকে তিনি তোমার মতো আস্ত একটা উল্লুকের হাতে দেবেন?"

হুঁশবুদ্ধির অভাব থাকায় চক্ষুলজ্জারও বালাই ছিল না হুকুম উদ্দীনের। তাই সে সরাসরি বলে ফেললো- "না দেয়, না দিগ্‌গে। আমি তাহলে ঐ ঘাসুর বোনকেই বিয়ে করবো।"

এতক্ষণ বসে ছিলেন নায়েব সাহেব। এবার সগর্জনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- "খাবে কি? ওরে বেহায়া বেজম্মা। ঘাসুর বোনকে বিয়ে করে খাবেডা কি? ঘাসের বিচি? ঘাসু খায় পাইট খেটে। আমার এই চাকুরীটাও আজ আছে কাল নেই। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ইংরেজেরা যদি তরফদার সাহেবের এই তরফটা নাটোরের জমিদারীর সাথে এক করে দেয়, তাহলে তরফদার সাহেব হবেন সেরেফ একটা গেরস্থ। নায়েব গোমস্তা তার কোন কামে লাগবে? ঘাসুর বোনকে বিয়ে করে কি খাসপাতা খাবে?"

কয়েক ধাপ পিছিয়ে ইতিমধ্যেই দরজার কাছে এসেছিল হুকুম উদ্দীন। মাটির দিকে নজর দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠে পিঠ লাগিয়ে। এবার সে মাথাতুলে বললো- "তাহলে আর কি হলো? জমিদারীই যদি চলে যায়, তাহলে তো আর জমিদার হতে পারবোনা! মিছে মিছেই তার মেয়েকে বিয়ে করে লাভ কি?"

ক্ষোভে দুঃখে বিভ্রান্ত নায়েব সাহেব দাঁতের উপর দাঁত পিষে বললেন- "আরে। এ কোন্ উজ্ বুকরে! ওরে গো মুখ্যু গব্বস্রাব, হাতি মরে গেলেও তার দাম লাখ টাকা তা জানিস?"

পুরস্কারের আশায় এসে একটানা তিরস্কার শুনে শুনে হুকুম উদ্দীনের মনটাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আক্ষেপে অভিমানে সেও বিদ্রোহী কণ্ঠে জবাব দিলো-"তা আপনার কাছে হয়, হোগগে! জমিদারী না থাকলে আমার কাছে ঐ পরীবানুও যা, ঘাসুর বোন ও তাই। খামাখা ঐ ফায়ের পায়ে ত্যাল্ দিতে যাবো ক্যান্?"

ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল নায়েবের। বোমার মতো ফেটে পড়লেন তিনি।

www.pathagar.com

তবেরে শুয়ারকা বাচ্চা'- বলেই পা থেকে খড়ম খুলে ছুড়ে মারলেন হুকুম উদ্দীনের দিকে। খড়মে হাত দেয়া দেখেই আঁতকে উঠে হুকুম উদ্দীন দৌড় দিলো বাইরে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট খড়ম চোকাঠে আঘাত করে ছিটকে এলো ভেতরে।

[চার]

লাল মিয়ার বৈঠকখানায় জমজমাট আসর বসলো- বিকেল বেলা। কয়েক দিন একটানা নাও চালানোর পর সঙ্গীরা তার সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই, বাড়ী ফিরে তারা আর কেউ বেরোয়নি সেদিন। সারারাত ঘুম দিয়েছে একটানা। পরের দিন সকালেও ঘর ছেড়ে নড়েনি। বিছানায় পড়ে পড়ে পার করেছে দুপুর। ক্ষেতখামারের কাজ তাদের শেষ হয়েছে আগেই। শ্রাবণের শেষের দিকেই শেষ হয়েছে হাঁড়ির উপর ভেসে ভেসে বর্ষাকালের নিড়ানি। শেষ হয়েছে দল বেঁধে ঝরা-কল্‌মী দল দাম ফেপরী তোলা, আর হেঁকে হেঁকে গান গাওয়া। শেষ বর্ষায় কৃষকদের অখন্ড অবসর। দড়ি কাছি পাকানো, খালুই-পলুই বুনানো, আর গোবাদি পশুর পরিচর্য্যাই দিনের বেলার কাজ। রাতের বেলা হুঁকো- তামাক-পান আর জটলা করে কেচ্ছা-গানই অধিকাংশের অবলম্বন। ব্যতিক্রমের সংখ্যা অতি অল্প। সোনাকোলে এই ব্যতিক্রম চোখে পড়ে কদাচিত। সোনাকোলের কৃষকদের জমি আছে সকলেরই। পাঁচ বিঘে, দশ বিঘে, বিশ বিঘে। এছাড়া প্রায় সকলেই লাল মিয়ার আধিয়ার। দশ থেকে পনের বিঘেও আধি চাষে অনেকে। নামেই শুধু আধি। দিতে হয় সামান্য। তিন মনে এক মণ। কখনও বা তারও কম। লাল মিয়া একা মানুষ। পরিবার তার ছোট। জমিজমা অনেক। চাহিদা খুব সীমিত। খুশীমনে যে যা দেয়, তাতেই সে খুশী। পরিবারের খরচ আর জমিদারের খাজনা হলেই লাল মিয়া মহারাজ। ঠিকমতো ফসল হলে সোনা কোলের কৃষকেরাও তাই। সারা বছরের খোরাক পেলেই জনে জনে জগৎশেঠ। কেচ্ছা, গপ্প, কুটম্বিতার ধুম পড়ে ঘরে ঘরে।

লাল মিয়ার সঙ্গীরা সব সোনাকোলেরই ছেলে। তার আধিয়ারদের বেটা-পুত-ভাই-ভাস্তে। দু'একজন বাইরের লোকও আছে। দুর্দ্দিনে এদের পরিজনদের ডিঙ্গি বেচে মদদ দেয় লাল মিয়া। সুদিনে সে ডিঙ্গি বেঁধে ফুর্ত্তি করে এদের নিয়ে। বাইচ খেলে, লাঠি খেলে, দল বেঁধে গান করে তিথি-পরব-অনুষ্ঠানে।

সকাল থেকে ভর দুপুর ঘরের কোনে কাটিয়ে বিকেল বেলা ঘর ছেড়েছে লাল মিয়ার সঙ্গীরা। জড়ো হয়েছে লাল মিয়ার বৈঠক খানায়। এটি তাদের নিত্যদিনের আড্ডা, - দৈনন্দিন ব্যাপার। চিকন পাতির চওড়া মাদুর পেতে তারা জটলা করে বসেছে। হল্লা করে বিস্তি পিট্‌ছে সমানে। উল্লাসের নির্মম পেষণে তাস জোড়া বিধ্বস্ত। খেলছে মোটে চারজন। তাদের ঘিরে বসে আছে তিন-চারে বারো জন। জমে উঠেছে খেলা। মেতে উঠেছে সকলে। হারজিতের প্রশ্ন নিয়ে সকলেই উদ্গ্রীব। উল্লাসের আধিক্যে লাফিয়েই উঠছে কেউ। কেউ বা আবার সামান্য কারণেই চীৎকার করছে অবিরাম।

www.pathagar.com

শুধু লালমিয়াই আসরে আজ নির্জীব। নির্জীব থাকার ছেলে নয় লাল মিয়া। হঠাৎই এই ব্যতিক্রম। ইয়ারদের উৎসাহকে সে ধরে রেখেছে মাত্র। সায় দিচ্ছে মাঝে মধ্যে। কিন্তু নিজের কোন ভূমিকা নেই স্বতঃস্ফূর্ত। বাঁটার পর হাত তুলে সে পান্‌সে কণ্ঠে বললো- "সাহেব বড় বিত্তি! পাঞ্জার দফা রফা"

শুনেই লাফিয়ে উঠলো মজু। আরে রাখো তোমার সাহেব বড়। আমার হাতে ইস্তক নিয়ে মটকা সরেনা বিত্তি। পাঞ্জা এবার ঠেকায় কে?"

মজুর খেরু রাহার। খেরু অর্থে স্বপক্ষীয় খেলোয়ার। হাতের তাসে চাঁটি মেরে বাহার আলী মহোল্লাসে বলে উঠলো- "কি বললে সংড়া?" ইস্তক? মার খেরেশায় গুড়ের লালী। আমার হাতে পঞ্চাশ! এবার আর যাবে কোথায়?"

বিপরীত দলের সমর্থকদের চুপ্‌সে গেলো মুখ। বলেই চললো বাহার আলী - "ইস্তক মানে চার দশে পঞ্চাশ কাবার। পাঁচ-দশ আর লাগবেনা। শক্তি থাকলে ঠেকাও ওস্তাদ। পাঞ্জা এবার নির্ঘাত!"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো লাল মিয়া। চেয়ে রইলো তার দলের সমর্থকরা। জব্বার মিয়া লাল মিয়ার জবোরদস্ত সমর্থক। বাহারের হাত দেখে নিয়ে সে নেতিয়ে পড়ে বললো- আর হলো না ওস্তাদ! এবার পাঞ্জাব ওরা ধরবেই!"

লালের খেরু বছির। হাতের তাস গুছিয়ে নিয়ে সে বসে ছিল চুপ চাপ। এবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে তাকালো। অসামান্য গম্ভীরতা নিয়ে সে ধীরে ধীরে বললো- "কি বললে? পাঞ্জা?

হো হো করে হেসে উঠলো অনেকে। জনৈক প্রশ্ন করলো- "এতক্ষণ ছিলে কোথায় বাপধন? ফেলুর নানীর লেপের তলে?"

একইভাবে বছির বললো- "মানে?

জব্বার মিয়া উত্তর দিলো-"এতক্ষণে জিজ্ঞেস্ করছো পাঞ্জা কিনা? কানে কয় বস্তা তুলা রেখেছো বাবা?"

বছির কিছু বলার আগেই ময়জুদ্দিন মজু বললো-"চোঙ্গায় পানি দাওনি এতক্ষণও? পারলে পাঞ্জা ঠেকাও !"

পাশের গাদা থেকে একটা ছয় ফোটার তাস টেনে সেটা সশব্দে মাদুরের উপর মেরে গর্জে উঠলো বছির উদ্দীন। বললো-"অত লালী আধাসের! এই পাঞ্জার কবর!"

সবিস্ময়ে সকলেই প্রশ্ন করলো-"মানে?"

খোঁচা খাওয়া গোখরোর মতো ফুঁসতে ফুঁসতে বছির উদ্দীন বললো- "মানে এই ছক্কা! একটা পিটও দেবোনা। পাঞ্জাকে তো পাঁকে পুঁতে ফেলবোই, তার উপর আবার ছক্কা ধরে ছাড়বো।"

লালের দলের সমর্থকদের আর কোন ভরসাই ছিল না। হা'ল তারা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে বসেছিল হতাশ হয়ে। এতটা তাই তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারলো না। একারণেই জব্বার মিয়া ঠেশ্ দিয়ে বললো- "কি করে? মুখ দিয়ে? এদের হাত মিলে গেছে। তুমি ঠেকাবে কি দিয়ে? গায়ের জোরে?

www.pathagar.com

বছির উদ্দীনও দাঁত পিষে বললো, "আজ্ঞে না, তাসের জোরে। আমার হাতে গোলাম, চৌদ্দ, ঠেক্কা নিয়ে পাঁচ পাঁচ খানা রং! আর তার সাথে মটকা-সরেশ বিন্তি। পয়লা খেলা আমার। ইয়ারকি পাতা হ্যায়? হুড়াসাগর পার করে দেবোনা?"

উজ্জ্বল হলো জব্বার মিয়ার মুখমন্ডল। তার চোখ দুটো ফুটে উঠলো বিকশিত সাপ্‌লার মতো। সে লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো বছির উদ্দীনের কাছে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার ঘাড়ের উপর। বললো-"ওরে পাগ্‌লী, বাড় পান্তা। দেখি- দেখি।"

বছির বললো, "দেখবি কি? এই বিছিয়ে দিলাম হাত! পয়লা খেলা আমার। ধরুক দেখি কার সাদ্দি, একটা পিট ধরুক!"

বছির তার হাতের তাস বিছিয়ে দিলো মাদুরের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই তাসের উপর ঝুঁকে পড়লো সকলেই। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সকলেই একসাথে চীৎকার করে উঠলো- "ওরে ব্বাপ্! সত্যিইতো! গেছে পাঞ্জা বাঘের পেটে!"

বিপুল করতালী আর হৈ হুল্লোরের ধাক্কায় কনকন করে বেজে উঠলো বৈঠকখানার কড়িবর্গা। বছির মিয়ার পিঠে সজোরে চাপ্পর মেরে জব্বার মিয়া বললো-"সাব্বাস বছির! ওস্তাদী একখান দেখালি বটে আজ!"

আবেগে ও উচ্ছাসে মাতামাতি করতে লাগলো সকলেই। উল্লাসে আর হুল্লোরে ছেদ পড়লো খেলায়।

কিন্তু লাল মিয়ার সাড়া নেই তখনও। পরিস্থিতির তুলনায় নেই কোন আশানুরুপ প্রতিক্রিয়া। তখনও সে উদাস। উদাস সে সারাদিনই। রাতটাও তার সুনিদ্রায় কাটেনি। এক আনমনা অনুভূতি চাঙ্গা করে রেখেছে তার শিরা উপশিরা। এক খেয়ালী প্রবণতা সতেজ করে রেখেছে তার মস্তিকের তন্ত্রীগুলো। সারারাত নেতিয়ে পড়তে দেয়নি। তার মনের কোণে একই প্রশ্ন উঁকি মারছে বারবার-"এই কি সেই?"

সে দিনও তার দিন কেটেছে এমনিভাবে। একদিন নয় অনেক দিন। রজব মুন্সীর মক্তব আর ধীরেন পন্ডিতের পাঠশালায় তার যাতায়াত শেষ হয়েছে তখন। নব যৌবনের আভাস তার নাকের নীচে উঁকি মারছে সবে মাত্র। অফুরন্ত আবেগ আর নব নব শিহরণের ছোঁয়ায় মন তখন স্যাঁতসেঁতে। মেলা বাজার, খেলাধূলা আর গান-বাজনার প্রতি তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমেই। এমনই দিনে মেলা বসেছে সোনাকোলে। পৌষ পার্বনের মেলা। গ্রামের নীচেই ডহর। ডহরের উপর বটগাছ। বিশাল ও বিস্তৃর্ণ। বিঘা পাঁচেক বেড়। মেলা বসেছে তারই নীচে। প্রতি বছরই মেলা বসে এই বটতলায়। সোনাকোলের পৌষপার্বনের মেলা তখন লালোরের বারোয়ারীর মতই ডাক-সাইটে। তিসিখালীর মতোই নামকরা। দুর দূরান্ত থেকে তখন লোক আসে দোনাকোলো-স্ত্রী পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে মেলা। দুপুরের পর জমে উঠেছে ইমাম যাত্রার আসর। মিষ্টিরোদে দাঁড়িয়ে গান শুনছে স্রোতারা। আসর ঘিরে বসে আছে বালক-বৃদ্ধ যুবা। বসে আছে লাল মিয়া নিজেও। অশথমূলের এক পাশে মাটির এক উঁচু ঢিপি। সেই ঢিপির উপর বসে আছে আশেপাশের বর্ষিয়ান মহিলারা। তাদের পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বালিকারা, কিশোরীরা।

www.pathagar.com

তুলকালাম যুদ্ধ চলছে আসরে। ইমাম হোসেনের যুদ্ধ হচ্ছে এজিদের সৈন্যের সাথে। গৈগেরামের দল। এদের অভিনয়ের বড় দিক লম্ফ-ঝম্ফ-গর্জন। ভূমিটাই মঞ্চ। মাটির উপর লড়াই। যোদ্ধাদের পদাঘাতে ধূলো উড়ছে বেধারাক। ধূলি-কণার বেহিসেবী বিস্তারে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই মরু ভূমির কারবালা। ঢোল করতালের বেপরোয়া তৎপরতায় দশদিক মূহ্যমান। ধূলায় অন্ধকার যুদ্ধ। এই ঝকমারি যুদ্ধের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল লাল মিয়া। দুই যোদ্ধার বিরামহীন লড়াই। ঘায়ের পর ঘা খেয়ে বাঁশের তরবারি থেঁতলে গেছে উভয়েরই। তবু যুদ্ধ চলছেই। দন্ডের পর দন্ডধরে। 'কেহ নাহি হারে আর কেহ নাহি জিনে।' শেষহীন অন্তহীন। জয়পরাজয় অনুধাবনে আগ্রহী দর্শকেরা নেতিয়ে পড়লো ক্রমেই। নেতিয়ে পড়লো লালমিয়াও। অবসাদ আর ক্লান্তিতে সে হাই তুললো বার কয়েক। আনমনে চোখ ফেরালো অন্য দিকে। উদ্দেশ্য হীন দৃষ্টি তার ঘুরতে ঘুরতে এসে আটকে গেল অশথমূলের ঢিপির উপর। দন্ডায়মানা কিশোরীদের একজনের মুখের উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। পলকহীন নেত্রে সেই মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো লাল-মিয়া। একি মনমোহিনী মূর্তি! টানা টানা চোখ, লম্বা লম্বা চুল, আর পটে আঁকা অবয়ব। ঠোঁট দুটি ঠিক যেন প্রতিমার মুখের মতো সচেতনে খোদাই করা। অল্প একটু হাসিতেই রাশি রাশি ঝরে পড়ছে কুসুমের সুষমা। মুখখানা সত্যি সত্যিই মনোরমই ছিল।'আপনার মনের মাধুরী মিশায়ে' সেটাকে আরো অপরূপ করে তুললো লাল মিয়া। তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলো সেই দিকে। হারিয়ে গেল কারবালার সেই মহারণ। মিলিয়েগেল ইমাম হোসেনের বীরত্ব। লুপ্ত হলো শত্রুপক্ষের উল্লাস আর মিত্রপক্ষের বিলাপ। ঐ একখানা মুখ ছাড়া গোটা বিশ্বটাই তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল তলে। খানিক পরে আর চেয়ে চেয়ে দেখারও প্রয়োজন রইলোনা। অনুভূতির আধিক্যে সে চোখ মুজেই উপভোগ করতে লাগলো সেই মুখশ্রীর মাধুর্য্য। এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে তার খেয়াল নেই। আসর ভাঙ্গার কোলহলে সে চমকে উঠে চেয়ে দেখে ও মুখ আর নেই ওখানে। পাতলা হয়েছে ভিড়। দলে দলে লোক যাচ্ছে নিজ নিজ গৃহপানে।

ছুটে গেল লাল মিয়া। খোঁজ করলো বটতলায়। খোঁজ করলো চারদিকে। কিন্তু নিস্ফল। বেসুমার মানুষের ঘূর্ণাবর্তের মাঝে ঐ এক খানা মুখের আরসন্ধান সে পেলোনা। সর্বস্ব হারানোর রিক্ততা নিয়ে সে যখন ফিরে এলো ঘরে, তখন গড়িয়ে গেছে সন্ধ্যা।

এরপর এক অব্যক্তব্য বেদনায় দিনকেটেছে লাল মিয়ার। কিছুদিন তার মন যায়নি কিছুতেই। সমস্যা দূরপনেয়। নিজে সে কিশোর। নাম-পরিচয়হীন সেই অজ্ঞাত কিশোরীর তাকে সন্ধানই বা দেয় কে, আর সে কথা সে বলেই বা কাকে! যা বলা যায় তার বিহিত আছে। যা বলা যায় না তার আছে নীরব যাতনা। মনের ব্যথা মনে চেপে সে উদাস হয়ে অনেক দিন ঘুরে ফিরেছে এগাঁ সেগাঁ। খুঁজে দেখেছে মেলাবাজার। কিন্তু সেই হারিয়ে যাওয়া মুখখানি আর কোথাও সে পায়নি।

অতঃপর গড়িয়ে গেছে কয়েকটি বছর। যৌবনের পৌরষে হারিয়ে গেছে অতীত। কচিমনের কাকলী থেমে গেছে ধীরে ধীরে। টুটে গেছে চমক। মন থেকে মুছে

www.pathagar.com

গেছে সেদিনের সেই নাম-নাজানা ভাল লাগা মুখ। এখন সে এক ভিন্নধর্মী আস্বাদনে উদগ্রীব। এখন সে পারদর্শিতার প্রতিযোগিতায় মগ্ন।

কিন্তু গতকাল হঠাৎই ফের ঘুরে গেছে স্রোত। সেই ফোউৎ-পড়া বাঁশঝাড়ে নজর দিয়েই চমক লেগেছে আবার। ফেরার পথে ফের তাকে ঘাটে দেখে মন টলেছে পুনরায়। ফুল সাজে সজ্জিতা সেই রমনীর মুখখানা সরাসরি দৃষ্টি গোচর না হলেও, সেই বিস্মৃত মুখ খানির আবছা একটা প্রতিকৃতি এই মুখের প্রেক্ষাপটে দেখতে পেয়েছে সে। সেই মুখের অস্পষ্ট ভাসা ভাসা আদল এই মুখের ক্যানভাসে খুঁজে পেয়েছে আবার।

ইয়ারবন্ধু পরিবেষ্টিত সরস উল্লাসে সে তখন গান ধরেছে গলা ছেড়ে। চটুল পরিবেশের তাৎক্ষনিক চাঞ্চল্যে সে তখন মন দিয়েছে রসিকতায়। কিন্তু সঙ্গী সাথী বিদায় করে নৌকা বেঁধে সে যখন ঘরে ফিরেছে একা, তখনই তার শুরু হয়েছে প্রতিক্রীয়া। নিঃসঙ্গ রজনীর বিনিদ্র মুহূর্তে সেই স্মৃতি জেগে উঠেছে আবার। সেই দাহ শুরু হয়েছে নতুন করে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন আসছে মনে- এই কি সেই?"

চাওয়া আর পাওয়াটা এক গোত্রীয় নয়। অসবর্ণ এরা। লাল মিয়ার তা জানা। অতীতের অভিজ্ঞতা। এই দুইয়ের মাঝে আছে এক দুস্তর পারাবার। সেতু বন্ধন সততই দুঃসাধ্য। লাল মিয়া আজ সাবালক। পিতামাতা গতায়ু। নিজেই নিজের অভিভাবক। সেদিনের সেই নাজুক পরিবেশও নেই আজ। এছাড়া এ মেয়েকে একাই সে দেখেনি তার সঙ্গীরাও দেখেছে। সমজান আলী বিলবাথানের অনেককেই জানে। সমজান আলীই ভার নিয়েছে সন্ধানের। সবই ঠিক। তবু প্রশ্ন জাগে অনেক। জাগে অনেক শংকা। এমনও তো হতে পারে-সে আদৌ কোন মেয়ে নয় সে গাঁয়ের! ভিন এলাকার কেউ মেলা দেখতে এসেছিল বিলবাথানে। এছাড়াও তো কিন্তু আছে হাজার একটা।

এ কারণেই লাল মিয়ার আজ মন ছিলনা খেলায়। উদাসীন সে শুরু থেকেই। বিছানো তাস গুটিয়ে নিয়ে লাল মিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলো বছির। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকার পর সে প্রশ্ন করলো- "কি ব্যাপার ওস্তাদ? অসুখ-টসুখ নাকি?

লাল মিয়া বেখেয়ালে বললো-"এ্যাঁ ?"

বছির ফের বললো-"এসে অবধি দেখছি, কেমন যেন মন মরা তুমি! এমন একটা সাংঘাতিক কান্ড করে ফেললাম, তবু তুমি তেমন কিছুই বলছোনা। অন্যদিন হলে তো একাই তুমি মাথায় তুলতে বাড়ীটা। ব্যাপার কি, কও দেখি?"

লাল মিয়ার উদাসিনতা এতক্ষণে চোখে পড়লো সকলের। সকলে তার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলো। ম্লান হাসি হেসে লাল মিয়া মিথ্যা করে বললো- "হ্যাঁ, রাত থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না তেমন।"

শুনেই দু'তিন জন হাত দিলো তার কাপালে। উষ্ণতা পরীক্ষা করে একজন বললো- "একটুও তো গরম হয়নি কপাল।"

www.pathagar.com

ফাঁপড়ে পড়লো লালমিয়া। একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললো- "এ্যাঁ! তাই নাকি? কিন্তু তাও কেন যেন সুখ পাচ্ছিনে তেমন।"

তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মিটিমিটি হাসতে লাগলো বাহার আলী। তা দেখে মজু বললো, "কি হলো? তুই আবার ফিচ্‌কি মারছিস্ ক্যান?"

হাসতে হাসতে বাহার বললো- "ফিচ্‌কিনা, ফিচ্‌কি না। সত্যি সত্যিই অসুখ হয়েছে ওস্তাদের। আমি ধরে ফেলেছি রোগ।"

বছির বললো - "রোগ! কি রোগ?"

জবাবে বাহার বললো- চিন্তা মনি রোগ। বড় ডাকাতে ব্যারাম।"

বছির ফের প্রশ্ন করলো-"মানে?"

হেসে ফেললো বাহার। বললো-"তুই একটা উল্লুক। এর আবার মানে কি? রোগ ঐ একটাই।" সুর করে বললো- "ফুল কে পরায় গলে।"

বিপুল হাস্যরোলে ফেটে পড়লো বৈঠকখানা। রসিকতার মাদকতায় মাতাল হলো অনেকেই।

বছির বললো- "ঠিক ঠিক! তুই ঠিক বলেছিস্। ওটা আমি টের পেয়েছি কালই।"

চোখ দুটো ছানা বড়া করে জব্বার মিয়া জিজ্ঞেস করলো- "কি কয় ওস্তাদ ? ওসব কি কয় ওরা?

লাল মিয়া এর জবাবে স্মিতহাস্যে বললো-" কি জানি, কি বলছে তা ওরাই জানে।

বাহার আলী বাঁকা চোখে বললো-" ডুবে ডুবে পানি খেয়োনা ওস্তাদ। সমজানের কাছে শুনেছি আমি সব।"

গম্ভীর হলো মজু। কপট গাম্ভির্য্যে মাথা দুলিয়ে বললো-"ওরে ওস্তাদ। মনে মনে এতখানি? ঝড় গেল, বাও গেল, ফিঙ্গের নাচে আম পড়লো? মানে এতদিনে মন টললো মুনির?"

কিঞ্চিৎ রুষ্ট হলো বছির। বললো-" যেমন তোমার বুদ্ধি, তেমনি কথার ছিরি! এর মধ্যে ফিঙে দেখলে কোথায়? ওটা কি তোমার ঐ ল্যাদন আলীর বোন মার্কা মেয়ে? একেবারে রাজকন্যা। অমন মেয়ে দেখেও যদি মন না টলে ওস্তাদের, তবে কি আর মেনা-মোষের বাছুর দেখে টলবে?"

নিজেকে শুধরে নিলো মজু। বললো, "তা অবশ্যি ঠিক! মেয়ে তো নয় আস্ত একটা পরী। যার ঘরে যাবে ও, তার ঘর দিনেরাতে উজালা। শালা মাল একখান বটে।"

এবার ধমকে উঠলো বাহার। বললো, "এই শালা চুপ্! এখন আর কি আমাদের বলা চলে ও কথা? ও যে এখন গুরুমাতা আমাদের!"

আঁতকে উঠে ময়েজুদ্দীন কামড় খেলো জিহ্বায়। দুই হাতে নিজের দুই কান ধরে বললো-"তওবা- তওবা! তাইতো! ও কথা খেয়ালই করিনি আমি।"

এদের ভাব দেখে লাল মিয়া আর চুপ থাকতে পারলোনা। হো হো করে হেসে উঠে বললো-"গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তা!"

www.pathagar.com

বাহার বললো-"মানে ?"

লাল বললো-মানে 'মাছ থাকলো নদীতে, বউ বসেছে বটিতে!" তোদের ভাবখানা এই আর কি।"

মাথা নেড়ে বছির বললো- "উঁহুঁ ওস্তাদ, ও কথা বললে শুনছিনে। মনে যখন ধরেছে তোমার, তখন, যেভাবেই হোক, গুরু মাতা ওকে আমরা বানাবোই।

ইতিমধ্যেই সমজান আলী এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল দুয়ারের এক পাশে। এদের কথা শুনে সে এগিয়ে এসে বললো- "সেগুড়ে বালী!"

সচকিত হয়ে তার দিকে চোখ ফেরালো সকলেই। বছির বললো-"বালী" সমজান বললো "এই মাত্র খোঁজ নিয়ে আসছি। যত কথাই বলো, ও আঙ্গুর টক!"

ধড়াশ্ করে কেঁপে উঠলো লাল মিয়ার বুক খানা। শুকিয়ে গেলো মুখ। দুনিয়ার সব অন্ধকার এক সাথে ঘিরে ফেললো তাকে। তবে কি সে বিবাহিতা! সকলের অলক্ষ্যে কাঁপতে লাগলো লাল মিয়া। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোলনা।

প্রশ্ন করলো বাহার-"কেন, টক কেন?"

জবাবে সমজান বললো- "বিল বাথানের তরফদারের মেয়ে ওটা। বিয়ে হয়নি ঠিকই। কিন্তু একে তো সে জমিদারের মেয়ে, তার উপর আবার ওস্তাদের বাপের সাথে ওর বাপের ছিল আজন্মের শত্রুতা। এই সেদিনও তো দুরমার মামলা চললো দুইয়ের মধ্যে। এই ঘরে আর মেয়ে দেবে তরফদার?"

পাথর নেমে গেল লাল মিয়ার বুক থেকে। শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো বছির। বললো- "দিতেই হবে। দেবেনা মানে? ওস্তাদ কি কোন দিক দিয়ে তার চেয়ে কম? এছাড়া এমন সুন্দর পাত্তর এ তল্লাটে আর কোথাও খুঁজে পাবে তরফদার?"

কথাটা মনে ধরলো সমজানের। সে সায় দিয়ে বললো-"কথাটাতো ঠিকই। মেয়েটা দেখতেও পরীর মতো। নামটাও পরীবানু। ওর উপযুক্ত বর তো আর এ তল্লাটে দেখিনা। ওর পাশে একমাত্র ওস্তাদকেই মানায়। কিন্তু -

বাহার আলী প্রত্যয়ের সাথে বললো-"ব্যস্! ওসব কিন্তু ফিন্তু রাখো। মেয়েটাও পরী, আমাদের ওস্তাদও হুর। এই হুর-পরীর মিলন আমরা ঘটিয়েই ছাড়বো।

সংশয় জাগলো দু'একজনের মনে। তারা প্রশ্ন করলো-"ক্যাম্নে? তার মেয়ে সে যদি না দেয়, ক্যামনে তা ঘটাবে?"

ক্ষেপে উঠলো বাহার। বললো-"সব শালারা গাঁড়োল। ক্যাম্নে তা বুঝোনা? এতগুলো মানুষ আমরা ইচ্ছে করলে কি করতে না পারি? আমাদের ভয়ে এ এলাকা কাঁপে, আর তরফদার দেবে না মেয়ে? সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে বাঁকা আঙ্গুল চালাবো। শালা আমাদের তো সে বদনাম আছেই। না কি বলিস্রে বছির?"

বদনাম এদের আছে খানিক। সে বদনাম লাল মিয়ারও আছে। বিশেষতঃ সে যখন এদের দলের সর্দ্দার। একটা গোলমালকে কেন্দ্র করে এরা একটা ভরা হাট ভেংগে দিয়েছিল গোটা হাটের লোককে পিটিয়ে। পাইক বরকন্দাজ সহ কোন এক গোমস্তাকে এরা শীতের রাতে বিলের পানিতে চুপিয়ে ছিল প্রজার নিকট থেকে

www.pathagar.com

বাড়তি পয়সা নেয়ার জন্যে। মাতাল এক পঞ্চায়েতকে পিটে এরা পাটাতন করে এসেছিল তারই এলাকায় গান করতে গিয়ে। হুড় হাঙ্গামায় বড় একটা যায়না এরা। তবুও এদের দোহাই খাটে ছোট খাটো জবর-দখলে। এক বয়সী বিশ-পচিশটি জোয়ান ছেলের এমন জোট দশ-বিশটা গাঁয়ে তখন ছিল না। বাউন্ডেলের মতো এরা প্রায়শঃই গ্রামেগঞ্জে গান বাজনা করে ঘুরে বেড়াতো বলে অনেকেই এদের 'বাউরে' বলে আখ্যায়িত করতো।

বাহারের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো সকলেই। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিটা অনুমান করতে না পেরে জনৈক প্রশ্ন করলো-"সেই বাঁকা আঙ্গুলটা কি?"

বাহার বললো-"চুরি। দরকার হলে পরীবানুকে চুরি করবো আমরা।

অনেকে সমর্থন দিয়ে বললো-"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করবো।"

এবার মুখ খুললো লাল মিয়া। মুখ তাকে খুলতেই হলো। ভয় নেই তারও মনে ঠিকই। কিন্তু সংশয় আছে অনেক। তাই, সে সখেদে বললো, "হায়রে! একেই বলে জোলার বুদ্ধি তিন চোঙ্গা! যাকে চুরি করে আনবে তোমরা, সে তো আর গরুছাগল নয়, মানুষ। চুরি করে আনলেই যে সে ঘর করবে একজনের, এ ধারণা ক্যামনে হলো তোমাদের?"

এবার সোচ্চার কণ্ঠে সমজান আলী বললো, "ওটা আমাদের দেখার কথা নয় ওস্তাদ, তোমার দেখার কথা। তোমার দিক তুমি আগে সামলাও, আমাদেরটা পরে।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সমস্বরে বললো-"ঠিক-ঠিক-ঠিক!"

[পাঁচ]

গুড়গুড় করে ঢাক বাজছে এদিক ওদিক। ঘনিয়ে আসছে দূর্গাপূজা। শারদীয় উৎসব। আনন্দের আবিরে রাঙ্গা হয়ে উঠছে হিন্দু সমাজ। মুসলমান সমাজও কম যায়না বড় একটা। একই সাথে নেচে উঠছে তারাও অনেকেই। স্বচ্ছল পরিবারের অনেকের মনই পুলকিত হয়ে উঠছে ঢাকের এই আওয়াজে। অপর দিকে, শুকিয়ে আসছে গরীব প্রজার বুক। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল প্রজার উপরই বাঁকী খাজনা পরিশোধের তাকিদ বাড়ছে দিন দিন। এ মৌসুম বাকী খাজনা পরিশোধের যে মৌসুম।

জমিদারী সেরেস্তায় খাজনা আদায়ের জোর মৌসুম চারটিঃ পাকা ধানের অগ্রায়নী আদায়, রবিশস্যের বৈশাখী আদায়, পাট তিলের আষাঢ়ী আদায় আর সব শেষে দুর্গাপূজার মৌসুমে শারদীয় আদায়। হিন্দু-মুসলিম সকল জমিদারের আদায় মৌসুম এক ও অভিন্ন। শারদীয় মৌসুমের তোড়জোড়টা সর্বাধিক।

তরফদার সাহেবের কাচারী ঘরে ভিড় জমেছে সকাল থেকেই। শারদীয় আদায়ের আজ শেষ দিন। খাজনা নিয়ে হাজির হয়েছে আশে-পাশের প্রজারা। কেউ এসেছে স্বইচ্ছায়। কাউকে তার ইচ্ছে বিরুদ্ধে ধরে এনেছে পেয়াদা। কাঠের একটা হাত বাক্শো সামনে নিয়ে খাতা খুলে বসে আছেন বিল বাথানের নায়েব মিয়াজান

www.pathagar.com

মিয়া। দূর এলাকার গোমস্তারা জমা দিয়েছে আদায়। নায়েব এবার মন দিয়েছেন আশে পাশের আদায়ে। তাঁর একপাশে জমাবন্দীর খাতা। অন্য পাশে একটার উপর একটা করে ভুলে সাজানো আনী-দুয়ানী, সিকি-আধুলীর পৃথক পৃথক ভাগা। পয়সা-আধলা-পোয়া পয়সার ভাগাও একপাশে আছে। নিতান্তই দুঃস্থজনের খুঁটে পেতে যোগাড় করা খাজনা এসব। এক টাকা পূর্তি হলেই ভাগাগুলো বাক্‌শের মধ্যে পাচার করছেন নায়েব সাহেব। আদায় এবার আশানুরূপ নয়। কর্মদক্ষতা নিয়ে বাহাদুরী করার তাঁর সুযোগ খুবই কম। তাই নায়েব বাবুর মেজাজ আজ সকাল থেকেই তিরিক্কে।

এক নজরে সবাইকে দেখে নিয়ে নায়েব সাহেব হাঁক দিলেন- "আছিরুদ্দীন"-

হাঁক শুনে আছির পেয়াদা এসে দাঁড়াতেই নায়েব তাকে বললেন- "গো'দে কই, গোদা ধর?"

আছিরুদ্দীন ঘাড় চুলকিয়ে বললো-"ওকে পাওয়া যায়নি হুজুর। গাঁয়ে গিয়ে না ঢুকতেই ও ব্যাটা পালিয়েছে।"

- পালিয়েছে তো কি হয়েছে ? বাড়ীতে ওর গরু বাছুর ছিলনা? বউ বাচ্চা ?

- জি, তাতো ছিল হুজুর। কিন্তু পূজার সময়। গাঁয়ের প্রধান-মাতবর বললে- এ সময় আর হুড় হাঙ্গামা করোনা। ওর ব্যবস্থা আমরাই করে দেবোখন।

- ব্যস্! তবে আর কি! ঐ শুনেই তুমি নাচতে নাচতে চলে এলে?

- হুজুর!

- তোমাকে কি ঐ বাহানা শোনার জন্যে গাঁয়ে পাঠানো হয়েছিল? না ঐ বাহানা শুনতে গেলে খাজনা দিতে আসবে কেউ?"

- তা কথা হলো-

- যত্তসব ফাঁকি বাজের দল! পারলে কাজ করো, না পারলে ছেড়ে দাও। ঐ সব কেচ্ছা শোনার জন্যে তোমাকে পয়সা দিয়ে রাখা হয়নি।

পেয়াদা কিছু বলার আগেই নায়েব সাহেব নজর দিলেন খাতায়। খাতা থেকে চোখ তুলে হাঁকলেন- "- ফোক্‌ড়ে -"

মাথা গুঁজে বসেছিল ফকির আলী, ফোক্‌ড়ে। সে কাছে এসে দাঁড়াতেই নায়েব বাবু বললেন-"পয়সা ফ্যাল্। দুই টাকা দশ আনা। ছয়মাস ধরে এওেলা দিয়েও পাওয়া যায়না ব্যাটাকে। জমি খাস্, খাজনা দিতে হবে না?"

আছিরুদ্দীন এবার তার কর্তব্যপরায়নতা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সোচ্চার কণ্ঠে বললো- "এবারও সট্‌কে পড়ার তাল করছিল হুজুর। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছি ব্যাটাকে।"

নায়েব সাহেব ভ্রূ-কুঁচ্‌কে বললেন-"বটে! বের কর। পুরো দুই টাকা দশ আনা গুণে গুণে দিয়ে তবে যাবি এখান থেকে।"

ফকির আলী নত চোখে বললো- "এবারের মুতো মাফ করে দ্যান হুজুর। খুবই

www.pathagar.com

ঠেকার মধ্যে আছি। সামনের মাসে যেমুন করে হোক, শোধ করবো অদ্দেকটা।"

নায়েব বললেন- "মানে?"

ফকির বললো- "পূজার সুমায় হুজুর। বাড়ীত্ বিটি-জাঁওই আনিচি। লতুন জাঁত্তই। সাথে আরো লতুন কুটুম আচ্ছে (এসেছে) পাড়া-পড়শী সক্কলেরই লাড়ু-বড়ু, খই-মুড়ি, গুড়-লারকোল-মানে সব রকম যোগাড়-যন্তর সারা। বিটি-জাঁত্তই লিয়্যা তারা কি ধুম লাগাচে (লাগিয়েছে)। কিন্তুক হাতে একটা পয়সা না থাকায়, আমি এখনও কিছুই করতে পারিনি হুজুর! একটা মাত্তর কাঁসার কলসী সম্বল। কলসীড্যা লিয়্যা (নিয়ে) সারাবেলা ঘুরিচি। কিন্তুক কেউ লিতে আজ্ঞী হয়নি। ওড্যা বন্ধক দিয়্যা আনা-আষ্টেক পয়সা যুদি যোগাড় করবার না পারি, তাহলে আর মান-সম্মান কিছুই আমার থাকবেনা হুজুর! খাজনা দিবো কেমুন কর‍্যা?"

ধমকে উঠলেন নায়েব সাহেব। বললেন- "আরে থাম ব্যাটা লবারের বাচ্চা! মান সম্মান দেখাচ্ছে! তোর ঐ মান সম্মান দেখার জন্যে জমিদারী কেনা হয়নি। খাজনা দিতে না পারলে জমিদারের জমিদারীও লাটে উঠে। জমিদারেরও মান সম্মান থাকে না। ওসব প্যান-প্যানানী রাখ। পয়সা ফ্যাল্।"

হাত জোড় করে ফকির আলী বললে- "কুন্‌টি থাক্যা ফেলবো হুজুর। ফাটা পয়সা হাতে নাই।

চোখে আগুন ছুটলো নায়েবের। বললেন "বটে! ঠিক আছে! পয়সা বেরোয় কিনা দেখছি।"-বলেই তিনি পেয়াদাকে হাঁক দিলেন, "আছিরুদ্দীন"-

আছিরুদ্দীন হাজির হতেই তিনি হুকুম করলেন- "এই ব্যাটাকে বেঁধে রাখ বারান্দায়। পাওনা-গোন্ডা আদায় হলে তবেই এর মুক্তি।"

আছিরুদ্দীন এগুলো। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো ফকির আলী। কাঁদতে কাঁদতে বললো- "দোহাই হুজুর, বাড়ীত্ আমার লতুন কটুম!"

তার আর কোন কথায় কান দিলেন না নায়েব। আছিরুদ্দীন এসে বিলাপরত ফকিরকে বাইরে নিয়ে যেতেই নায়েব সাহেব চোখ তুললেন অন্যের দিকে। এবার কাজ হলো যাদুর মতো। নাম ডাকার আগেই এবার উঠে এলো অনেকে। তারা মানের ভয়ে স্বগরজে শোধ করলো খাজনা। যারা একান্তই পারলো না, তারা দুই হাত জোড় করে এক সাথে দাঁড়ালো। এক সপ্তাহের মধ্যে পাওনা আদি শোধ করার ওয়াদা করে মুক্তি নিয়ে বিদেয় হলো।

পাতলা হলো ভিড়। খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে পয়সাকড়ি গুণতে লাগলেন নায়েব। এমন সময় বাইরে থেকে ছুটে এলো এক ব্যক্তি। নায়েব সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো- "হুজুর, হারু সাঁতাল আসছে।"

'মুখ নাতুলেই নায়েব বললেন- "কে?"

আগন্তুক নীচু কণ্ঠে বললো-"ঐ বিট্‌কেলে বুড়ো, হুজুর! সাঁতালদের সর্দ্দার। ঐ যে কি যেন সব যেয়ে প্রায় সময় মাতাল হয়ে থাকে, ঐ হারু সাঁতাল!"

নায়েব বললেন-"তো কি হয়েছে?"

www.pathagar.com

- ওকে ঘাটাবেন না হুজুর। একে তো ওর দিক-বিদিক জ্ঞান নেই, তাতে আবার সে লালমিয়াদের জব্বোর পেটোয়া। সাঁতাল পাড়ার সবাই ঐ লালমিয়ার দলকে পীরের মতো ভক্তি করে।

- হুঁ!

- ঐ বুড়োর সাথে ফ্যাসাদ করে কৃষ্ণ পুরের মোড়লেরা লালমিয়াদের ভয়ে দুই তিন মাস হাটে যেতে পারেনি। খামাখা ফ্যাসাদ করে লাভ কি হুজুর! যে গুন্ডপান্ডা মানুষ ওরা, বলা যায় না, রাত-বিরাতে চলতে ফিরতে কখন কি করে!

আত্ম-সম্মানে ঘা লাগলো নায়েবের। তিনি রুষ্টকণ্ঠে বললেন- "আরে রাখো তোমার গুন্ডাপান্ডা! অমন কতশত গুন্ডাকে এই মিয়াজান আলী মিয়া একপলকে ঠান্ডা করে দিয়েছে- সে খবর রাখো? ঐ সব বখাটেদের ভয় করলে নায়েবী করা চলে না। ওদের জব্দ করার বিদ্যা আমার জানা আছে। তুমি যাও-"

বিদেয় হলো আগন্তুক। ঘরে ঢুকলো হারু সাঁতাল। তার নাতজামাই আজ খাজনার দায়ে বাঁধা পড়েছে সকালে। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে হারু। তার চোখদুটো চক্-চক্ করে জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই সে বললো-"পেন্নাম হই নায়েব বাবু। আমার নাতজামাইকে বেঁধেছো ক্যান্ বটে?"

নায়েব নির্বিকার কণ্ঠে বললেন-" খাজনা দেয়নি বলে।"

হারু অবাক হয়ে বললো- "হেই বাবা! খাজনা ?"

নায়েব এবার রুক্ষকণ্ঠে বললেন- "হ্যাঁ, খাজনা। জমি খেলে খাজনা দিতে হবে না? মগের মুল্লুক পেয়েছো?

- খাজনা লাই তো জমিন লাই। ও তু লিয়া লিবেক বটে। বাঁধবেক ক্যানে তারে?

- সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে বাঁধবোনাতো কি সোহাগ করবো বসে বসে? এত দরদ থাকে তো খাজনাটা শোধ করে নাতজামাইকে নিয়ে যাও।

- খাজনাও দিবেক লাই, জমিনও আর করবেক লাই। উহারে ছেড়ে দ্যান বটেক।

- ছেড়ে দেবো!

- দিবেক বটে। পূজার দিন আছে। ধরমের দিন। উহারে বাঁধবেক ক্যানে তুমি? মানুষ তো বটেক, গরু-ছাগল লয়!

ক্ষেপে গেলেন নায়েব। বললেন- "আরে ভাগ্ ব্যাটা। বেশী বক বক করিসনে। হয় পয়সা ফ্যাল, নয় ভাগ্ শিগ্গির।

- ক্যানে, যাবো ক্যানে বটেক? লাত জামাইরে দেবেক লাই?

- তবেরে-।

গর্জে উঠলেন নায়েব। হাঁক দিলেন- "আছিরুদ্দীন-"

ক্ষেপে গেল হারু সাঁতালও। আরো কয়েক ধাপ সামনে এলো হারু। বললো- "বাঁধবেক বটে? তো আছিরুদ্দীন ক্যানে? তু হামারে বাঁধনা দেখি ক্ষ্যাম্তা। ছোটাজাত আছি তো মরদ লাই আছি? আয়না ক্যানে দেখি? হাত দেনা গায়ে? হারুও আজ ছেড়ে কুতা বুলবেক লাই বটে! দ্যাশে বিচার-উচার লাই? মানুষ লয় জমিনদার বাবু?"

www.pathagar.com

হারু সাঁতাল হাতপা ছুড়ে বিকট রবে চীৎকার জুড়ে দিলো। তার মুখ দিয়ে ভক্‌ভক্‌ করে পচানীর গন্ধ বেরুতে লাগলো। খানিকটা এগিয়ে এসে আছিরুদ্দীন থমকে দাড়িয়ে গেল মাঝ পথে। হারু সাঁতালের মূর্তি দেখে নায়েব সাহেব ঘাবড়ে গেলেন এবার। খানিকটা পেছন দিকে সরে এলেন হাতবাক্স টেনে নিয়ে। হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন পাইক পেয়াদার উদ্দেশ্যে। তার কণ্ঠস্বরে ভীতির আভাষ স্পষ্ট।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন তরফদার সাহেব। তিনি দক্ষিণ পাড়ায় যাচ্ছিলেন কাচারী বাড়ীর পাশ দিয়ে। গোল-মাল শুনে ঢুকে পড়েছেন ঘরে। আঙ্গিনায় ঢুকেই তিনি জেনে নিয়েছেন ঘটনা। নায়েবকে লক্ষ্য করে বললেন-"মিয়াজান-"

তরফদারকে দেখেই আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠলো হারু। বললো- "এই যে, জমিনদার বাবু আইচেঁ! দেউতা আছে বটেক। হারু একটা গোলাম আছে বটেক! তু বল্ জমিনদার বাবু, তুর দ্যাশে বিচার-উচার লাই? খাজনা লাইতো জমিন লাই। মানুষ বাঁধবেক ক্যানে?"

তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তরফদার সাহেব। বললেন- "তুই থাম হারু। বাইরে যা। আমি দেখছি।"

আনন্দে ফুলে উঠলো হারু। আপন মনেই বলে উঠলো "হ-হ, হামি জানে দেউতা আদমী বটেক!"

বাইরে গেল হারু। নীরব হলো সকলে। তরফদার সাহেব ধীর কণ্ঠে বললেন, "মিয়াজান, আমি জানি, খাজনা আদায়ের ব্যাপারে শক্ত হওয়ার দরকার আছে। গোবেচারা সাধু সেজে জমিদারী করা যায় না। কাজটা তুমি ঠিকই করেছো। তবে কথা কি, মানুষ বেঁধে খাজনা আদায়ের জমিদারী আমি তেমন একটা পছন্দ করতে পারিনে। যাদের বেঁধেছো, তাদের ছেড়ে দাও। এই সব সাঁতাল-বুনো ক্ষেপে গেলে, এদের সামাল দেয়া কঠিন হবে। আর হ্যাঁ, পারলে একবার দেখা করবে সন্ধ্যে বেলা। জরুরী আলাপ আছে।"

যেমন তিনি এসেছিলেন, বেরিয়ে গেলেন তেমনি ভাবে। কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। মুখ কাঁচুমাচু করে মনিবের হুকুম পালন করলো মিয়াজান মিয়া। মুক্তি পেয়ে বন্দিরা সব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যে বেলায় নায়ে সাহেব তরফদার সাহেবের বাড়ীতে এলেন। বিষয়টা কি হতে পারে, এটা তিনি তখন থেকেই ভাবছিলেন। জমিদারী নিয়েই আলাপ, এই ছিল ধারণা। কিন্তু আলোচনায় বসে দেখলেন, বিষয়টা একেবারেই পৃথক। কোন প্রকার ভূমিকায় না গিয়ে তরফদার সাহেব সরাসরি বললেন-"মিয়াজান, তোমাকে যে একবার ভাতুরিয়া যেতে হয়।"

কারণটা জানার জন্যে মিয়াজান মিয়া প্রশ্ন করলেন-"কেন হুজুর? "

তরফদার সাহেব বললেন-"ভাতুরিয়ার সরকার পরিবার থেকে আমার পরীবানুর বিয়ের সম্পর্ক এসেছে। চাঁপিলার ঘরবর পছন্দ না হওয়ায় আমি উচ্চ বাচ্য করিনি। কিন্তু এবার তো আর চুপ করে থাকা ঠিক হবে না।"

www.pathagar.com

শুনে চমকে উঠলেন নায়েব সাহেব। পরীবানুর বিয়ের ব্যাপারে তরফদার সাহেব হঠাৎই উদগ্রীব হয়ে উঠবেন, এটা তিনি ভাবেন নি। পরীবানুর বিয়ে অন্য কোথাও হোক, এটা তাঁর কোনদিনই কাম্য নয়। দুরূহ হলেও, হুকুম উদ্দীনের সাথেই পরীবানুর বিয়েটা ঘটিয়ে তুলবেন তিনি, এই তাঁর পণ, তার ঐকান্তিক বাসনা। তাই তরফদারের প্রস্তাবে তিনি মাথা চুলকিয়ে বললেন-"তা ভাতুরিয়ার ঘর বরই বা এমন কি ভাল হুজুর! আর কিছু দিন চুপ করে থাকলে আরো অনেক ভাল ঘর থেকে-।"

নায়েবকে থামিয়ে দিয়ে তরফদার সাহেব বললেন-"আরো চুপ করে থাকবো? তুমি বলো কি মিয়াজান? পরীবানুর বয়সটা হলো কত, সেটা খেয়াল করেছো? মা-মরা মেয়ে আর একটাই মাত্র সন্তান বলে তাকে বিদেয় করার কথা এতদিনও ভেবে উঠতে পারিনি। নইলে, ওর অর্দ্ধেক বয়সের মেয়েদেরও বিয়ে হচ্ছে আজকাল।"

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। এত বয়সের অবিবাহিত মেয়ে অন্যকোন সাধারণ লোকের ঘরে থাকলে, এ নিয়ে একটা ঢি-ঢি পড়তো পাড়ায় পাড়ায়। রাজা জমিদারের ব্যাপার বলেই এতদিনও কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। এদের কৃষ্টি কানুন পৃথক, এই ধারণাই সবার। রাজা জমিদারের মেয়েরা শুধু মেয়েই নয়, পুরুষের মতোও কাজ কাম করে এরা। রানী ভবানীর কথা সবাই জানে। দেবী চৌধুরানীর কথাও তারা শুনেছে। জমিদার রায় বাবুদের ঘরে অবিবাহিত বড় বড় মেয়েও অনেকে দেখেছে। এক সমাজে হলেও এরা একটা পৃথক কিছু, এইটেই সবার চিন্তা ভাবনা। মাতম মোল্লা রাজা-বাদশা না হোক, ছোট খাটো জমিদার তো বটেনই। ক্রমে ক্রমে তাঁর ঘরেরও রীতিনীতি পাল্টে যাবে, এ আর বিচিত্র কি! নইলে তো আর কম হয়নি পরীবানুর বয়স!

পরীবানুর বয়সটা যে আর ধরে রাখার মতো নয়, এটা মিয়াজান মিয়া বোঝেন। এ নিয়ে কোন কথা বলার দাঁও পেলেন না তিনি। কিন্তু লোকটিও তিনি ধুরন্ধর। তাই ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন-" সেই জন্যেই তো বলছি হুজুর। মা-মরা মেয়ে! ওকে কত আদর করে মানুষ করেছেন আপনি! ওকে ছেড়ে থাকবেন আপনি কেমন করে? না-না হুজুর! এ অসম্ভব! ওকে বাড়ী থেকে বিদেয় করার কথা কল্পনাই করা যায় না। তার চেয়ে বরং দেখে শুনে একটা ভাল ছেলে এনে বাড়ীতে যদি রাখতেন-।"

একটা ভাল ছেলে ঘরে রাখার ইচ্ছে তার বরাবরই। কিন্তু অনেক সন্ধান করার পরও তেমন ছেলে অদ্যাবধি খুঁজে তিনি পাননি। নায়েবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তাই তরফদার সাহেব বললেন, "তেমন ছেলে আর পাই কৈ নায়েব? যার তার হাতে তো মেয়ে দিতে পারিনে।"

নায়েব সাহেব হাত কচলিয়ে বললেন, "চেষ্টা করলে হুজুর সাপের মাথার মনি যোগাড় করা যায়, আর একটা ছেলে পাওয়া যাবে না? আমাকে দায়িত্ব দিলে আমি একটু চেষ্টা করে দেখতাম হুজুর!"

www.pathagar.com

তরফদার সাহেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন-"তা-দেখো। কিন্তু ভাতুরিয়া যাও একবার।"

অতি অল্প কথার মানুষ এই বিল বাথানের তরফদার। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জবাবের পর আর কথা বলার সাহস পেলেন না নায়েব। ভাতুরিয়া যে যেতেই হবে, এটা বুঝে নিলেন তিনি। যাওয়াটাও যে তাঁরই প্রয়োজন এটাও তিনি বুঝে নিলেন সাথে সাথেই। এ দিকের উৎসাহ খাটো করতে হলে, ও দিকের উৎসাহ মাটি করে দিয়ে আসাই উৎকৃষ্ট পন্থা।

নায়েব তাই মাথা হেলিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে বললেন-

"জি, আচ্ছা হুজুর।"

[ছয়]

শুরু হয়েছে দূর্গা পূজা। হিন্দু বসতির সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রায় গাঁয়েই। এমন কি পাড়ায় পাড়ায়। নতুন বস্তীর দুই পাড়াতে দুইটি পূজো। বসতি অনেক পুরানো। নাম তবু "নতুন বস্তী'। গ্রামটির এই নামকরণ কে কবে করেছিল, তা কারো জানা নেই। অনেক দিনের কথা। তবু নামের বেলায় নতুনই আছে বস্তীটি। নতুনবস্তীর পূব পাড়ায় সরকারদের বাড়ী। সরকারেরা নতুনবস্তীর পুরাতন পরিবার। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত। পশ্চিম-পাড়ার সামন্তরা সোনার বেনে। হালে উঠা পরিবার। তেজারতি আর টাকা লগ্নির কারবারে এদের পয়সা হয়েছে অনেক। দম্ভ হয়েছে আরো বেশী। সরকারদের তুচ্ছ করে সব কিছুতেই এরা এখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করায় ব্যস্ত।

সরকারদের দূর্গা পূজা দীর্ঘদিনের। সামন্তদের হালের। মাত্র এই দুই তিন বছর হলো পূজা করছে সামন্তরা। এই দুই তিন বছর ধরেই এরা পাল্লা দিয়ে পূজা করছে সরকারদের সাথে। পাল্লা দেয়ার দিক তাদের অনেক। একটা বড় দিক গান এবং গানের দল। সরকারেরা তিন পালা গান করালে এরা করায় পাঁচ পালা। দলের নাম ডাকের দিকটা তো আছেই। এ নিয়ে এই দুইপাড়ায় রেষারেষি। চরম উত্তেজনা বিরাজ করে পূজোর সময়।

নতুনবস্তী আর বিলবাথান পাশাপাশি গ্রাম। তবু সরকার বা সামন্ত কেউ সরাসরি প্রজা নয় বিল বাথানের। এদের মূল-জমিদার নাটোর-রাজ। পাশাপাশি গ্রাম বলে তরফদারের তরফেও জমি আছে এদের। তরফদারকেও অল্প বিস্তর খাজনা দেয় এরা। সরকারদের সাথে বিলবাথানের তরফদারের অনেক দিনের সৌহার্দ্য। আচার-অনুষ্ঠান, পরব-পার্বন সব কিছুতেই এরা পরস্পরে দাওয়াত করে পরস্পরকে। এবারেও দাওয়াত করেছে সরকারেরা। দাওয়াত পেয়ে তরফদার সাহেবও কন্যাসহ হাজির হয়েছে সরকারদের অনুষ্ঠানে। মহিম সরকারের পাশে তিনি চেয়ার পেতে বসেছেন। গান শুনছেন পূজা মন্ডপের আটচালায়। কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বড় একটা

www.pathagar.com

বাইরে যাননা তরফদার। এবার তিনি এসেছেন। নিতান্তই চাপে পড়ে পরীবানুকে সঙ্গে আনতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। সরকার বাড়ীর মেয়েদের অনেক দিনের দাবী এটা। একেবারেই নাছোড় বান্দা তারা। পরীবানু তাদের সাথেই আছে। তাদের সাথে বসেই সে গান শুনছে দূর্গাপূজার।

ভাসানযাত্রা গান। বেহুলা আর লক্ষীন্দরের পালা। ভাসান যাত্রা চলন বিলের অন্যতম আদি ও জনপ্রিয় গান। যদিও বাংলাদেশের সর্বত্র এর বিস্তৃতি, তবু এ গানের উৎসস্থল চলনবিল। কিংবদন্তীর বেহুলা আর লক্ষীন্দরের ঘটনা চলন বিলের ঘটনা বলেই অনেক বিজ্ঞজনের বিশ্বাস। জনশ্রুতি আছে-চলন বিলের বিনসারা গ্রামেরই তৎকালে নাম ছিল নিছানীনগর। এই বিনসারাতেই বা নিছানীনগরেই বাড়ী ছিল বেহুলার পিতা বাছোবানিয়ার বা সাঁই সওদাগরের। এখানে বাছোবানিয়ার ভিটা আছে আজও। বেহুলার জন্য লক্ষীন্দর এই বিনসারারই আশে পাশে চাঁদের বাজার লাগান। কেউ কেউ বলেন, বগুড়া জেলার চাঁদপুরই সেই চম্পকনগর যেখানে বাস করতেন লক্ষীন্দরের পিতা চাঁদ সওদাগর, বা চন্দ্রকান্ত সওদাগর। যে কালীদহ সাগরে এই চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিমজ্জিত হয়, এই চলনবিলই সেই কালীদহ সাগর বলে জনশ্রুতি। বস্তুতঃ চলন বিল সাগরই ছিল তখন। এই সমস্ত কারণে এই ভাসানযাত্রা গানের প্রতি একটা জন্মগত দুর্বলতা ছিল এ অঞ্চলের লোকের। অর্দ্ধ শতাব্দি আগেও চলন বিলের পথ ঘাট মুখরিত থাকতো ভাসান গানের সুরে।

মৃত লক্ষীন্দরকে বেহুলাসহ ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয়া হয় বলেই এই গানের নাম ভাসান গান। এ গানের জনপ্রিয় পর্ব বেহুলা আর লক্ষীন্দরের কাহিনী হলেও পরিসর এর বৃহৎ। পর্ব এর একাধিক। এক এক পর্ব নিয়ে এক এক পালা। কোন কালের কোন ধনমন্ত সওদাগর বাণিজ্যে গিয়ে বন্দী হয় লংকায়। তারপুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর লংকার রাজা শালীবাহনকে পরাস্ত করে উদ্ধার করে পিতাকে-বিয়ে করে লঙ্কেশ্বরের কন্যাকে। এই শ্রীমন্ত সওদাগরেরই ছেলে বা পৌত্র কুটিশ্বর বা কুটিস্ সওদাগর। কাটিস্ সওদাগর বিয়ে করে কিংবদন্তীর আর এক নারী কমলা সুন্দরীকে। এই উপাখ্যান নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কমলাযাত্রা। এই পালার পরিচিত গান-"দ্বার খোলো, দ্বার খেলো কমলা, আমি তোমার স্বামী গো।" এই কুটির বা কুটিস সওদাগর ও কমলার পুত্র চাঁদ সওদাগর, চাঁদের পুত্র লক্ষীন্দর। বেহুলার সাধনায় বা চেষ্টায় মৃত লক্ষীন্দর ও লক্ষীন্দরের মৃত ভাইদের জীবন লাভের মধ্যে দিয়েই শেষ হয়েছে এ কাহিনী।

ভাসানযাত্রা গানের বিপুল জনপ্রিয়তার দরুণই নতুন বস্তীর সরকারেরা দূর্গাপূজায় প্রতি বছর এই ভাসান গানের আয়োজনই করে। এবারেও তাই করেছে। কিছুটা জেদের বশে অধিক পয়সা খরচ করে লাল মিয়ার দলকেই তারা বায়না করে এনেছে। লাল মিয়ার দলই এ অঞ্চলের এক মাত্র ডাকসেটে দল। সব রকম গানের উপরই হাত আছে এদের।

www.pathagar.com

শেষ হয়েছে বন্দনা। এগিয়ে চলেছে পালা। বেহুলার সাথে ভাব জমানোর জন্য লক্ষীন্দর চাঁদের বাজার লাগিয়েছে নিছানী নগরে। বয়স্যরূপী বাহারকে সঙ্গে নিয়ে আসরে প্রবেশ করলো লক্ষীন্দররূপী লাল মিয়া। চাক-চিক্যময় পোষাকে রাজপুত্রের মতোই অপরূপ দেখাচ্ছিলো লাল মিয়াকে। লাল মিয়ার উপর নজর পড়তেই চমকে উঠলো পরীবানু। বিস্ফারিত নেত্রে সে চেয়ে রইলো নিস্পলক। এখানে সে লাল মিয়াকে দেখতে পাবে, এমন কোন ধারণাই তার ছিল না। পরীবানুর ভাব দেখে মুখটিপে হাসতে লাগলো সরকার বাড়ীর মেয়েরা। এমন লালটুকটুকে মাকাল ফল তারা প্রতি বছরই দেখে। সাজ খুললেই এদের গায়ে খোশ্ পাচড়া-দাদ। এসব রাজপুত্রেরা গানের পর গোহাল নিকোয় গৃহস্তের। খড়ি ফাঁড়ে কেউ। কেউ কেউ আবার পেটের দায়ে সাহায্য মেঙ্গেও বেড়ায়। ব্যতিক্রম একশোটায় এক আধ্টা। কখনও বা তাও নয়। এমন ঢের দেখেছে তারা। আর চমক লাগে না। অনভিজ্ঞ পরীবানুর এটা একটা স্বাভাবিক বিভ্রান্তি মনে করে তারা কৌতুক বোধই করলো।

বয়স্যের সাথে দু'একটি কথার পর গান ধরলো লক্ষীন্দররূপী লাল মিয়া। বাজনার তালে তালে ধূয়া ধরলো আসরে উপবিষ্ট তার সঙ্গীরাঃ-

লাল ঃ "চলো যাই, চলো যাই গো, চাদের বাজারে চলো যাই।
সঙ্গীরাঃ 'ঐ'
লাল ঃ বসিয়াছে চাঁদের বাজার ঐ না,
দেশ উজালা করি-
সঙ্গীরাঃ চলো যাই, চলো যাই গো, চাঁদের বাজারে চলো যাই॥
লাল ঃ সেই বাজারে বেসাত করে ঐ না,
বেহুলা সুন্দরী-।
সঙ্গীরাঃ চলো যাই, চলো ----------।
লাল ঃ রূপে বালীর জগৎ আলো ঐ না,
আলো ত্রিভূবণ---।
সঙ্গীরা ঃ চলো যাই, চলো ----------।
লাল ঃ সুন্দর বালীর গুণের কথা ঐ না,
জানে সর্বজন।
সঙ্গীরা ঃ চলো যাই, চলো যাই গো, চাদের বাজারে চলো যাই।"

আসর থেকে বেরিয়ে গেল লক্ষীন্দর ও বয়স্য। একটু পরেই বেহুলার মাথায় ছাতা ধরে লক্ষীন্দর আবার প্রবেশ করলো আসরে। বেহুলার সাজে ময়জুদ্দীন মজুকেও অপরূপ দেখাচ্ছিলো। মেয়ে ছাড়া ছেলে বলে ধরাই তাকে কঠিন। চাঁদের বাজারে এসে বেহুলার মাথায় ছাতি ধরেছে লক্ষীন্দর! কবিতার মাধ্যমে তারা শুরু করেছে বাক্যালাপ ।

বেহুলা ঃ কে তুমি হে বেদাশী, মাথায় ধরিয়া ছাতি,
জাতিকুল মারিলে আমার?

www.pathagar.com

লক্ষীন্দর ঃ চম্পকনগরে ঘর, পিতা চন্দ্র সওদাগর,
নাম আমার বালা লক্ষীন্দর॥
কে তুমি সুন্দরী নারী, কোথায় ঘর কোথা বাড়ী
দ্যাশে দ্যাশে ফিরি তোমার লাগি-
বেহুলা ঃ নিছানী নগরে ঘর, পিতা সাঁই সওদাগর,
আমি বালী বেহুলা অভাগী॥
ছাড়ো বন্ধু পায়ে পড়ি, আমি যে অবলানারী,
কলংকিনী করোনা আমায়-
লক্ষীন্দর ঃ মনে মোর বড় আশা, চাই তোমার ভালবাসা,
বধু করে নিতে চাই তোমায়॥'

ঠিক এই মুহূর্তে লাল মিয়ার চোখ পড়লো পরীবানুর উপর। সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হলো তার সর্বাঙ্গ। কিছুক্ষণ সে স্থির নেত্রে চেয়ে রইলো সেই দিকে। যেন সে এই কথাগুলো বেহুলাকে বলেনি। তাকে বলেই চেয়ে আছে উত্তরের অপেক্ষায়। চোখা চোখী হতেই চোখ নামিয়ে নিলো পরীবানু। চোখ নামিয়ে নিলো লাল মিয়াও। তারা চোখ তুললো আবার। আবার তারা নামিয়ে নিলো চোখ। লাল মিয়াকে লক্ষ্য করে মজুরও চোখ পড়লো পরীবানুর উপর। তারা ভুলে গেলো কথপোকথন। অপ্রস্তুত হওয়ার ভয়ে তারা আসর থেকে বেরিয়ে গেল দু'একটি কথা বলেই।

অতঃপর চাঁদ সওদাগররূপী সমজান আলী আসরে প্রবেশ করে শুরু করলো লক্ষীন্দরের বিবাহসংক্রান্ত বাক্যালাপ। বয়স্যের কাছে লক্ষীন্দরের মনের কথা জেনে নিয়ে নিছানীনগর ঘটকপাঠানোর ব্যবস্থা করে চাঁদসওদাগর বেরিয়ে গেল আসর থেকে। ময়জুদ্দীন মজু সাজ ঘরে ফিরে গিয়েই প্রচার করলো পরীবানুর উপস্থিতির কথা। শুনে উল্লাসিত হয়ে উঠলো সকলেই। খবর গেল আসরে উপবিষ্ট দোহার-বাইন ইয়ারবন্ধুর কাছেও।

চাঁদ সওদাগর বেরিয়ে আসতেই লাল মিয়া চাদরমুড়ি দিয়ে চারণরূপে প্রবেশ করলো আসরে। উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে উঠলো ঘটক পাঠানোর গান। ধূয়া ধরলো সঙ্গীরাঃ

লাল ঃ চলিল চলিল ঘটক নিছানীনগরে গো-
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল ঃ আগে আগে চলে ঘটক, রাম সিং চলে পিছে গো-
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল ঃ অর্ধপন্থ যাইয়া ঘটক ভাবিতে লাগিল গো-
সঙ্গীরা ঃ চলিল চলিল ঘটক নিছানী নগরে গো।।"

পরীবানুর দিকে চেয়ে চেয়ে পুলকিত অন্তরে গেয়ে যাচ্ছে লাল মিয়া। অকস্মাৎ বিপর্য্যয়।

আসরের এক কোণে আচমকা শুরু হলো মারামারি। ঠিক মারামারি নয়, হামলা।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়লো আসরের সর্বত্র। হতভম্ব শ্রোতাকুল দিশেহারা হয়ে এলোপাতাড়ী ছুটতে লাগলো এদিক ওদিক। এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো কিংকর্তব্য বিমূঢ় কর্তৃপক্ষও। মেয়েদের অবস্থা তখন বর্ণনার অতীত।

ঘটনা ঐ একটাই। দুইপক্ষের রেষারেষি। লাল মিয়াদের নাম শুনে সব শ্রোতাই ছুটে এসেছে সরকারদের আসরে। সামন্তদের আসর তখন ঢন-ঢন। শ্রোতার অভাবে গান তাদের বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এ অপমান হজম করার মানুষ নয় সামন্তরা। তাই তারা লাঠিয়াল দল লেলিয়ে দিয়েছে সরকার বাড়ীর আসরে। ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল। যেন তেন প্রকারে এদের গান বন্ধ হলেই পরম তৃপ্তি ওদের। তাতে শ্রোতা পাবে ওরা, জব্দ হবে এরা। এই রেষারেষীর কিছু খবর লাল মিয়াও জানতো। এতটা ঘটতে পারে এমনটি সে ভাবেনি। এর জন্য প্রস্তুত ও সে ছিলনা।

ভাড়াটিয়াদের আক্রমণের সুযোগ নিলো অন্যান্য দুবৃত্তেরা। তাদের লক্ষ্য বস্তু- যুবতীরা, তরুণীরা। তারা বিনা কারণেই ছুটতে লাগলো মেয়েদের বারান্দার দিকে। সেই দিকে ছুটতে লাগলো ভাড়াটিয়া গুন্ডারাও। মহিলাদের বিশেষ করে তরুণীদের, তখন প্রায় সজ্ঞালুপ্তি অবস্থা। এই সংগঠিত লাঠিয়ালদের বিরুদ্ধে তাদের অভিভাবকমন্ডলী নিতান্তই অসহায়। সুসজ্জিত ডাকাত দলের সামনে অসহায় গৃহস্তের মতোই। পালাবার পথও নেই মেয়েদের। ভেতরে মানুষের পর মানুষ। বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। পা বাড়ালে পড়তে হবে এদের হাতেই।

লাল মিয়া দেখলো-মেয়েদের বারান্দার এক প্রান্তে কে একজন লাফ দিয়ে উঠলো। তারপর আর একজন। তীব্র হলো মেয়েদের চীৎকার। সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালো পরীবানুর দিকে। দেখলো, পরীবানুর মুখ মন্ডল একেবারেই রক্তশূণ্য। হতবুদ্ধি অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে আছে সজ্ঞাহীনের মতো। একটানে গায়ের চাদর ফেলে দিলো লাল মিয়া। বিকট রবে হুংকার দিয়ে উঠলো-" এয়, খবরদার।"

হাঁক শুনে চোখ ফেরালো বিপন্নেরা। চোখ ফেরালো পরীবানুও। হাঁক দিয়েই আসর থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো লাল মিয়া। তা দেখেই সংগে সংগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লাল মিয়ার সঙ্গীরাও। তারা সকলেই বুঝতে পারলো-তাদের গুরুমাতা বিপন্ন। ভীড় ঠেলে গিয়ে মেয়েদের আগ্‌লে দাঁড়াতেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ভাড়াটিয়া গুন্ডারা। শুরু হলো লড়াই। ওদের হাতে লাঠি। এদের হাত শূন্য। অত্যন্ত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে লড়তে লাগলো লালমিয়া আর তার সঙ্গীরা।

ইতিমধ্যেই লাফিয়ে উঠলো হারু সাঁতাল। লাল মিয়ার গান শুনতে হারু সাতালও এসেছিল। এসেছিল সাঁতাল পাড়ার সাঁতাল-বুনো। অধিকাংশেরাই নেশাগ্রস্ত। তারা ভার-ভদ্র, বামুন-কায়েত এড়িয়ে ফাঁকে থেকে গান শুনছিল। মারামারি শুরু হলে মজা করে রং দেখছিল এতক্ষণ। রং দেখছিল হারু সাঁতাল নিজেও। লাল মিয়ার হাঁক শুনে সচকিত হলো সে। লাঠিয়ালরা লাল মিয়াদের আক্রমণ করতে দেখেই মাথায় আগুন ধরলো তার। "হাপে সালে গুন্ডালোগ্-" বলেই সে লাফিয়ে উঠে হাঁক দিলো- "হেঁই ঝান্টু, মংলু, কানুয়া- সালে গুন্ডা আদমী লালবাবারে মারলেরে-!"

www.pathagar.com

কোনদিকে না চেয়ে সে তার লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো লাঠিয়ালদের উপর। লাঠি, বৈঠা, বাঁশ হাতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো উপস্থিত সমস্ত সাঁতাল বুনো। লালমিয়ারা ইতিমধ্যেই লাঠিয়ালদের হাত থেকে কয়েক খানা লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এনেছিল হামলাকারীদের। এর উপর আবার পেছন থেকে সাঁতালরা আক্রমণ করায় লাঠিয়ালদের অবস্থা হলো পাঁকে-পড়া হাতির মতো। আগে-পিছে-ডাইনে-বাঁয়ে শত্রু বেষ্টিত হয়ে তারা ঘুরে ফিরে মার খেলো বেশুমার। এমন একটা অভাবনীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে তারা, এটা তারা কস্মিনকালেও ভাবেনি। দেখতে দেখতে লাঠিয়ালদের পড়ে গেল কয়েকজন। এক একটা লাঠিয়ালকে ঘিরে ধরলো পাঁচ-সাত জন সাঁতাল। একেবারেই নিরস্ত্র তখন এরা। এদের সব লাঠি লাল মিয়ারা কেড়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। সাঁতাল আর লাল মিয়ারা এক একজনকে ধরে সাপ পেটা পিটে যখন ছেড়ে দিলো শেষ-পর্যন্ত, তখন এদের অনেকের আর দৌড় দিয়ে পালানোর সাধ্যটুকুও রইলোনা। টলতে টলতে কোনমতে সরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বাঁচলো।

শত্রু বিদেয় হওয়ার পর মেয়েদের বারান্দার নীচে জড়ো হলো লালমিয়ারা। দেখা গেল এ পক্ষেরও অনেকে কিছু কিছু আহত। কারো কেটে গেছে হাত পা, কারো ফুলে গেছে কপাল, কারো ছিড়ে গেছে চামড়া। দেখা গেল লাল মিয়ার রয়্যাল ড্রেস্ ঝুলে পড়েছে পেছনে। তার কপালের একপাশে ছিড়ে গেছে খানিকটা। ক্ষতস্থান বেয়ে টিপ্‌টিপ্ করে রক্ত ঝরছে তখনও।

আসর থেকে লাফিয়ে পড়েই লাল মিয়া ছুটে এসে মেয়েদের বারান্দার উপর উঠেছিল এবং পরীবানু সহ সকল মেয়েদের আগ্‌লে নিয়ে গুন্ডাদের হামলা প্রতিহত করতে লাগলো। পরে বারান্দারনীচে নেমে নেমে লাঠি চালাতে থাকলেও, বারান্দার দিকে তার নজর ছিল সব সময়। প্রয়োজনে পুনঃপুনঃ সে বারান্দায় ছুটে এসে পরীবানুর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছিল। এই দুঃসময়ে লাল মিয়াকে পাশে পেয়ে যারপর নেই বর্তে গিয়েছিল দিশেহারা পরীবানু। সাহস ফিরে এসেছিল বুকে তার। সাথে সাথে অচেনা এক শিহরণ দোল দিয়ে যাচ্ছিল তার অন্তরে। সে ছায়ার মতো সেঁটে ছিল লাল মিয়ার পেছনে।

পরীবানুর মতো বর্তে গিয়েছিল অন্যান্য মেয়েরাও। তারাও ঘুরে ফিরে লাল মিয়ার পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। সাহস ফিরে এসেছিল তাদেরও অন্তরে। শেষ অবধি গুন্ডাদের সমূলে উৎখাত হয়ে যাওয়া দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যুবতী-বৃদ্ধা সকল মহিলারা। তারা অবাক হয়ে চেয়েছিল আনন্দ-বিস্ময়ে। এক্ষণে লাল মিয়ার কপালে রক্তের ধারা দেখে সকল মেয়েরাই বেদনা বোধ করতে লাগলো কমবেশী।

বেদনায় বিহবল হলো পরীবানু, তার আকুলতার সীমা পরিধি রইলোনা। লালমিয়া দাঁড়িয়েছিল বারান্দার একদম কোলঘেঁষে। পরীবানু ছুটে এলো তার কাছে। লাল মিয়া তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। নিজের অজ্ঞাতেই শাড়ির আঁচল হাতে নিলো

www.pathagar.com

পরীবানু। লাল মিয়ার কপাল মুছে দেয়ার জন্যে হাত তুলতেই স্মিতহাস্যে হাত তুলে বাধা দিলো লাল মিয়া। থমকে গেল পরীবানু। সঙ্গে সঙ্গেই হুঁশ ফিরে এলো তার। হুঁশে এসেই লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠলো। জড়োসড়ো হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো ওখানেই। নতমস্তকে কাঁপতে লাগলো মৃদুমৃদু।

চারদিকে তখন উত্তাল পরিবেশ। আর এক উত্তেজনা। লাল-মিয়ার দল সহ সাতালদের ঘিরে আনন্দমুখর জনতার হুল্লোড় ও কলাহল। ঝড় বইছে কৃতজ্ঞতার। লাল মিয়াদের প্রশংসার সাথে সাথে সাঁতালদের সাবাসী জানাতে উপস্থিত সকলেই একান্তভাবে মগ্ন। এদিকের এই অন্তরালের দৃশ্যাবলীর দিকে নজর কারো ছিল না। অন্তরের এই চকিত আবেদনে চোখ দেয়ার ফুরসুত কারো ছিল না। এই ফাঁকে লাল মিয়া পরীবানুর মুখের দিকে চাইতে লাগলো পুনঃপুনঃ অলক্ষ্যে ও অন্তরালে ঐ মুখ দেখতে লাগলো বার বার। পরীবানুও অলক্ষ্যে একাধিক বার চোখ তুলে লালমিয়ার মুখের দিকে চাইলো। এতে করে একাধিকবার চোখা-চোখী হয়ে গেল দুইয়ের মধ্যে। প্রতিবারেই দুইয়ের ঠোঁটে ঈষৎ একটা রূপালী রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ঠোঁট টিপে সেই রেখা গোপন করলো উভয়েই। শরমে ও শিহরণে লাল হয়ে উঠলো পরীবানুর মুখমন্ডল। লাল মিয়ার অন্তর হলো খুশীর হিল্লোলে সুরভিত।

ভিড় ঠেলে লাল মিয়ার পাশে এলেন তরফদার সাহেব। পাশে এলেন গান পূজার আয়োজক সরকারেরা। তাদের বাড়ীর মেয়েরাই সংখ্যায় ছিল অধিক। ছুটে এলেন অন্যান্য মেয়েদের অভিভাবক মন্ডলীও। আর এক দফা ঝড় উঠলো কৃতজ্ঞতার। লাল মিয়াদের সাথে সাথে হারু সাঁতালদের তারিফে মুখর হয়ে উঠলেন উপকৃত সকলেই।

অতঃপর আস্তে আস্তে শান্ত হলো পরিবেশ। পোক্ত হলো লাল মিয়া ও পরীবানুর চোখা চোখী। হারু সাঁতাল ও তার সঙ্গীদের বিপুল উল্লাস ছাড়া গানের আসর সে রাতে আর জমলোনা।

[সাত]

"মতিজান, আরে ও নাতনী, কি ভাজুচ্চু লো? তেলের পিঠা বুঝি? বাপ্‌রে কি সুগ্‌ঘেরান! তা একা একাই পিঠা করে খাচ্চু নাকি? বাড়ীত্ তো আইচ কটুম দেখিনা।"

রাস্তা থেকে গন্ধ পেয়ে বাড়ীর উপর উঠে এলো বয়নার মা। বয়স তার অনুমান করা শক্ত। জিজ্ঞেস করলে সে বলে- 'কতই আর হবে গা! এই তিরিশ কি ষাট!' লোকে বলে- সঠিক বলার জো নাই, হতে পারে সত্তর কি নব্বুই! প্রায় বিশ বছর ধরে তাকে এই একই রকম দেখে আসছে গাঁয়ের লোক। লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করেনি কেউ। কোমরে তার অল্প একটু ভাঁজ, এ ভাজটা তার বিশ বছর আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। এক সূত্ বাড়েনি। বিশ বছর আগেও যেমন

www.pathagar.com

লাঠির উপর অল্প একটু ভর দিয়ে সে টং-টং করে বেড়িয়েছে পাড়ায় পাড়ায়, আজও তেমনি বেড়াচ্ছে। গতি তার একরত্তি কমেনি। অনড় তার স্বাস্থ্য। কিন্তু মুখটা বড় নড়বড়ে। লাউ-এর বোঁটা কুমড়ায় আর কুমড়ার বোঁটা লাউ-এ লাগানোই তার পেশা। এই মুখের শুনেই স্থান নেই তার বাড়ীতে। ভাত দেয়না বেটা-পুত। কিন্তু তার ঐ মুখের ভয়েই তাকে আবার ভাত দেয় তার পড়শীরা। চাইলে আর পারতপক্ষে 'না' করে না কেউ। বিশেষ করে 'না' করে না কাঁচা বয়সের বউ-ঝিয়েরা। কি জানি কি সাংঘাতিক কুৎসা একটা রটিয়ে বেড়ায় কুটনী। সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, গুজব একটা উঠলেই তো আবার কান খাড়া করে সকলে। কি দরকার ঐ ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার। তাই সম্ভব হলে তার দাবী আব্দার পূরণ করেই তারা বিদেয় করে আপদ। গাঁয়ে এ নিয়ে দরবার হয়েছে অনেক। সে শাস্তিও পেয়েছে প্রচুর। অনেকভাবে অনেকবার তাকে জব্দও করেছে অনেকে। কিন্তু সে জব্দ হয়নি একটুও। ইলাষ্টিক ফিতার মতো টানার পর ছেড়ে দিলেই যথা পূর্বং তথা পরং। আবার সে শুরু করে কুট্‌নীপনা। দেখেশুনে হাল ছেড়েছে গাঁয়ের লোক। তারা তাকে এড়িয়ে চলে এখন। ভয়ও করে অনেকে। করে না শুধু তরফদার। তাঁর পাইক-পেয়াদা দোষ পেলেই তাকে জিম্মাখানায় বন্দী করে রাখে বলে বুড়িও ভয়ে ও পাড়াতে যায়ই না। জমিদারের কথা নিয়ে নাড়াচাড়াও করে না। সবাই বলে, বুড়ির মুখে যেমনি মধু, তেমনি বিষ। স্বার্থ আদায়ের বেলায় সে মধু ঢালে খড়া-খড়া। ব্যর্থ হলেই বিষ ছড়ায় কলসী কলসী।

রান্নাঘরের বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সে মধুকণ্ঠে হাঁকতে লাগলো-" মতিজান, আরে ও নাতনী-"

একখানা ফুটন্ত, পিঠে ছিল কড়াইতে। পিঠেখানা নামিয়ে রেখে মতিজান পরীবানুকে বললো, "একটু বসো তো সই চুলোর পাশে। আমি দেখি, কি কয় ঐ হাড়-জ্বালানীবুড়ি।"

মতিজান বেরিয়ে আসতেই ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বয়নার মা বললো- "মামারা আন্দে বাড়ে মামারা খায়, আমরা গেলে কপাট দেয়'-সেই কথারই হাল হলোরে নাতনী! একা একাই পিঠা করে খাচ্ছু ? এই বুড়ি নানীড্যার কতা একটুও মুনে পড়লো না? একটা 'তু' করে ডাক দিলেই তো পারলুনি। তুর জন্যে মুনডা আমার কি পোড়ান পোড়ায়, আর আমার কতা ভুলেই গেলু তুই?"

আপদ! পিঠা করতে গেলেই যে বয়নার মাকে ডাকতে হবে-এমন গরজ মতিজানের লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু বয়নার মায়ের মুখের উপর সে কথা বলাও আবার বিপজ্জনক। তাই সে ওজর দেখিয়ে বললো "কি আর করি নানী, একা মানুষ আমি! খবরটা কাকে দিয়ে দেই।"

ব্যস্! ওতেই বর্তে গেল বয়নার মা। সে বসে পড়লো রান্না ঘরের বারান্দায়। হাতের লাঠি পাশে রেখে বললো- "তাই হবে- তাই হবে! তা নাহলে আমাকে ছেড়ে পিঠা খাবি মতিজান, এড্যা আমি ভাবতে পারি? আমার মতির মুতো মিয়া

www.pathagar.com

ছাওয়াল কয়া আছে গেরামে? একি আর ঐ মুন্ডল বাড়ীর মাগী যে, দ্যাড় দিন হলে কপাল ফিরতেই ভাতেক বুলবি রন্ন? তা, কি ভাজলু নাতনী? দেতো দেখি দুখ্যান! মুখে দিয়ে দেখি তো বোনডির আমার আন্দনের হাত কেমুন?"

উপায় নেই। আপদ যখন চেপেছে একবার ঘাড়ে, তখন 'না' বলে আর বিদেয় করা যাবে না। "বসো, দিচ্ছি"- বলে ঘরে গেল মতিজান। একটা বাটিতে করে দুইখানা পিঠে এনে বুড়ির সামনে রাখলো। পিঠে ভেংগে মুখে দিয়েই বুড়ি আবার বললো- "আর একখানা দেরে নাতনী, হচে তো বেশ ভালই।"

আর একখানা এনেদিতেই বুড়ি বললো-"ভর পুষ মাস এড্যা। বাড়ী বাড়ী পিঠা হচ্ছে। মুন্ডলের বাড়ীত্ হয়নি তা বুললেই বিশ্বাস করবো আমি? মুন্ডলের বউকে কনু-ও বউ, দেওনা একটু লড়ি পিঠা?' তা শুনে মাগী কয় কি জানিস্ নাতনী? মাগী কয়- লড়ি পিঠা নাই। উসব আমরা খাই না। শুনো কথা! বাপ জন্মে পায়নি যে পান্তা ভাতের পানি, সে দুধে মাখে চিনি, দুদু মিঠা লাগে না! এই কালই তোরা খুদ চেয়ে চেয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ালু, আর আজ লড়ি পিঠা খাস্নে? এত গুমার এখনই? তাও যুদি বিটিড্যা তুর সতীসাদ্ধী হলোনি, তাহলেও একটা কতা ছিল। বেশ্যা, একদম বেশ্যা। বয়সটা চৌদ্দ বছর পার হয়েছেরে নাতনী, পট্পটে লায়েক। সেই মিয়া জুয়ান জুয়ান মরদ লিয়া দিন-রাত আমতলায় আর জামতলায় ঘুরে বেড়ায়। ঐ কালু তো একদিন ছানুর সাথে ধরেই ফেললো হাতে হাতে! ছি-ছি-ছি! কি জাত যাওয়া কতা! আমার মিয়া হলে-"।

অসহ্য হয়ে উঠায় বাধা দিলো মতিজান। বললো -"আহ! তুমি খাও নানী! ওসব কথা রাখো। পরের গীবত গাওয়া পাপ। গুনাহ্ হয়।"

শেষ পিঠাতে হাত দিয়ে বুড়ি বললো- "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই ঠিকই কচু বোন। গীবত গাওয়া মহাপাপ। যাঁই পরের গীবত গায়, তাঁই লিজ বাপের জন্মা লয়। শাস্তর কি আর মিথ্যা?

মুখে থাকা পিঠেটুকু কোঁৎ করে গিলে বুড়ি আবার শুরু করলো গীবত। বললো- "তা এ কতাও ঠিক নাত্নী, বয়নার মা কাউকে ছেড়ে কতা কয়না। দিক দেখি, মুন্ডলের বউ কেমুন করে অর ঐ লটি মিয়ার বিয়া দেয় দিক। সেদিন সোনাই ডাঙ্গা থাক্যা বিয়া আলো অর মিয়ার। বরের বাপকে আস্তার উপুর পেয়ে আমিও তেমনি মুখের উপুর বুলে দিনু, ছেলের বিয়া দিচ্চো দেও, কিন্তুক কনের তো আবার গোন্ডা গোন্ডা লাগর আছে গাঁয়ে। ওদেক ছেড়ে কনে তোমার বেটার কাছে থাকবে কিনা সে কতাডাও ভেবো!"

মতিজানের ইচ্ছে হলো, এখনই এই বুড়িটাকে ঝাঁটা মেরে বের করে দেয় বাড়ী থেকে। কিন্তু ময়লায় ঢিল মারলে তা ছিটকে এসে নিজের গায়েই পড়বে ভয়ে মতিজান তা পারলো না। দাঁতের উপর দাঁত পিষে সেখান থেকে সরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই বেরিয়ে এলো পরীবানু। বললো-"কি সই, কি নিয়ে কথা বলছো এতক্ষণ?"

www.pathagar.com

মতিজানের উত্তর দেয়ার আগেই তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে বয়নার মা বললো-" ও-মা! এড্যা আবার কেডা গা? ঐ পাড়ার জমিদারের বিটি লয়? আহা! বয়েসটা দেখছি শ্যাষ হয়েই গেল গো!"

কড়া একটা ধমক দিয়ে মতিজান বললো- "বয়নার মা!"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বয়নার মা ঐ একই কণ্ঠে বললো, আরে না -না, আমি কি আর ভাল মুন্দ বুলিচ্চি কিচু? আজা-জমিদারের খরেত এমুন হয়েই থাকে। এরই নাম কপাল লো কপাল। তা না হলে বর জুটে না এমন সুন্দর মিয়ার ? কাকপক্ষী জানার আগে গোপন কথা আগেই যায় বরের কানে?"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে মতিজান ফের বললো- "আহ! বয়নার মা! এসব আবার কি বলছো?"

বয়নার মা নির্ব্বিকারভাবে জবাব দিলো- "আমি বুলার কে লা? আমি বুলতে যাবো ক্যান্ ? ঐ লায়েবটাই শেখের পোকে বুলিচ্ছিলো- আমি তাই শুননু। ঐ ভাত্র্যার বরও নাকি আজী হয়নি বিয়া করতে। মিয়ার নাকি কি কি সব দোষের কথা জানতে পেয়েছে ওরা। লায়েবই তো বুললো, কুনো বরই আর বিয়া করবি না পরীকে। পরীর নাকি নানান রকম দোষের কতা ছড়ায়ে গেছে চার দিকে। কিন্তুক বাপু, যে যা-ই বুলুক, লায়েবটা খুব ভাল মানুষ। লায়েব কয় আমি থাকতে কালী পড়বি জমিদার বাবুর মুখেত? উডা হবার দিবো না। আমার হুকুম উদ্দীন যতই না-না করুক, বুলে কয়ে আজী তাকে করাবোই। অর সাথেই দিয়া দিবো বিয়াডা। যার নুন খাই, তার দুর্ণামডা ঢাকতে হবিনা আমাক ? ধন্নি মানুষ বাবা ! এদের জন্যেই দুনিয়াডা আজও টিকে আছে।"

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এতক্ষণ সব হজম করলো পরীবানু। এবার সে তিক্ত কণ্ঠে বললো- "এই কুটনীটাকে এখানে ফের খেতে দিয়েছো কেন সই? এটাকে ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেয়া উচিত নয়। এটা মানুষ নয়, ইল্লত!"

অন্য কেউ হলে এই কথা শুনে বোমার মতো ফেটে পড়তো বয়নার মা। জমিদারের মেয়ে যখন আছে তখন আশে পাশে পাইক-পেয়াদা থাকতে পারে ভয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বয়নার মা বললো-"ল্যাও বাবা, একেই বুলে ভালর কাল নাই, বান্দরের প্যাটে পিলাই! আমি আবার মুন্দডা বুলনু কি?"

প্রত্যুত্তরে মতিজান রুক্ষকণ্ঠে বললো- "ঢের হয়েছে! এবার তুমি যাও তো দেখি! উঠো শিগ্গির!"

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বয়নার মা বসেছিল। লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে উঠতে উঠতে বললো-"যাচ্চি লো যাচ্চি! যাবো না তো কি থাকার জন্যে আচ্চি? এত দেমাগ কিসের এ্যাঁ ? জমিদারের ঘরের কতা কে শুনতে চায় গায়ে পড়ে? কানেত্ এসে পড় ক্যা?

গজর গজর করতে করতে বেরিয়ে গেলো বয়নার মা। স্থানুর মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দুই সখী। কিছুক্ষণ কেউ কথা খুঁজে পেলো না। পরে পরীবানুর হাত

www.pathagar.com

ধরে মতিজান বললো- "এসো সই, ঐ বজ্জাত বুড়ির কথা শুনে মন খারাপ করে কাজ নেই। ওর কথায় কান দেয় কে?"

ঘরে ঢুকে উভয়ে ফের পিঠে ভাজতে বসলো।

মাসটা পৌষমাস। পিঠে খাওয়ারই মৌসুম। সারা বর্ষা কেটে গেছে অনটনে। এখন গোলায় গোলায় ধান উঠেছে গৃহস্তের। খলায় খলায় কাটা ধানের পালা। চার দিকে পাকা ধানের কাফেলা। বাড়ী বাড়ী ধান আসছে গাড়ী গাড়ী। ধান আসছে ভারে ভারে। সারিসারি ধানের আঁটি রাশি রাশি মেষশাবকের মতো ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়িয়ে আছে মাঠের পর মাঠ। ফলন এবার আশাতীত। খুশীতে ভরা কিষানদের মন। কিষানীদের মুখে মুখে হাসি। তারা গাল ভরা পান খেয়ে ধান তুলছে ঝেড়ে ঝেড়ে। গুণগুণ করে গান গেয়ে আটা কুটছে কাজের ফাঁকে। সারা বছর অন্তর এখন প্রায় সকলেই ধুম করে তৈরী করছে ধুপী-চিতাই-তেলের পিঠা। খেজুর গাছের রস দিয়ে রস-পিঠা। স্বামী সন্তান সহকারে তারা প্রাণ ভরে বৎসর অন্তর খাচ্ছে-পরশীদের খাওয়াচ্ছে। মতিজানের বাড়ীতে লোক মোটে তিন জন। একজন সে নিজে। দ্বিতীয়জন বাপ। তৃতীয় জন স্বামী। ঘরজামাই স্বামী। প্রায় সারাদিনই এরা থাকে বাইরে। বাড়ীতে সে একা। পাঁচজনের দেখা দেখি পিঠে করার সখ হয়েছে মতিজানেরও। হাতের কাছে কুটুম নেই। একা একা পিঠে খাওয়া জমেও না তেমন। তাই পরী বানুকেই টেনে এনেছে মতিজান।

অঢেল ধানের আমেজে সোনাকোলের লোকেরাও মাতোয়ারা। মাতোয়ারা লাল মিয়ার সঙ্গীরাও। তারা দৌড়ঝাঁপ করে মাঠে ক্ষেতে কাজ করছে সারাদিন। সন্ধ্যে হলেই জড়ো হচ্ছে লাল মিয়ার বৈঠকখানায়। খোশ গপ্পে মন ভরে না তাদের। হাজার কাজের মাঝেও বারো মাসে তের রকম অনুষ্ঠান তাদের চাই-ই। পৌষমাসের বড় আকর্ষণ সোনাপীরের শিরনীঃ সোনা-পীরের গান গেয়ে মেঙ্গে মেঙ্গে ধান তোলা। পৌষ মাসের শেষ তারিখের শেষ রাতে নদী নালায় নেয়ে এসে লারার (খড়ের) পালায় আগুন দিয়ে আগুন পোহানো, রাত পোহালে মাংগা-ধানের চাল দিয়ে ক্ষীর পাকানো এবং পাক শেষে পরশীদের তা দাওয়াত করে খাওয়ানোই এই উৎসবের সর্বশেষ কার্য্যক্রম।

তাই আগে প্রয়োজন পুষ্নের রাতে পড়ানোর জন্যে লারার পালা, অর্থাৎ পুষ্ণের পালা। ধান কেটে নেয়ার পর ধান গাছের যে অবশিষ্ট অংশ পড়ে থাকে জমিতে, ঢেকে রাখে জমি, তাকেই "লারা" বলে এ এলাকার লোকে। অল্প লারা দিয়ে পুষ্ণের পালা হয়না। পালা চাই আকাশ চুম্বি। তাই প্রয়োজন হয় অনেক লারার। কিন্তু জমির মালিক স্বেচ্ছায় কেউ জমির লারা দেয়না। জমিতে লারা পোড়ালে ছাই পড়ে জমিতে। ছাই থেকে সার হয় জমির। তাই লারা তুলতে গেলেই বাঁধা আসে মালিক পক্ষের। লারার কাফনে ঢাকা থাকে মাঠের পর মাঠ। পরতে পরতে পড়ে থাকে লারা। তবু লারার বড় আকাল। দু'এক বোঝা তো নয়, বিঘেকে-বিঘে উজাড় করা লারা চাই পুষ্ণের পালা তৈয়ার করার জন্যে। পালাও আবার একটা দুটো নয়।

www.pathagar.com

অগণিত পালা উঠে এই মৌসুমে। পালা উঠে গাঁয়ে গাঁয়ে। পালা উঠে পাড়ায় পাড়ায়। কোথাও বা এক পাড়াতেই দুই তিনটে। প্রতিযোগিতা মূলক পালা। কোন্ গাঁয়ে কাদের পালা সবার চেয়ে বড় হলো- এটি একটি মস্তবড় কথা। চরম বাহবা আর বাহাদুরীর ব্যাপার। নাম ছড়ায় দশ গাঁয়ে।

বাহাদুরীর শেষ নয় এখানেই। পুষ্‌ণের রাতে কারা পালায় আগুন দিলো সবার আগে, সবার আগে জ্বলে উঠলো কাদের পালা, বাহাদুরীর সেটাও একট মস্ত বড় দিক। এতে করে অনেকেই জেগে থাকে সারারাত। অপেক্ষায় থাকে শেষ রাতের। অঘটনও মাঝে মাঝেই ঘটে যায় এর ফলে। লারার পালায় আগুন দেয়ার সময় হওয়ার আগেই, অর্থাৎ শেষ রাত না আসতেই, রাতের প্রথমার্ধেই জ্বলে উঠে কারো কারো পালা। রসিকতার বশে বা রেষারেষির জের ধরে একদল গোপনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসে অন্য দলের পালায়। এতে করে সৃষ্টি হয় কলহ আর হৈহুল্লোড়। গাঁয়ের নীচে মাঠে-ডহরে হে-চৈ চলে রাত ভর। রসিক জনদের কাছে এও একটা উপভোগের কারণ হয়ে উঠে। কারা এসে আগুন দিলো, প্রায়ই এটার হদিস করা যায় না। ফলে, নিজ নিজ পালা পাহারা দিয়ে রাখার দায়িত্ব তীব্র হয় অধিক।

সে যা-ই হোক, এগুলো সবই পুষণের রাতের ঘটনা। পালা তৈরী হয়ে যাওয়ার পরের ব্যাপার। পালা তৈরী করাটাই প্রথমতঃ কঠিন কাজ। লারার অভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে পালা তৈরী করা প্রায়শঃ ই সম্ভবপর হয় না। কারবার চলে রাতে। এক রাতেও গোটা পালা উঠেনা। রাতের পর রাত তৎপরতা চালিয়ে পালা তৈরী করা হয়। রাতে এসে কৃষকেরা ঠাঁই নেয় ঘরে। রাতের অন্ধকারে যুবকেরা-কিশোরেরা নেমে যায় মাঠে। ফুর্তিবাজ কিছু বয়সী লোকও সঙ্গী হয় তাদের। বিভিন্ন ভুঁই থেকে তুলে আনে লারা। রাতারাতি সেই লারা উঠে যায় পালায়। পরের দিন মাঠে গিয়ে অনেক কৃষকেরাই দেখে তাদের ভূঁই সাফ। কে বা কাহারা তুলে নিয়েছে লারা। গাঁয়ে ভিনগাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, অগনিত পালা উঠছে পুষণের। কার ভূঁয়ের কোন্ দল তুলেছে, তা সনাক্ত করার উপায় নেই। অনুমানের উপর কলহ করেও ফল কিছু হয় না। কোন দলই স্বীকার করে না সে অভিযোগ। সব গাঁয়ের সব মাঠেই এমন দু'দশ বিঘের লারা হাওয়া হয়ে যায়। সর্বোপরি, এ এলাকার এটা একটা রেওয়াজ। পুষণের মৌসুম এলে ছেলে ছোকরারা এমন কাজ করবেই- এই মর্মে একটা পরোক্ষ সমর্থন আছে এ এলাকার সর্বত্র। ছোট কালে ঐ সব জমির মালিকেরা নিজেরাও এই কাজ করেছে। তাই ঐ দু'এক বিঘের তুচ্ছ লারা নিয়ে কেউ অধিক ব্যস্ত হয়ে উঠেনা। উড়োভাবে কিছু গালমন্দ করেই বাদ দেয় সে প্রসঙ্গ।

পৌষ আসার পরে পরেই লাল মিয়ার দলও মেতে উঠেছে এসব কাজে। মেঙ্গে মেঙ্গে ধান তোলা আর পুষণের পালা দেয়া কাজে। সুযোগ সুবিধে মতো রাতের অন্ধকারে তারা মাঠে নেমে পড়ছে দল বেঁধে মাঠের গভীরে গিয়ে তুলে আনছে লারা। তৈরী করছে পুষণের পালা। লারা তুলছে এক দিন আর ধান মাঙ্গতে বেরুচ্ছে পাঁচদিন। গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে গান গাচ্ছে সোনপীরের আর ধান তুলছে

www.pathagar.com

শিরনীর। সোনাপীরের শিরনীর।

খরচ এতে সামান্যই। দু'তিন মন ধানের ব্যাপার। লাল মিয়াদের যে কেউ ইচ্ছে করলেই দিতে পারে ধান ক'টা। লাল মিয়া তো পারেই। কিন্তু সে ধান দিয়ে হবে না এ শিরনী। গাঁয়ে গাঁয়ে চেয়ে চেয়ে আনতে হবে ধান। তাই সাঁঝের পরেই লাল মিয়ার দল মাঙ্গতে বেরোয় গাঁয়ে গাঁয়ে। পুষণের পালা তৈয়ার করার রাত বাদে সব রাতেই সোনা পীরের। গান গায় বাড়ী বাড়ী। বিনি ময়ে ধান পায় কুলা কুলা। হিন্দুদের সোনারায় আর মুসলমানের সোনাপীর। সোনাপীর আর মানিকপীর দুইভাই। কামেল ফকির উভয়েই। জাহিরীর জন্যে তারা মানুষকে পরীক্ষা করে ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে। এক এক স্থানের ঘটনা নিয়ে এক এক পর্ব- এ গানের। একটা পর্ব গোয়াল নগরের কাহিনী। কালু গোয়ালের বউ বড় কৃপন ও হিংসুটে। ক্ষুৎপিপাসায় জর্জরিত দুইপীর গোয়ালনগর এসে দুধ চায় সামান্য। কালুর বউ এক ফোঁটা পানিও না দিয়ে গাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তাদের। ফলে পীরদের অভিশাপে তৎক্ষনাৎ মরে যায় তার গাভীগুলো। কালু গোয়ালের বউ এবার বুঝতে পারে যে, কামেল পীর এরা। তখন সে শুরু করে বিলাপ। গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তার দুঃখ দেখে দয়া হয় দুই ভাইয়ের। তারা আবার জ্যান্ত করে গাভীগুলো। এমনি সব উপাখ্যান। এক একটা উপাখ্যানের এক একটা অংশ বাড়ী বাড়ী গেয়ে বেড়ায় লাল মিয়ারা।

সাঁঝের পরই জড়ো হলো লাল মিয়ার বাহিনী। বিলবাথানে যাবে আজ, এটা স্থির ছিল আগে থেকেই। লাল মিয়ারই সিদ্ধান্ত। পরীবানুর সাক্ষাৎটাই অধিককাম্য তার। দূর্গাপূজার ঘটনার পর গড়িয়ে গেছে দু'তিন মাস। এর মধ্যে আর তাদের মাঝে কোন কিছুই ঘটেনি। সামনা সামনি সাক্ষাতের সুযোগও আর আসেনি। অকারণেই যাওয়া যায় না পরীবানুর বাড়ীতে। বিবেকে তার বাধে। চক্ষুলজ্জার বালাইটা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কোন একটা মত্তকা চাই। তরফদারের বাড়ীতে যাওয়ার চাই একটা অজুহাত। এইটেই সেই মত্তকা বা অজুহাত। তাই সাঁঝের পরই দলবল নিয়ে বিলবাথানের উদ্দেশ্যে রওনা হলো লাল মিয়া।

খাওয়া দাওয়া সেরে উঠতেই সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। কথা ছিল পাইক পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে ঝি আসবে পরী বানুকে নিয়ে যেতে। এখনও কেউ না আসায় পরীবানু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললো-"কি ব্যাপার সই! রাত ক্রমেই বাড়তে লাগলো, তবু যে কেউ আসে না! বাড়ীতে কোন অসুবিধে হলো নাকি?"

পরীবানুর ব্যস্ততায় কোন গুরুত্বই না দিয়ে মতিজান বললো-"অসুবিধে আবার কি! হয় তো কোন জরুরী কাজ কামে আটকে যাওয়ায় আসতে দেরী হচ্ছে। তা হোক। এসো, আমরা একটু ঐ বারান্দায় গিয়ে বসি। সারা বেলা তো পিঠে নিয়েই গেল। আসল কথা শুনাই হয়নি এখনও।"

পরীবানুর সংশয় তবু গেল না। বললো "কিন্তু!"

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে মতিজান ফের বললো-"আহ্ হা! না এলো তো কি হলো! পানিতে তো আর পড়োনি। বাপজান আর তোমার সয়্যা এই মাত্র বাইরে

www.pathagar.com

গেল। ওরা আসুক। তেমন হলে বাপজানই তোমাকে রেখে আসবে খন। নাও, উঠো-।"

পৌষমাস হলেও শীতটা এবার কম। কোন বাও বাতাস না থাকায় সেদিন আরো কম। সারা বেলা চুলোর পাশে থাকার দরুণ হাঁপিয়েও তারা উঠেছিল। গায়ে কিছু কাপড়-চোপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এলো দুই সখী। তারা এসে পূর্বদুয়ারী ঘরের খোলা বারান্দায় বসলো। চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমার চাঁদ। বারান্দায় আর উঠানে ঢেউ খেলছে আলো। একেবারেই দিন বরাবর। পরীবানুর কাঁধের উপর আলতোভাবে চিবুক রেখে মতিজান বললো- "তারপর সই? খবর কি ওদিকের?"

বুঝেও না বোঝার ভান করে পরীবানু বললো- "ওদিকের মানে?"

মতিজান মুসকি হেসে সুর করে বললো-" ফুল কে পরায় গলে!"

পরীবানুও অল্প একটু হাসলো। বললো- "ও, সেই কথা?"

ধীরে ধীরে গম্ভীর হলো পরীবানু। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নতুন বস্তীর ঘটনা। তার মানসপটে ভেসে উঠলো লাল মিয়ার মুখ মন্ডল। কপালের একপাশে - ছিঁড়ে গেছে খানিকটা! টিপ টিপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত! লাল-লাল! বিন্দু-বিন্দু! তাকেই তো বাঁচাতে গিয়ে লাল মিয়ার এই হাল। তার অবস্থা বুঝেই তো ঝাঁপিয়ে পড়লো লাল মিয়া। লাল মিয়ার জন্যেই তো তার বেঁচে গেল মানসম্মান! এসব কথা পরীবানু এক মুহূর্তও ভোলে নি। লাল মিয়ার কাটা দাগ মিলিয়ে গেছে দুদিনেই কিন্তু পরীবানুর অন্তরে' সে দাগ পড়লো সেদিন, সে দাগ তেমনি আছে আজও। তিল পরিমান মিলায়নি। বাইরের এ ঘটনাটুকু মতিজানও শুনেছে। পরের দিন তাকে ডেকে পরীবানুই বলেছে। ভেতরের টুকু বলেনি। ভেতরের খবর মতিজান আঁচ করে যা পেয়েছে, তার পরিমান অধিক নয়। যতটুকু পায়নি, তার পরিমান হাজার গুণে বেশী।

পরীবানুকে নীরব দেখে তাড়া দিলো মতিজান। বললো-" কি হলো সই? কথা বলছো না যে?"

এর জবাবে পরীবানু ধীরে ধীরে বললো-"নতুন বস্তীর ঘটনা তো বলেছিই তোমাকে। এর পর আর কি বলবো, বলো?"

অবিশ্বাসের সুরে মতিজান পাল্টা প্রশ্ন করলো-"কি বলবো- মানে?"

- মানে ঐ এক ঝলক দেখা। আর কোন যোগাযোগও নেই, নতুন কোন খবরও নেই।

- বলো কি! তা যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা করোনি তুমি?

- আমি? হাসালে সই! আমি মেয়ে ছেলে। আমি কি চেষ্টা করবো? এ দায়িত্ব তার। তার যদি গরজ থাকতো, তা হলে সে আসতোই একবার এদিকে। আসলে ওর মন আছে কার কাছে সে খবর নেই, আমরা খামাখাই স্বপন দেখছি বসেবসে।

পরীবানুর কণ্ঠস্বরে আক্ষেপ। মতিজানের চোখে মুখে বিস্ময়। বলে কি পরীবানু। মতিজান তাই বললো-"মন আছে কার কাছে মানে!"

www.pathagar.com

ক্ষুন্ন কণ্ঠে পরীবানু বললো-"মানে, দেশে কি আর অন্য মেয়ে নেই ? ওর মন হয়তো আগে থেকেই অন্য কোথাও-"

ফুঁশে উঠলো মতিজান। বললো, "অসম্ভব। তোমার এধারণা একদম ভুল। ও এখন তো প্রায়দিন তোমাদের ওদিকেই ঘুরে বেড়ায়।

অবিশ্বাসী কণ্ঠে পরীবানু প্রশ্ন করলো- আমাদের ওদিকে! কার কাছে শুনলে?"

- অনেকের কাছে। তোমার সয়্যাও কাল ওকে তোমাদের ওখানে ঘুরা ফেরা করতে দেখেছে।

- কাল?

- হ্যাঁ। দেখে এসেই তো বললো- তোমার সই লোকটাকে পাগল করেই ছেড়েছে।

- মানে!

- তুমি নাকি তোমাদের ঐ ফুল বাগানের এক পাশে দাঁড়িয়েছিলে। তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে লাল-মিয়া অনেকক্ষণ ধরে ওখানে ডহরের উপর ঘোরা ফেরা করেছে।

- সত্যিই ?

- সত্যিই। বুধা খাঁর ওখানে বসে তোমার সয়্যা গল্পগুজব করছিল। ওখান থেকেই দেখেছে। বুধারাও দেখেছে। ওরা অবশ্যি তোমাকে দেখতে পায়নি। এছাড়া ওরা তো আর ভেতরের খবর জানে না। তাই ওরা বলেছে- কি হয়েছে লোকটার? প্রায়দিনই ও ওখানে ঘুরে কেন অমন করে! কোন সোনাদানা বা চাবিটাবী কিছু হারিয়ে ফেলেছে নাকি ওখানে?

- বলো কি? কাল বিকেল বেলা বুঝি?

- হ্যাঁ, বিকেলেই তো!

- কি আশ্চর্য্য! আমি তখন ওখানেই তো ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে ছিলাম। ডহর দিয়ে অবিরাম লোক চলাচল করে বলে ওদিকে আমি চোখ তুলে তাকাইনি। ও তাহলে সত্যি সত্যিই এসেছিল?

- এরপরও বিশ্বাস হয়না? শুধু কাল কেন? আরো কয়দিন তোমাদের ঐ বাগানের পাশের বটতলায়, মানে ঐ বুড়াপীরের মাঠে ওকে বসে থাকতে অনেকেই দেখেছে। ওখানে বসে ওনাকি প্রায়দিনই গল্প করে লোকের সাথে আর ঘুরে বেড়ায় অম্‌নি অম্‌নি। এ নিয়ে সেদিন ঐ জুমলার বাড়ীতে কারা যেন হাসা হাসি করছিল। রাস্তা দিয়ে আসার কালে কানে পড়তেই আমি দাঁড়িয়ে যাই রাস্তায়, কে একজন বললো- নিশ্চয়ই ঐ বটগাছের কোন জীন-পরীর নজর পড়েছে লাল মিয়ার উপর। নইলে তার মতো ব্যস্ত মানুষ এত ঘন ঘন আসবে কেন ওখানে? তেমন কাজ তো কিছু দেখিনা।

- বলো কি?

- হ্যাঁ। ওকে তো অনেকেই চেনে। শুনেই আমি বুঝতে পারলাম, কোন পরীতে ধরেছে তাকে।

- আশ্চর্য্য! এত খবর তুমি জানো আর আমি কিছুই টের পেলাম না?

www.pathagar.com

- তোমার আঁটকুড়ে কপাল!
- তা যা বলেছো সই! কপাল আমার ভাল হলে-।

পরীবানু তার মুখের কথা শেষ না করতেই রাস্তার দিকে চেয়ে উচ্চ স্বরে ডাক দিলো মতিজানঃ "কে যায়? হুকুম উদ্দীন নাকি?"

হুকুম উদ্দীন রাস্তা দিয়ে হন হন করে যাচ্ছিল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে চিনতে পেরেই মতিজান তাকে ডাক দিলো। পরীবানুর বাড়ী থেকে কোন লোকজন আসছে কিনা- এটা জানাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ডাক শুনে হুকুম উদ্দীন থমকে গিয়ে এদিক ও দিক চাইলো। মতিজান কে দেখতে পেয়ে বললো

- " আমাকে কিছু বললে?"

মতিজান বললো- "হ্যাঁ। শুনো তো একটু এদিকে।"

হুকুম উদ্দীন নিকটে এসে ব্যস্তভাবে বললো- "কও শিগ্গির ! আমি একটুও দেরী করতে পারবোনা!"

মতিজান প্রশ্ন করলো-" কি ব্যাপার! এত ব্যস্ত কেন ? কোথায় যাচ্ছো হন্ হন্ করে?"

- সোনাপীরের গান শুনতে।
- সোনাপীরের গান? কোথায়?
- এই পাড়াতেই কোথায় যেন। সেই খোঁজই তো করছি। এতক্ষণ আমাদের পাড়ায় মানে ঐ পরীবানুদের বাড়ীতেই হলো। ওখান থেকে বেরিয়ে ঐ সোনাপীরের দল এই দিকে এসেছে। আমি বাড়ীতে গিয়ে গায়ের কাপড় আনতেই ওদের সাথ্ হারিয়ে ফেলেছি।

একটু চমকে উঠলো পরীবানু। বললো- "কি বললে? আমাদের বাড়ীতে গান হলো সোনাপীরের ?"

হুকুমউদ্দীন বললো- "হ্যাঁ হলোই তো। অনেকক্ষণ ধরে হলো। অতক্ষণ ওরা আর কোন বাড়ীতে গায়নি।"

মতিজান জিজ্ঞেস করলো- "দল কোথাকার? কারা গাচ্ছে সোনাপীরের গান?"

হুকুমউদ্দীন উত্তর দিলো- "সোনাকোলের। মানে সোনাকোলের লালমিয়ার দল।"

ঢেঁকির একটা পাড় পড়লো পরীবানুর বুকে। ধড়াশ করে নড়ে উঠলো হৃদপিন্ড। বজ্রাহতের মতো তার সর্বাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে এলো। উদ্ভ্রান্তের মতো শুধু একটা "এ্যাঁ!" শব্দ করে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো শূন্যের দিকে।

"যাই, দেখি কোন দিকে গেল ওরা"- বলেই দ্রুত পদে চলে গেল হুকুম উদ্দীন। মতিজানও আর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলোনা। বোবার মতো চুপ করে বসে রইলো উভয়েই। খানিক পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পরীবানু বললো- "সত্যি সই, সত্যিই কপাল আমার আঁটকুড়ে।"

মুখ খুললো মতিজানও। ভারী গলায় জবাব দিলো- "বললাম যে! ঘুরে ফিরে ও

www.pathagar.com

শুধু তোমার খোঁজই করছে!"

ঠিক এই সময় কানে পড়লো অনেক লোকের কলরব। সচকিত হয়ে তারা চোখ তুলেই দেখে-প্রায় পনের বিশজন লোক এক সাথে এগিয়ে আসছে তাদের দিকেই। ব্যাপারটা কি, বুঝে ওঠার আগেই লোকগুলো হুড় হুড় করে ঢুকে পড়লো আঙ্গিনায়। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা উঠার চেষ্টা করতেই হাঁক দিলো লাল মিয়া-"ছত্তর-ছত্তর-"

সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরা আওয়াজ দিলো- "সোনাপীরের চেলা এলো বচ্ছর অন্তর!"

অপরিসীম আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহবল দুইসখী পুনরায় বসে পড়লো সাগ্রহে। চেয়ে রইলো বিস্কারিত নয়নে। চেয়ে রইলো লাল মিয়া। চেয়ে রইলো লালমিয়ার সঙ্গীরাও। আঙ্গিনায় ঢুকে তারা চোখ তুলে দেখে, তাদের সামনে পরীবানু। একেবারে মুখো মুখী। এমন ভাবে পরীবানুকে দেখতে পাবে আজ, এটা তারা স্বপনেও ভাবেনি। সে আশাও তাদের আজ ছিল না। নিতান্তই আকস্মিক এই সাক্ষাৎ। এমনভাবে লাল মিয়াকে দেখতে পাওয়ার আশা পরীবানুরও ছিল না। ছিল না লালমিয়ারও। মুহূর্ত কয়েক সকলেই হারিয়ে ফেললো- সম্বিত। বারান্দায় পরীবানু, তার পাশে মতিজান। আঙ্গিনায় লাল মিয়া। তার পেছনে সঙ্গীরা। মাথার উপর আকাশ! চারপাশে থৈ থৈ চাঁদের আলো। মোলায়েম- মনোরম!

মোহাবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটার পর সম্বিত ফিরে এলো অনেকের। পরীবানুকে নাড়া দিয়ে মতিজান চাপা কণ্ঠে বললো- "এই সই, ছিঃ ! চোখ নামাও।

চমকে উঠে পরীবানু তার চোখ দুটি নামিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। গলা খাঁকারী দিয়ে পেছন থেকে সমজান বললো- "কি ওস্তাদ। নাও, শুরু করো।"

অপ্রতিভ লাল মিয়াও নামিয়ে নিলো চোখ। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে গান ধরলো সশব্দে। গানের পিছে সশব্দে ধূয়া ধরলো তার সঙ্গীরাঃ-

লাল ঃ পীররে নীলাজামা গায়-
(ওরে) হেঁটে যেতে রুনুঝুনু, সোনার নূপুর পায়।
সঙ্গীরা ঃ 'ঐ'
লাল ঃ কাঁদেরে গোয়ালের নারী হাতে করে লোটা-
ওরে গাভীর বদলে ক্যান্‌রে না মরিল বেটা।
সঙ্গীরা ঃ পীরবে নীলাজামা ---------- পায়॥
লাল ঃ আগে যদি জানতাম বাপরে তুমি সোনাপীর-
ওরে আগে দিতাম দুগ্ধকলা, পরে দিতাম ক্ষীর।
সঙ্গীরা ঃ পীররে নীলাজামা ---------- পায়॥
লাল ঃ সোনাপীর উঠিয়া বলে মানিক পরীররে ভাই-
ওরে মেরেছি বখিলের ধনরে জিলাইয়া যাই।
সঙ্গীরা ঃ পীররে নীলা জামা ---------- পায়॥
লাল ঃ বিসমিল্লাহ বলিয়া পীররে মারে আশার বাড়ি-
ওরে পড়েছিল মরা গাভী উঠে তাড়াতাড়ি।

www.pathagar.com

সঙ্গীরা ঃ পীররে নীলাজামা ---------- পায়॥
লাল ঃ চলোরে খেরুয়া ভাইরে অন্য বাড়ী যাই-
ওরে ইও বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুকরে পরমাই।
সঙ্গীরা ঃ পীররে নীলাজামা গায়।
ওরে হেঁটে যেতে রুনুঝুনু, সোনার নূপুর পায়।"

গানশেষে লাল মিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলো- "গায়ে মাখা হলদী-।"

তার সঙ্গীরা আওয়াজ দিলো- "সোনাপীরের চেলা যায়, দান দেও জল্‌দি।"

গানের দিকে কান দিয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিল পরীবানু। তার চক্ষুছিল স্থির। মনছিল মাদক-তায় ভেজা। স্বপ্নময় জগতের এক সোনালী পরিবেশে অবস্থান ছিল তার। মতিজানের মনপ্রাণ এতটা আচ্ছন্ন নাহলেও লাল মিয়াদের মুললিত কণ্ঠে কিছুটা বিমোহিত হয়েছিল সেও। লালমিয়ারা আওয়াজ দিতেই ধ্যান ভাঙ্গলো তাদের। ধ্যান ভাঙ্গতেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো মতিজান। চার পাশের ভিড়-জমানো শ্রোতারাও প্রস্থানের উদ্দেশ্যে নড়ে চড়ে উঠলো। দান দেয়ার পালা এখন। ধান দিয়ে দান। ধান পেলেই চলে যাবে গায়কেরা। মতিজান উঠতে উঠতে বললো- "তুমি একটু বসো সই। আমি গিয়ে চট করে ধান নিয়ে আসি।"

পরীবানুর মোহ তখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে ভুলে গেল স্থান কাল। মতিজানের আঁচল ধরে টান দিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বললো- "সই, ওদের আর একখান গান গাইতে বলোনা?"

মৃদুকণ্ঠে হলেও কথাটা কানে গেলো অনেকের। কানে গেল লাল মিয়ারও। এইটেই সে চাইছিল। এমন একটা আহবান কোন দিক থেকে আসুক, এই ছিল তার কাম্য। এত সাধের সাক্ষাৎ এত শিগিগর শেষ হোক, এমনটি সে কিছুতেই চাইছিলনা। পরীবানুর দিক থেকেই সে আহবান আসছে দেখে এক অনির্বচনীয় আবেগে শিহরিত হলো তার অন্তর। মতিজান মুস্‌কি হেসে লাল মিয়াদের লক্ষ্য করে বললো-"তোমরা আর একখান গান গাও। আমার সই শুনবে। আমি গিয়ে ধান আনি ততক্ষণ।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো মতিজান। প্রস্থানোন্মুখ শ্রোতৃমন্ডলী খুশী মনে ঘুরে দাঁড়ালো আবার। উৎফুল্ল গায়ক-গোষ্ঠী বিপুল উৎসাহের সাথে তৈরী হলো পুনরায়। লাল-মিয়া বেছে বেছে শুরু করলো সোনাপীরের বিয়ে পর্ব। গেয়ে উঠলোঃ

লাল ঃ "তোরা জয় দেলো সখীগণরে সোনাপীরের বিয়া-
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল ঃ সোনাপীর বিয়ে করে যাচ্ছে খুশী হয়্যা।
সঙ্গীরা ঃ তোরা জয় দেলো ---------- বিয়া॥
লাল ঃ আশ পরশী পাড়ার লোকে পুছে ডাক দিয়া

www.pathagar.com

সঙ্গীরা ঃ তোরা জয় দেলো ---------- বিয়া ॥
লাল ঃ সোনাপীর -সোনাপীর তুমি দানে পেলে কি-
সঙ্গীরা ঃ তোরা জয় দেলো ---------- বিয়া)॥
লাল ঃ সোনার বরণ একটি কন্যা দানে পেয়েছি ॥
সঙ্গীরা ঃ তোরা জয় দেলো ---------- বিয়া ॥
লাল ঃ দান চাইনে, মান চাইনে, পেলে এমন মেয়ে ॥
সঙ্গীরা ঃ তোরা জয় দেলো ---------- বিয়া ॥
লাল ঃ গাও ভরা গয়না দিয়ে রাখিব সাজায়ে ॥
সঙ্গীরা ঃ তোরা জয় দেলো সখীগণরে সোনাপীরের বিয়া ॥

শ্রীরাধিকার শ্যাম নামের মতোই লাল মিয়ার এ গানের ইঙ্গিত পরীবানুর কানের ভিতর দিয়ে তার মর্মস্থল স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার অবশ হলো সর্বাঙ্গ। নিজের কাছে নিজেই সে লজ্জা পেয়ে চুপচাপ বসে রইলো সংকুচিত অবস্থায়।

শেষ হলো গান। মতিজান বেরিয়ে এলো কুলাভরা ধান নিয়ে। এখন তার বিন্দে দূতীর ভূমিকা। তাই সে ধানগুলো নিজে দিতে না গিয়ে ধানের কুলা তুলে দিলো পরীবানুর হাতে। বললো- "যাও সই, দান দিয়ে এসো।"

একদিকে দুর্নিবার আগ্রহ, অন্য দিকে শরমের দুর্ভেদ্য বেড়াজাল। এই দুইয়ের মাঝে পড়ে পৌষের শীতেও ঘামতে লাগলো পরীবানু। শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো আগ্রহ। শরমের বেড়াজাল দুই হাতে ছিঁড়ে সে ধীরে ধীরে খাড়া হলো কুলা হাতে। লাল মিয়া বারান্দাটার কাছা-কাছিই ছিল। পরীবানুকে উঠতে দেখে সে দ্রুত পদে ছুটে গেল ধান নেয়া বস্তার কাছে। ক্ষীপ্র হস্তে বস্তাখানা তুলে নিয়ে সে আরো কাছে এলো। বারান্দার নীচে নেমে এলো পরীবানু। ঝুঁকে পড়ে বস্তার মুখ মেলে ধরলো লাল-মিয়া। বললো- "দাও, এখানে দাও।"

কুলার ধান বস্তার মধ্যে ঢেলে দিতে ঝুঁকে পড়লো পরীবানুও। দুই মাথার মাঝখানে হারিয়ে গেল ব্যবধান। লাল মিয়া চাপা কণ্ঠে বললো- "তুমি বড় সুন্দর!"

কুলাসমেত থর থর করে কেঁপে উঠলো পরীবানু। আবার এক অনাঘ্রাত শিহরণে অবশ হলো তনু মন। সর্বাঙ্গ ঢেকে এলো লজ্জায়। তার ইচ্ছে হলো, কুলা ফেলে সে পালিয়ে বাঁচে দৌড় দিয়ে। কিন্তু সে তা পারলোনা। ঠিক পারলো না নয়, তা করলো না। এমন সুযোগ এজীবনে তার হয়তো আর আসবেনা। তার অন্তরের অভিব্যক্তি লাল মিয়ার গোচরেও পৌছবেনা। তাই মরিয়া হয়ে কম্পিতকণ্ঠে সেও বললো- "তুমিও তো !"

সর সর করে কুলোর ধান ছালার মধ্যে পড়লো। রিনিঝিনি বেজে উঠলো লাল মিয়ার হৃদয়-বীনা। পরীবানু টলতে টলতে ফিরে এলো বারান্দায়। গীতকণ্ঠে ফিরে গেল লাল মিয়া আর তার সঙ্গীরা। সে গীত তারা সে রাতে আর থামায়নি।

www.pathagar.com

[আট]

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ক্ষমতাচ্যুত বাংলার মুসলমানেরা কেবল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়েই পিছিয়ে যায়নি, তাদের ধর্মীয় জীবনও ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছে। রাজা খৃষ্টান, জমিদারেরা প্রায় সকলেই হিন্দু। রাজা ও জমিদারদের ইচ্ছের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, জ্ঞাতেও অজ্ঞাতে নিজেদের স্বকীয়তাই বিপুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে এদেশের মুসলমান গণ। অতীতের শক্ত ঈমান আর শরিয়তের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন ইংরেজ আর হিন্দুদের প্রভাবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে ব্যাপকহারে শির্‌ক্ বিদাত ঢুকেছে। হিন্দুয়ানী চিন্তা ধারার সংমিশ্রণে ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি হয়েছে সুফীবাদ। সৃষ্টি হয়েছে পীর দরবেশ ও সুফী সাধকের প্রাচুর্য। শুরু হয়েছে পীরপূজা, গোর পূজা, দরগা পূজা। শিরক বিদাতের আধিক্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি অনেকটা একাকার হয়ে গেছে।

চলনবিল এলাকাতে এর প্রভাব আরো প্রকট। নবাব মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বব্যবস্থার ফলে অনেক আগে থেকেই এ এলাকার মুসলমানগণ হিন্দু জমিদারের অধীনস্ত হয়েছে। এই অধীনতা আরো পাকাপোক্ত হয়েছে ইংরেজ শাসনে। ফলে গুমরাহীর আবর্তে তলিয়ে গেছে চলন বিলের মুসলমানেরা। অল্প কিছু খুদে মুসলমান তরফদার তালুকদার থাকলেও, এই প্রবাহ তারা রোধ করতে পারেননি। হিন্দু সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে ঢুকে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন মূল ধারা থেকে সরিয়ে এনেছে অনেক অনেক দূরে। ম্রিয়মান হয়ে গেছে কোরআন সুন্নার অনুশীলন। সেই স্থান দখল করেছে দরগা-মাজার আর পীর-পীরানীর সংস্কৃতি। ক্ষীণ হয়ে এসেছে রোজা নামাজের প্রচলন। মুসলিম আমলে তৈরী পাকা মসজিদগুলোর অধিকাংশই গিলে ফেলেছে বটবৃক্ষের মূলে। চার পাশে গজিয়েছে নল-খাগড়া, ঝোপ-ঝাড়। কোন কোনটার পরিচিতি মসজিদ-তলা নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অতীতের দু' একটা আর হাল আমলের কাঁচা মসজিদ চালু যে গুলো আছে, সে গুলোর এক একটা চালাচ্ছে চার পাঁচ গা মিলে। অনেক সময় এই চার পাঁচ গাঁ মিলে দশটা লোকও পাওয়া যায় না জামাতে।

অপরদিকে, সরগরম হয়ে উঠেছে দরগা-মাজারের চত্বর। লোকালয়ে ও মাঠে ময়দানে অসংখ্য বটপাকুরের গাছ দরগার পরিচিতি নিয়ে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে আছে সদম্ভে। বিভিন্ন পীর পীরানীর নামে নামকরণ হয়েছে এই সমস্ত দরগার। বুড়াপীর, খোঁড়া-পীর, জঙ্গীপীর, মাদারপীর- এবম প্রকার নাম। এর সাথে আছে অনেক কামেল বাবা ও সাধুবাবাদের মাজার। বিপদে মুসিবতে এ সবেরই শরণ নেয় এ এলাকার প্রায় সকল মুসলমান। মানত করে, বাতি দেয়, শিরনী পাকায়। বারো মাসে তের পরবের নামে এসব দরগা-মাজার জমজমাট করে রাখে চলন বিলের মুসলমানেরা। ব্যতিক্রমের সংখ্যা অতি নগন্য। মুসলমানদের পাশা-পাশি কিছু

www.pathagar.com

হিন্দুদেরও আগমন ঘটে এ সব স্থানে।

লাল মিয়ারা এই যুগের আর এই সমাজের মানুষ। তাদের জীবনযাত্রা যুগের সাথে সমান্তরাল। যুগ-সমাজের শিকার তারা। এজন্যে তাদের এককভাবে দোষারোপ করার প্রশ্নই কিছু উঠেনা। আদৌ কিছু দোষের হলে, সেটা তাদের মাত্রাধিক প্রাণ চাঞ্চল্য। তাদের অস্থির-অধীর স্বভাব। আর পাঁচজনের মতো নিরিবিলি জীবন যাপনে অনভ্যস্ত তারা। সংসারের কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাদের চাই প্রাণ প্রাচুর্যের বহিঃ প্রকাশ। উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বহিঃপ্রকাশ না ঘটালে দম তাদের বন্ধ হয়ে আসে। তাই, অবসর অবকাশ তারা ব্যয় করে না শুয়ে শুয়ে। খেয়ে ঘুমিয়ে কাটায়না। বেরিয়ে পড়ে অবসর বিনোদনে।

গতরাত ছিল পৌষমাসের শেষ রাত। এ রাতে ঘুম পাড়েনি তারা কেউ। পুষ্‌ণের পালা পুড়িয়ে হৈ হৈ করে কাটিয়েছে। সকাল বেলা পাক করছে মাংগা ধানের চাল দিয়ে সোনাপীরের শিরনী। নিজেরা খাবে, গ্রাম বাসীদের দাওয়াত করে খাওয়াবে। এরই এক ফাঁকে কয়েকজন সঙ্গীসহ লাল মিয়া ছুটে গেছে বিল বাথানে। এ এলাকার সব চেয়ে বড় দরগা বিল বাথানের বুড়া পীরের দরগা। বিল বাথানের তরফদারের বাড়ীর একদম কাছেই। যে কোন পীরের শিরনীর আনযাম করলে, কিছু শিরনী পৌছানোই চাই এই বুড়া পীরের দরগায়-তা সোনাপীর, মাদার পীর, যে পীরেরই হোক। কোন পাকানো শিরনী দেয়া হয়না এই দরগায়। শুক্‌নো শিরনী চাই। বাতাসা, চিনিমুড়কি, গুড়ে মুড়কি বা অন্য কোন শুকনো মিষ্টি শিরনী হিসাবে দিতে হয় এখানে।

এক পোয়া বাতাসার একটা ঠোঙ্গা হাতে লাল মিয়ারা কয়েকজন ছুটে এসেছে বিলবাথানে। ছুটে এসেছে আরো অনেক স্থানের সোনাপীরের শিরনী পাকানো লোকেরা। ঠোঙ্গা ভর্তি বাতাসা মুড়কি এনে ঢেলে দিচ্ছে বুড়াপীরের দরগা নামের এই বট গাছের গোড়ায়। ঢেলে দিয়ে সরতে না সরতেই ছেলে-ছোকরাদের সাথে অনেক যুবক-বৃদ্ধও ছুটে এসে কাড়াকাড়ি করে কুড়িয়ে নিচ্ছে ঐ সব শুকনো শিরনী। বটগাছের খাওয়ার সাধ্য নেই।

লোকজন তা কুড়িয়ে খেলেই খাওয়া হলো বুড়াপীরের-এই প্রত্যয় নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাচ্ছে শিরনী প্রদান কারীরা। লাল মিয়ারাও শিরনী নিয়ে এলো আর ঢেলে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলো।

তরফদার সাহেবের বাড়ীর নীচে ডহর দিয়ে পথ। দু'চারজন লোকের আনাগোনা থাকলেও আসার সময় তেমন কিছু লক্ষ্য করেনি লাল মিয়ারা। এই ফেরার পথে তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো তরফদার সাহেবের বাহির আঙ্গিনায় প্রচুর লোকের ভিড় আর ভীষণ তর্জন গর্জন। ঘটনা কি জানার জন্যে লাল মিয়ারা চলে এলো তরফদার সাহেবের আঙ্গিনায়।

ঘটনা চিরাচরিত। পুষণের রাতে লাল মিয়াদের এলাকায় তেমন কিছু ঘটেনি। ঘটেছে এই বিল বাথানে। নায়েব মিয়াজান মিয়ার ছেলে হুকুমউদ্দীনের পুষণের

www.pathagar.com

পালা পুড়িয়ে দিয়েছে কে বা কারা। যেমন বোকা-আল্‌সে হুকুম উদ্দীন নিজে, তেমনই বোকা আল্‌সে সঙ্গী সাথীরা তার। গাঁয়ের অন্যান্য সকলেই পুষণের পালা পাহারা দিয়ে আর পালা পুড়িয়ে কাটিয়েছে। অপর দিকে, হুকুম উদ্দীন ও তার সঙ্গীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে সারা রাত। বেলা যখন উঠি উঠি করে সেই সময় উঠে পালা পোড়াতে গিয়ে দেখে, কম্মকাবার। পালা তাদের আগেই পুড়ে ছাই।

এ ঘটনা হঠাৎ বা একক ঘটনা নয়। এমন ঘটনা অনেকবার অনেক স্থানেই ঘটে আর ঘটে থাকে। তা নিয়ে বাড়ীর উপর এতবড় শালীশ-দরবার কখনো হয়নি আর হয়না। বাড়ীর নীচের ঘটনা বাড়ীর নীচেই শেষ হয়েছে। কিছুক্ষণ হৈ চৈ আর গালমন্দ শোনা গেছে, এই যা। ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার নিয়ে বড়রা মাথা ঘামায়নি।

এবার এটা গড়িয়েছে অনেক দূর। পালা তাদের ছাই হয়েছে দেখেই হুংকার দিয়ে উঠেছে নায়েব তনয় হুকুম উদ্দীন। ফেলনা ফাল্‌তু নয়, একটা ডাক-সাইটে নায়েবের পুত্র সে। তার পালা পুড়িয়ে দেবে- এত বড় দুঃসাহস! সঙ্গী সাথী নিয়ে সে অন্যান্য পালার লোক যাকেই একা একা পেয়েছে তাকেই ধরে মেরেছে। এতে ফল ফলেছে বিপরীত। এসেছে পাল্টা আঘাত। অনেক পালা মাঠে। অনেক লোক অনেক হৈ-হুল্লোড় ও হুটপাট। অন্যান্য পালাওয়ালারা অনেকেই এতে ক্ষেপে গিয়ে ঘিরে ধরেছে হুকুম উদ্দীনকে। আচ্ছামতো পিটে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চলে গেছে সেখান থেকে। খবর পেয়ে নায়েব সাহেবের পাইক পেয়াদা এসে তাকে তুলে এনেছে মাঠ থেকে।

পুত্রের হালত দেখে বারুদের স্তূপে আগুন লাগার মতো জ্বলে উঠেছেন নায়েব মিয়াজান আলী মিয়া। এই দন্ডেই আসামীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে আসামী নির্ণয় নিয়ে। সকাল হয়ে গেলেও ঘন কুয়াশা ছিল মাঠে। প্রচুর লোক এসে ঘিরে ধরেছে তাকে- এইটুকুই হুকুম উদ্দীন জানে। মার মার রবে সেই সব লোকদের ছুটে আসতে দেখেই দুর্বলচিত্র হুকুমউদ্দীনের স্বল্পজ্ঞান লোপ পেয়েছে তখনই। কে বা কারা এসে মারলো তাকে, কিছুই সে জানেনা। কাউকেই সে সনাক্ত করতে পারেনি। অনেক লোককে আসতে দেখে তার ভীরু সঙ্গী ক'জনও দৌড় দিয়েছে আগেই। তারাও কেউ আসামীদের চেনে না। রাতের অন্ধকারে পালাপোড়ানো আসামী বা আসামীদের সনাক্ত করা তো আরো কঠিন। সুতরাং, আসামীদের সঠিকভাবে সনাক্ত করার আগে শাস্তি বিধানের প্রশ্নই কিছু উঠেনা।

কিন্তু তাহলে কি হবে? খোদ নায়েবের ছেলের গায়ে হাত, তার পালা পুড়িয়ে দেয়া- একি চাট্টিখানিক কথা? শাস্তি বিধানে বিলম্বটা সইতে পারবেন কেন তিনি ? হুকুম চেঁড়েছেন, "এই মুহূর্তেই বেঁধে আনো আসামীদের, যেখান থেকেই হোক।" নায়েবের হুকুমে পাইক পেয়াদারা পুনরায় ছুটে গেছে মাঠে এবং নীরিহ ও বৃদ্ধ গোছের তিনজন কৃষককে জমিতে কর্মরত পেয়ে তাদেরকেই মারতে মারতে বেঁধে এনেছে পাইকেরা।

www.pathagar.com

ফের ঘটনাটি মোড় নিয়েছে ভিন্ন দিকে। খবর পেয়ে গোটা মাঠের ও গাঁয়ের সমস্ত লোক ক্ষেপে গিয়ে মার মার রবে ছুটে এসেছে লাঠি শোটা হাতে। নায়েবের অহেতুক নির্যাতন দিনে দিনে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এবার এই নিরপরাধ, নীরিহ আর বৃদ্ধ কৃষকদের উপর নির্যাতন তারা সহ্য করতে পারেনি। জেল হোক, ফাঁস হোক, নায়েব আর তার পাইক পেয়াদার গুষ্টি উদ্ধার না করে এবার ছাড়বেনা।

তরফদার সাহেব বাড়ীতে নেই। এক দিকে নায়েব আর তাঁর কয়েকজন পাইকপেয়াদা, অন্যদিকে মারমুখী বিপুল সংখ্যক লোক। ভীত সন্ত্রস্ত নায়েব হতবুদ্ধি তখন। কি করবেন, এই ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাবেন, ভেবে কোন দিশে করতে পারছেন না। এই সময় লাল মিয়ারা সেখানে এসে হাজির হলে অকুলে কুল পেলেন নায়েব সাহেব। ঠ্যালার নাম বাবাজী। ঠ্যালায় পড়ে নায়েব সাহেব লাল মিয়াদের উদ্দেশ্যে কাতর কণ্ঠে বললেন- এই যে বাবা, তোমরা এসেছো? এই সব লোকদের তোমরা থামাও বাবা। ঘা'ট-অপরাধ যা-ই হোক, হুজুর বাড়ীতে এলে সে বিচার তিনি করবেন। আপাততঃ এদের তোমরা থামাও। দোহাই তোমাদের। ঝোঁকের মাথায় এরা আমার প্রাণ নাশও করতে পারে।

কাঁপতে লাগলেন নায়েব সাহেব। উপস্থিত মোটামুটি সকলেই লাল মিয়াদের চেনে। সৎ-স্বভাব আর সৎ-সাহসের জন্যে লাল মিয়াকে ভাল বাসে আর সমীহ করে অনেকে। লাল মিয়ার হস্তক্ষেপে আর বিশেষ চেষ্টায় পরিস্থিতিটা অবশেষে নিয়ন্ত্রণে এলো। অপরাধটা অধিকটাই হটকারী পাইক পেয়াদার। অথচ পাইক পেয়াদারা সকলেই তরফদার সাহেবের কর্মচারী, নায়েব সাহেবের নয়। তরফদার সাহেবের অনুপস্থিতিতে বাড়ীর উপর এসে তাঁর কর্মচারীদের শায়েস্তা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তরফদার সাহেব বিবেচক লোক। এদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান অবশ্যই তিনি করবেন। বৃদ্ধ কৃষকদের উপর এই অন্যায় জুলুম কখনোই তিনি বরদাস্ত করবেন না। এসব বলে সমঝানোর ফলে আস্তে আস্তে শান্ত হলো জনতা এবং বিদায় হলো সকলেই।

দুষ্টলোকের কখনো কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে না। থাকেনা সামান্যতম ভদ্রতা বোধও। বিপদটা কেটে যাওয়ার সাথে সাথে পাইক পেয়াদাদের নিয়ে হন হন করে সেখান থেকে চলে গেলেন নায়েব সাহেব। এতবড় একটা বিপদ থেকে বাঁচানোর বিনিময়ে লাল মিয়াদের এতটুকু ধন্যবাদও জানালেন না।

তরফদার সাহেবের বাহির আঙ্গিনা ফাঁকা হয়ে গেল। রইলো শুধু লাল মিয়া আর তার কয়েকজন সঙ্গী সাথী। তারাও বিদেয় হওয়ার উদ্যোগ করতেই লাল মিয়ার চোখ গেল তরফদার সাহেবের অন্দর মহল সংলগ্ন বৈঠকখানার দিকে। বৈঠক খানার বারান্দার অনেকটা কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল লাল মিয়ারা। সেদিকে তাকিয়েই লাল মিয়া দেখলো, বৈঠক খানার বারান্দায় আসার দুয়ারটা খোলা আর সেই খোলা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে পরীবানু। পরীবানু কখন এসে সে দুয়ারে দাঁড়িয়েছে লাল মিয়ারা কেউ তা জানেনা। পরীবানু একদৃষ্টে চেয়ে আছে লাল মিয়ার দিকে। লাল

www.pathagar.com

মিয়া সে দিকে তাকাতেই পরীবানুর চোখে আটকে গেল লাল মিয়ার চোখ। পরীবানুর মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মুখে তার ফুটে উঠলো সলজ্জ মধুর হাসি।

একদৃষ্টে উভয়ের দিকে চেয়ে রইলো উভয়ে। নিজের অজ্ঞাতেই কয়েক কদম এগিয়ে এলো লাল মিয়া। আত্মবিস্মৃত হলো সে। আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে সরাসরি প্রশ্ন করলো- একি তুমি! তুমি এখানে কখন এলে?

শরমে পরীবানু নামিয়ে নিলো চোখ। লজ্জানত মস্তকে মুখটিপে হাসলো। জবাবে সে কম্পিতকণ্ঠে বললো- অনেকক্ষণ।

লাল মিয়া বিহ্বল কণ্ঠে বললো- অনেকক্ষণ? সে কি।

লাল মিয়া আরো কিছুটা এগিয়ে এলো তার দিকে। পরীবানুও চলে এলো বারান্দায়। মুখে কিছু না বলে একটা মস্ত বড় গোলাপফুল লাল মিয়ার দিকে ছুড়ে মারলো পরীবানু। ছুড়ে মেরেই হেসে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকলো শরমে।

ঠিক সেই সময় অন্দর মহল থেকে কারা যেন দেউটি দিয়ে সরবে বাহির আঙ্গিনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। শব্দগুনেই চমকে উঠলো পরীবানু। বৈঠকখানায় ঢুকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চমকে উঠলো লাল মিয়াও। ক্ষিপ্র হস্তে ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপদে ফিরে এলো অদূরে দন্ডায়মান তার সঙ্গীদের কাছে। সঙ্গীদের মুখে তখন থৈ থৈ হাসি। তাদের কান চোখ কোন কিছুই এড়ায়নি।

তরফদার সাহেবের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই লাল মিয়ার সঙ্গীরা তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের জানিয়ে দিলো এই খবর। এরপরে কয়েকদিন এই নিয়েই চলতে লাগলো মাতামাতি। আনন্দের আধিক্যে এই নিয়ে গান বাঁধলো বছির ও বাহার। সুরও দিলো তারাই। সোনাকোলের বটতলায় দুপুর বেলা-বসে ওরা রপ্ত করলো গানটি। সন্ধ্যের সময় লাল মিয়ার বৈঠক খানায় এসে এরা বসে রইলো তাল ঠুকে। লাল মিয়া ঘরে ঢুকতেই তাকে এরা ঘিরে ধরলো আচমকা এবং সশব্দে গেয়ে উঠলো গানটাঃ

উভয়ে ঃ " ধরিতে মনের মানুষ,
ধরিতে মনের মানুষ হাজার মানুষ থুয়ে
সোনাকোলের ছেলে খোঁজে বিলবাথানের মেয়ে।
খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ, খোঁজ করিল,-
খোঁজ করিয়া জোড় বাঁধিল,-
বিল চলনের লালপরী গো-

www.pathagar.com

বছির ঃ ও আমার সুন্দরী গো, সখী আমার সোনার বরণ।
বাহার ঃ ও আমার বৈদ্যাশী গো, বন্ধু আমার জীবন মরণ।
উভয়ে ঃ ধরিতে মনের মানুষ,
ধরিতে মনের মানুষ হাজার মানুষ ফেলে,
বিল বাথানের মেয়ে খোঁজে সোনাকোলের ছেলে।
খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ, খোঁজ করিল,-
খোঁজ করিয়া জোড় বাঁধিল-
বিল চলনের লাল পরী গো-
বছির ঃ ও আমার প্রাণ প্রিয়া গো, সখী আমার ফুলের ডালা
বাহার ঃ ও আমার মনচোরা গো,
বন্ধু আমার গলার মালা ॥"

গান শেষে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো দুইজন। লাল মিয়া তন্ময় হয়ে গান শুনছিল এতক্ষণ। এবার সে বাহবা দিয়ে বললো- "বাঃ ! তোমরা দেখছি কাঁচাকাঁঠাল লাথি মেরেই পাকিয়ে ফেললে রাতারাতি! এমন সুন্দর গান কে বাঁধলোরে?"

উভয়ে সমস্বরে উত্তর দিলো-" আমরাই ওস্তাদ, আমরাই।"

- তোমরাই!

বছির ঃ হ্যাঁ ওস্তাদ। পরীবানু তো তোমার এখন। এ আনন্দ চেপে রাখা কি সম্ভব? তাইতো আমরা সখ করে বেঁধে ফেললাম গানটা।

- সুরও দিলে তোমরাই?

বাহারঃ হ্যাঁ ওস্তাদ, দিলামই তো।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এদের দিকে চেয়ে রইলো লাল মিয়া। পরে হাসতে হাসতে বললো- "নাঃ, এরপর আর আমার তোমাদের ওস্তাদ থাকা চলে না। এখন থেকে তোমাদেরকেই ওস্তাদ বলা উচিত আমার।"

বছিরঃ কেন ওস্তাদ?

- আমি মাথাকুটেও এমন গান বাঁধতে পারতামনা কখনও। এত তাজা মগজ তোমাদের?

বাহারঃ কেন ওস্তাদ, ভাল হয়নি গানটা?

- ভাল হয়নি মানে? অদ্ভূত রকমের ভাল হয়েছে।

বছিরঃ তাই নাকি? তাহলে আমরা সবাইকে শিখিয়ে দেবো গানটা। মাঝে মাঝেই মজা করে গাওয়া যাবে সবাই মিলে।

চমকে উঠলো লাল মিয়া। বললোঃ "খবরদার! তোমরা তিলকে একদম তাল বানিয়ে ফেলে ছো। এ গান যদি লোকের কানে যায়, তাহলে কি আর রক্ষে আছে? জাত ইজ্জত তো যাবেই, তার উপর আবার সব আশাই অংকুরে বিনাশ হবে! খবরদার!"

www.pathagar.com

লাল মিয়ার শংকা দেখে শংকিত হলো এরাও। বাহার বললো- "তাই?"

লাল বললোঃ "হ্যাঁ, তাই। যদি আমার মঙ্গল চাও, তাহলে এ গান তোমরা আর ককখনো গাইবেনা।

ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বছির বললো, "ঠিক আছে ওস্তাদ তাই হবে। তোমার ক্ষতি হোক, এটা আমরা চাইনে।"

কিছুক্ষণ চিন্তাকরে বাহার বললোঃ "কথাটা কিন্তু ঠিক বছির। এ গান লোকে শুনলে আর তরফদারের কানে গেলে হিতে কিন্তু ঠিকই বিপরীত হবে।"

বছির বললোঃ "তা ঠিক। ঝোঁকের মাথায় ভেবে দেখিনি এতটা।"

লালমিয়াকে কথা দিয়ে বিষন্ন মনে ফিরে গেল বছির ও বাহার। কথাটা তারা দিলো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা তারা পুরোপুরি রক্ষে করতে পারলো না। বাইরের লোকে না শুনলেও, তাদের দলের মধ্যে দিনে দিনে সুপরিচিত হয়ে উঠলো গানটা। এর আকর্ষণ লাল মিয়াকেও পেয়ে বসলো কালক্রমে। আড়ালে আবডালে গানটা সে নিজেও গাইতে লাগলো গুণ গুণ করে।

হাট থেকে ফেরার পথে হারু সাঁতালের সামনে পড়লো লাল মিয়া। লাল মিয়াকে দেখেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো হারু সাঁতাল। বললো-

- "হেই বাবা। তু আদমী লাই আচিস্। কুচু দেউতা ঔতা আচিস বটেক! হামার মুনের কুতা জানিয়া লিচিস্ হুঁ!"

লাল মিয়া এর বিন্দু বিসর্গও বুঝলো না। সে হাসতে হাসতে বললো- "তোমার মনের কথা! কি তোমার মনের কথা মোহন্ত? আর আমিই বা তা কি করে জানলাম?"

হারু সাঁতালের বউ মলুয়া ওরফে মলয়া হারুকে মোহন্ত বলে ডাকে। তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। নেশার ঘোরে সাধুর মতো বসে বসে ঝিমোয় বলে, তার মলুয়া এই মোহন্ত নাম দিয়েছে। এই নাম শুনলে যারপর নাই খুশী হয় হারু সাঁতাল। লাল মিয়ার কথা শনে সে হো হো করে হেসে নিলো একদফা। তারপর সে বললো- "তু বিলকুল জানিয়া লিচিস্ বটেক। জানবেক লাই তো হারু যাবে তুহার কাছে। তু আসবি ক্যানে বোল্?

লাল মিয়া বিস্মিত হয়ে বললো- "আমার কাছে তুমি যাবে? কেন বলোতো?"

- কুতা আচেঁ। জব্বোর কুতা আচেঁ

- কথা!

- হুঁ বটেক। তুর বিহার কুথা।

- বিয়ে!

- হুঁ হুঁ। কনে ভি ঠিক হই গেইচেঁ। হামার বহু মলুয়া, মলুয়া বুলে, উ লাল বাবুর বহু কুতাও মিলবেক লাই। ঐ একটাই আচেঁ হুঁ।

- একটাই?

- বিল কুল। উ দেখিয়া লিচেঁ বটেক। মলুয়া বুলে, মোহন্ত, তু বিহা লাগিয়ে দেনা ক্যানে?

www.pathagar.com

- কে, কে সে কনে?
- তু ভি দেখিয়া লিচিস হাঁ। হৈ তরফদার বাবুর মাইয়া। জবেবার খাছা! তু উহারে বহু করিয়া লে।

এরপর হো হো করে না হেসে আর উপায় ছিল না লাল মিয়ারও। হারু সাতাল কথাটা এ মন ভাবে বললো যেন, পরীবানু লাল মিয়ার একদম মুঠোর মধ্যে, সে ইচ্ছে করলেই যখন খুশী তখনই তাকে বিয়ে করতে সক্ষম। তাই সে হাসতে হাসতে বললো- " আমি বিয়ে করতে চাইলেই কি আর হয় মোহন্ত ? ওর বাপ যেখানে দেবে, সেখানেই তো বিয়ে হবে ওর।"

হারু আরো উৎসাহিত হয়ে বললো-" দিবেক লাই ওর বাপ? জরুর দিবেক। জমিনদার বাবু দেউতা আদমী। হামি জানে বটেক হাঁ। হামি উহারে পুছিয়েঁ লিবেক।"

বাধা দিলো লাল মিয়া। বললো-"খবরদার মোহন্ত! এমন কথা তাকে যেন কখনও তুমি বলো না! তার মনের ভাব না জেনে হুড়মুড় করে এসব কথা ভুললে ভালর চেয়ে মন্দই হবে বেশী।"

ভড়কে গেল হারু সাতাল। বললো- "হেই বাবা! তাই?"

লাল মিয়া বললো- "হ্যাঁ, তাই। তাড়া হুড়ার কাজ ভাল হয় না কখনো। সময় হলে আমিই তোমাকে বলতে বলবো। এখন যাও।"

হারু বললো- "হঁ, ই কুতা ঠিক আচেঁ বটেক।

হামি আখুন বুলবেক লাই।"

খানিকটা ক্ষুণ্ন মনেই বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো হারু সাঁতাল।

সমজান আর জববার খানিক মত বিনিময় করেই একমত হলো দুজন। মজু একটু আমতা আমতা করে একমত হলো সেও। তাদের মতে- বল, বিদ্যা আর বুদ্ধিতে লাল মিয়ার জুটি এ তল্লাটে নেই। কিন্তু প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে তার মতো ভীরু ও আর দুটি নেই এ অঞ্চলে। তা না হলে সোনাপীর মাঙ্গার আর পুষণের শিরনীর দিনের অমন ঘটনার পর কি হাত-পা গুটিয়ে এমন ভাবে ঘরে থাকে কেউ?

মাঠে কাজ করতে করতে একত্রে বসে এই তথ্য আবিস্কার করলো তিনজন। বিকেল বেলা লাল মিয়াকে সামনে পেয়ে তাকে হৈ হৈ করে ঘিরে ধরলো তারা। জব্বার বললো- "কি ব্যাপার ওস্তাদ? আজও তুমি গাঁয়েই বসে আছো? "

লাল মিয়া কিছু বলার আগেই তাদের মতামতটা সবিস্তারে জানিয়ে দিলো ময়জুদ্দীন মজু। সে আরো যোগ দিয়ে বললো- "মেয়ে যেখানে রাজী, সেখানে কাজীর এত ভাবনা কিসের ওস্তাদ? মেয়ের হাবভাবে তো বুঝতে কারো বাকী নেই যে, তোমাকে পছন্দ হয়েছে তার! তবু তুমি এইভাবে গা এলিয়ে চলবে?"

এদের আগ্রহ যে অসামান্য লাল মিয়া তা জানে। তার নিজের আগ্রহও যে এদের চেয়ে কম নয়, সেটাও সে বুঝে। কিন্তু তাই বলে যে মরিয়া হতে হবে তাকে, এটা সে বুঝে না। তাই সে স্মিতহাস্যে বললো- "তো কি করবো আমি?"

www.pathagar.com

সমজান বললো- "তোমাকে যেতে হবে বিল-বাথানে। পাত্তা লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। একবার, দুইবার, দশবার। একে জমিদারের মেয়ে, তার উপর আবার তোমার বাপের সাথে তদের ছিল আজন্মের শত্রুতা। সহজে কাজ উদ্ধার হবে এটা কিছুতেই আশা করা যায় না। মেয়েকে আগে হাত করো পুরো-পুরি। তারপর আমরা দেখে নেবো তরফদারের ইচ্ছা আর অনিচ্ছা।"

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে যথেষ্ট। তরফদারের সাথে শত্রুতা ছিল লালের বাপ জসমত বিয়ার। অনেক দিনের শত্রুতা। নিতান্তই একটা জেদের ব্যাপার নিয়েই এই শত্রুতাটা। এর আগে দুইয়ের মাঝে সৌহার্দ্যই ছিল অনেক খানি। সোনা কোলের মাঠের শেষেই তরফদারের জমিদারী। মাঝে একটা মস্তবড় গোচর। দশ গাঁয়ের গরু চরে সেখানে। কিছু বদলোকের উস্কানীতে তরফদার সাহেব বললেন- গোচরটি তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত। শুধু তাঁর প্রজারই গরু চরবে গোচরে। জসমত মিয়া কাগজ খুলে দেখালেন-গোচরটি দীর্ঘকালের খাস-খতিয়ানের জমি। সব লোকেরই গরু চরার অধিকার আছে সেখানে। কাগজ দেখে থেমেই গেলেন তরফদার সাহেব। কিন্তু কুযুক্তি দিলো বদলোকেরা। তারা বোঝালো-জমসত মিয়া তাঁকে জমিদার বলে মানতে চায়না বলেই তাঁর ইচ্ছের উপর হাত তুলেছে জসমত মিয়া। তাঁকে খাটো করাই জসমত মিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। সদ্য জমিদারী লাভের পর কিছুটা দকেই ছিলেন তরফদার। তিনি লাল নিশান উড়িয়ে দিলেন গোচরের উপর। লাঠিয়াল দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন দশ গাঁয়ের গরু। হাঁ-হাঁ করে খাড়া হলো দশ গাঁয়ের লোক। তারা ছুটে এলো জসমত মিয়ার কাছে। এই অন্যায় দখলের প্রতিকার চায় তারা। জসমত মিয়া এই প্রতিকারে সাহায্য না করলে তারা জোর করেই তুলে ফেলবে নিশানঃ জোর করেই দখল করবে গোচর। মেজাজ সবার উগ্র। উত্তেজনা বিপুল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার চরম সম্ভাবনা দেখে জসমত মিয়া তরফদারের সাথে দেখা করতে গেলেন। কিন্তু কিছু কুলোকের পরামর্শে তরফদার সাহেব এক রকম অপমান করেই তাড়িয়ে দিলেন জসমত মিয়াকে। শুরু হলো দখল উচ্ছেদের মামলা। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু জাল কাগজ তৈরী হলো তরফদারের পক্ষে। ফলে মামলা চললো সুদীর্ঘ সাত বছর। শেষ পর্যন্ত তরফদারকে সরতে হলো গোচর থেকে।

এই হলো সেই শত্রুতার ইতিহাস। লালের বাপ জসমত মিয়ার দোষ তেমন না থাকলেও শত্রুতা তো বটেই। কাজেই সমজান আলীর কথাটা অযৌক্তিক নয়। এ ছাড়া লাল মিয়ার চরিত্র সম্বন্ধে এদের অভিজ্ঞতাটাও ফেলে দেয়ার নয়। চক্ষুলজ্জার বালাইটা লাল মিয়ার খুব বেশী। তাই লাল মিয়ার জবাব দেযার আগেই সমজান ফের বললো। "পেটে ক্ষুধা চোখে শরম- এ নিয়ে কোন কাজ হয় না ওস্তাদ! মেয়ের সাথে পাত্তা লাগানোর জন্যে তোমাকে হর-হামেশাই ঘুরতে হবে সেখানে।

চক্ষুলজ্জা প্রকট হলো লাল মিয়ার। উত্তরে সে সঙ্গে সঙ্গে বললো- "ধ্যাৎ! বিনা কাজে কোথাও ঘোরা যায় শুধু শুধু? লোকে দেখলে বলবে কি?

জব্বার মিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই বললো-"ওস্তাদ, রনে আর প্রেমে লাজলজ্জা আর

www.pathagar.com

ভয়ের কোন স্থাননেই। ওসব তোমাকে ছাড়তে হবে।"

লাল মিয়া বললো- "তা তো বুঝলাম, কিন্তু এর আগেও তো কয়েকবার ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়েছি অযথা। লাভ কি হয়েছে কিছু? আসলে একটা উপলক্ষ্য না পেলে-

কথা তাকে শেষ করতে না দিয়ে সমজান বললো- "উপলক্ষ্য ঐ একটাই। মেয়ের সাথে যেভাবেই হোক যোগাযোগ তোমাকে করতেই হবে। তার মতামত স্পষ্টভাবে আনতে হবে। এতে যত অসুবিধাই হোক। দেরী করলে চলবেনা। এর মধ্যে যদি তরফদার হঠাৎ অন্য কোথাও ঠিক করে ফেলে মেয়ের বিয়ে, তা হলে বড় মুসিবত হবে।"

শুনে লাল বললো-"তাহলে কি করতে বলো?"

ময়জুদ্দীন মজু অধৈর্য্য হয়ে বললো- "বিলবাথানে তোমাকে যেতে হবে। বার বার। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের কোণে বসে থাকা চলবে না- এই হলো সাফ কথা!"

এই সাফ কথা রাখতে গিয়েই একদিন একটা মস্তবড় বেইজ্জতির হাত থেকে কোন মতে বেঁচে এলো লাল মিয়া। পর পর কয়েকদিন সে হাজির হলো বিলবাথানে। পাড়ায় পাড়ায় চরকীর মতো ঘুরেও পরীবানুর নাম গন্ধের সাক্ষাৎ সে পেলো না। পাবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। বাড়ী থেকে বড় একটা বেরোই না পরীবানু। বয়স হয়েছে তার। পাড়ায় পাড়ায় সারা দিন ঘুরে বেড়াবে মেয়ে, এটা পছন্দ নয় পিতার। পছন্দ তার নিজেরও নয় এটা। বেরোলেই কেমন যেন আজববস্তু দেখার মতো তার দিকে হা করে চেয়ে থাকে সকলেই। ফিস্ ফিস্ করে কথাও কয় কানে কানে। তরফদার বাড়ীর মেয়ে বলেই ঐ কথাগুলো তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেই যা সাহস পায়না। নইলে সে বুঝতে পারে ঐ কান কথার অর্থ। বুঝতে পেরেই ভারী হয় তার হাত পা। ধাপ উঠে না সহজভাবে। মন খুলে কথা বলারও মন থাকে না তখন। এই কারণেই পরীবানু বাড়ী থেকে বের হয় না তেমন । যায়ও না কোন পাড়াপড়শীর বাড়ীতে। গেলে শুধু মতিজানের বাড়ীতেই সে যায়। তাও আবার কালে ভদ্রে। কাজেই, খোদ তরফদারের বাড়ী ছাড়া, বিল বাথান গ্রামটা যদি চষেও বেড়ায় লাল মিয়া, তবু পরীবানুর সাথে তার সাক্ষাতের সম্ভাবনা একেবারেই শূন্যের কোঠায়। এ অভিজ্ঞতা লাল মিয়ার আগে থেকেই ছিল। এবার আরো পোক্ত হলো ঘুরে ঘুরে।

একবার ঘর একবার বাহির- এমনি করে দিন কাটছে পরীবানুরও। এক অব্যক্তব্য বেদনায় অন্তর তার ভারাক্রান্ত। সোনাপীরের গানের দিনে লাল মিয়ার ঐ একটি কথা- "তুমি বড় সুন্দর"-কেড়ে নিয়েছে আহার তার। দূর করেছে নিদ্রা। বড়ই নাজুক তার পরিস্থিতি। লাল মিয়া তবু বলতে পারে ইয়ারদের। কিন্তু সে কাউকে বলতেও পারে না, আবার সইতেও পারে না মুখ মুজে। লাল মিয়ার দর্শন আশায় সে বাড়ীর পেছনে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। ঘুরে বেড়ায় বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায়-ফুল

www.pathagar.com

বাগানের কেনারে। কত লোকই দেখে! শুধু দেখতে পায় না লাল মিয়াকে।

এমনি একটা পরিবেশে ক্ষীন একটা আশার আলো দেখা দিলো হঠাৎ। কিন্তু বয়নার মায়ের নির্মমতায় সেটা আবার তৎক্ষণাৎই নিভে গেলো আলেয়ার আলোর মতো। লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে শেষের দিন পরীবানুদের বাড়ীর নীচেই দাঁড়িয়ে রইলো লাল মিয়া। এ দিক ওদিক পায়চারী করতে লাগলো অকারণেই। শরমে তার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠছিলো। কেউ জিজ্ঞেস করলে কি বলবে-ভেবেই সারা হচ্ছিল। তবু হাঁটাহাঁটি করতে লাগলো এক জায়গাতেই। দৃষ্টি তার পরীবানুর বাড়ীর উপর। খানিকপর পরীবানুও হঠাৎই বেরিয়ে এলো বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায়। পথের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেলো লাল মিয়াকে। রোমাঞ্চিত হলো তার তনু মন। বিগলিত হৃদয়ে সে ছুটে এলো আঙ্গিনার কিনারে। নেমে এলো কয়েক ধাপ নীচে-কলাবাগানের আড়ালে। লালমিয়াও দেখতে পেয়ে নেমে এলো রাস্তা থেকে। এগিয়ে এলো কয়েকধাপ। ঠিক এমনই সময় প্রলয়। হাঁ- হাঁ করে এগিয়ে এলো বয়নার মা। শুরু করলো নিনাদ। রাস্তাটা এতক্ষণ নির্জনই ছিল। নির্জন ছিল বলেই লাল মিয়ার পক্ষেও ঐভাবে অপেক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছিল। শুধু বয়নার মা-ই দূরের এক পগাড় থেকে রাস্তার দিকে আসছিল। কাঁনা-কুঁজো বুড়ি মানুষ! এত খেয়াল সে করবে না- এই ছিল লাল মিয়ার ধারণা। ধারণা তার নস্মাৎ হলো মূহূর্তে। অল্প একটু এগিয়েই সে তার স্বরে হাঁকতে লাগলো "কেডা গা? আস্তা (রাস্তা) ছেড়ে পগারের দিকে কেডা যায়? সোনাকুলের লাল মিয়া লয়? উদিগে আবার কুন্টি যাও? ওম্মা! কলার ঝাড়ে উডা আবার কেডা? মিয়া ছাওয়াল লয়? কুন্‌বাড়ীর মিয়া? চোখে দেখিও না ভাল!"

অনর্গল বকে চললো বয়নার মা। তার চীৎকার শুনে এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো পাড়ার লোক। পরীবানুদের বাড়ীতেও সোচ্চার হলো গণকণ্ঠ। লজ্জা পেয়ে পরীবানু ছিটকে গেল অন্দরে। লাল মিয়া দ্রুত পদে উঠে এলো রাস্তায়। মাথাগুজে সরাসরি রওনা দিলো বাড়ীর দিকে। এ অবস্থায় তরফদার সাহেবের চোখে পড়লে নস্মাৎ হতো সকল আশা। এর পর আর অনেক দিন সে পা বাড়ায়নি এ পথে!

[নয়]

চলন বিলের প্রকৃতি বৈচিত্রময়। গ্রামগঞ্জের চারপাশে বর্ষাকালে ঢেউ খেলে সীমাহীন জলরাশি, মাঘ ফালগুণে মাঠে মাঠে ঢেউ খেলে রাশি রাশি রাই আর থোকা থোকা সর্ষেফুল। এর সাথে পাল্লা দেয় চাপ চাপ খেশারী। খেশারী আর রাই-সরষের সমারোহে ঘেরা থাকে গ্রামগঞ্জ। খেশারীর ক্ষেতগুলো এক গাঁকে যুক্ত করে আর এক গাঁয়ের সাথে। গাঁয়ের পর গাঁ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। সবুজ সবুজ, কচি কচি, লক লকে ডগা। একই ক্ষেতে ইতি উতি লম্বা লম্বা রাই গাছ। মাথায় তার হলুদ হলুদ ফুল। হেথা হোথা পৃথক পৃথক সরষের ফুলের মেলা। সবুজের আঙ্গিনায় হলুদের

www.pathagar.com

আলপনা। দেবীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে গ্রামগুলো। পায়ের নীচে বেছানো এই ফুল-সবুজের অর্ঘ্য। এই ফুল সবুজের বুক চিরে গ্রামান্তরের রাস্তা। সরু সরু মেঠো পথ। চওড়া চওড়া ডহর।

পিপীলিকার সারির মতো এই পথ বেয়ে ডহর বেয়ে ধেয়ে যাচ্ছে কাসিদ। মহর রমের কাসিদ। অসংখ। অনন্ত। বিবির কাসিদ। মাদারের কাসিদ। কাটা কাপড়পরণে। কারো কাছাহীন ধূতি। সবগুলোই হলুদ মাখা। বিবির কাসিদ লাল। গায়ে তাদের লাল জামা। গলায় বাঁধা লাল রুমাল। লাল রুমাল মাথায়। মাদারের কাসিদ শান্তির প্রতিক। তাদের জামা রুমাল সাদা। শুধু পুরুষই নাই এই দলে। মেয়েও আছে কিছু কিছু। কেউ এদের সখের কাসিদ। কেউ কাসিদ দায়ে পড়ে। মানত পালন করার জন্যেই কাসিদ হয়েছে অধিকাংশ। আধি ব্যাধি কার না আছে? ডাক্তার ডাকে ক'জন ? এদের বড় চিকিৎসা মানত। রোগমুক্তির মানসে এরা মানত করে পীরানী বা মাদার পীরের দরগায়। মানত পালন করে এরা মাদারের বা বিবির কাসিদ হয়ে। কুসংস্কারটি অপরূপ। তার চেয়েও অপরূপ এই ফুল বিছানো পথে রং বেরং এর মেয়ে পুরুষের মিছিল। কারো হাতে চামড়, কারো হাতে যাত্রা দলের তলোয়ার। বাঁটভাঙ্গা মরচেপড়া সত্যি সত্যি তলোয়ারও হাতে নিয়েছে দু'একজন। কোন কিছুই পায়নি যে, সে নিয়েছে নাড়ি খড়ি, কঞ্চি কিংবা রং মাখানো বাঁশের অসি। তারা সারি বেঁধে দরগায় দরগায় বাও (বাতাস) দিয়ে বেড়াচ্ছে। মানত পালনকারী গৃহস্তদের দাওয়াত কবুল করছে। এক এক সারি এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাচ্ছে। মুখে তাদের কারবালার মর্মভেদী মাতমঃ "হায় হুসেন, হায়হুসেন!"

একই রাস্তায় দুই সারি মুখোমুখী হলেই শুরু হচ্ছে ছওয়াল-জবাব। প্রত্যেক সারির পূবোভাগে সর্দ্দার আছে একজন। ছওয়াল জবাব শুরু হচ্ছে দুই সর্দ্দারের মাঝে। পাল্টাপাল্টি বাহাচ। তত্বকথার বাহাচ। অনেকটা ঠিক করিয়ালের লড়াই। সত্যিকারের লড়াইও শুরু হয় মাঝে মধ্যে। পরাজিত সর্দ্দার বশ্যতা স্বীকার করে যোগ দিচ্ছে বিজয়ীর দলে। অধিকতর লম্বা হচ্ছে বিজয়ীর সারি।

মহররমে মত্ত হয় শিয়ারা। এতে সক্রীয় অংশ নেয় শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু তৎকালে এই ভেদাভেদ চলন বিলে ছিল না। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে মহররমে মেতে উঠতো চলন বিলের আবালবৃদ্ধ বনিতা। কাসিদ হতো কেউ। কেউ তুলতো তাজিয়া। কেউ গাইতো মর্সিয়া। কেউ খেলতো লাঠি। নিতান্তই যারা এসব করতো না বা পারতো না, তারা মেলা বসাতো কেউ। কেউ করতো মহররমের শিরনী। কেউ বা শুধু মেলা দেখেই আর শিরণী খেয়েই শেষ করতো করণীয়।

কাসিদের সারি চলেছে পরীবানুদের ফুল বাগানের তল দিয়ে। তাদের বটগাছকে বাতাস দিতে যাচ্ছে এরা। বুড়াপীরের দরগা ওটা। আর একদল বাতাস দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য গাঁয়ে। রাই সরিষার ক্ষেত বেঁকে পথ ধরেছে ওরা।

দূর থেকে শব্দ আসছে আর একদলের। এদের শব্দের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছে আওয়াজ- 'হায় হুসেন- হায় হুসেন!' খলসেগাড়ীর দিকেই বোধ হয়

www.pathagar.com

শব্দটা। কিংবা হয়তো নতুন বস্তী বা মহিষখালীর কোথাও। হেথা হোথা দাঁড়িয়ে আছে দর্শকেরা। তরফ দারের বাড়ীতেও আনা গোনা করছে মানুষ। বাহির আঙ্গিনার এক কোণে জলচৌকি পাতা। ওটায় বসে কাসিদ দেখছে পরীবানু। চেয়ে চেয়ে দেখছে আর ভাবছে হয়তো এমনই একটা দল নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল মিয়া। মহররমের মাতমে মেতে উঠেছে দেশ। নিশ্চয়ই সে চুপ করে বসে নেই ঘরের কোণে। সর্দার-পানা মানুষ। কোন না কোন দলের নিশ্চয়ই সে দলপতি। দল নিয়ে আসবেই সে এখানে। আর না হোক, দেখা যাবে এক ঝলক। চোখা চোখী হওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। অনেক কিছুই পাওয়া যাবে ঐ এক পলকের চাহনীতে। এসব কথা মনে আসতেই মুখে তার ছুটে এলো এক পশলা রক্ত। লাল হলো কপোল। সে সংকুচিত হয়ে উঠলো নিজের কাছে নিজেই। বসে রইলো নতমুখে।

বুড়াপীরের দরগাতে বাও দিয়ে এ দলটি চলে গেল অন্যপথে। হারিয়ে গেল গাঁয়ের ভেতর। সরষে বাঁকা পথে নেমে ও দলটি এঁকে বেঁকে ঘুরতে লাগলো একই জায়গায়। নগন্য তার অগ্রগতি।

অকস্মাৎ তীব্র হলো আওয়াজ। চমকে উঠে মুখ তুললো পরীবানু। মাঠের দিকে দৃষ্টি দিতেই স্থির হলো তার দৃষ্টি। রাই-সরষের ক্ষেত বেঁকে চলে যাচ্ছে যারা, তাদের সামনে একই পথে এগিয়ে আসছে আর এক দল। একদম মুখো মুখী। দীর্ঘকায় দুই সারি। এদের সারির শেষ সীমানা দৃষ্টির অতি নিকটে। ওদেরটা সরু হয়ে হারিয়ে গেছে দূরে-রাই ঝাড়ের আড়ালে। ফসল ভেঙ্গে দ্বিতীয়পথ তৈরী করা ছাড়া, কাছে কোলে পথ নেই আর দ্বিতীয়। বিধানও তা নয়। এ হীনতা মেনে নিতে রাজীও নয় কেউ। তাই মুখোমুখী হয়ে যাচ্ছে দুই দলের দুই সর্দার। দুই ট্রেণের দুই এঞ্জিনের মতো। পরস্পরের শক্তি জাহির করার জন্যে হুংকার দিয়ে বোল (ধূয়া) ধরছে দুই দলই। শব্দ হচ্ছে বিকট। রণ এবার অবশ্যম্ভাবী। দেখার জন্যে দর্শকেরা ছিটকে আসছে ডহরে। এর অধিক এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই একজনেরও। সমিচীনও নয়। পরিস্থিতি বিগড়ে গেলে প্রাণ যাবে বেঘোরে!

একেবারেই মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেছে দুই নেতা। বিদায়ী দলের দল নেতা বালুভরার কহিরুদ্দীন। অনেক দূরে বাড়ী এদের। সংখ্যাতেও অনেক। আগত দলের দলপতিকে চেনা যাচ্ছে না সঠিক। শুধু দেখা যাচ্ছে আবছা আবছা। কে ঐ লোক, এনিয়ে শুরু হয়েছে গবেষণা। আলাপ করছে দর্শকেরা। পরীবানুদের বাড়ীর নীচেই কে একজন বলে উঠলো- "ওটা লাল মিয়া। সোনা কোলের লাল মিয়ার মতোই লাগছে।" দ্ব্যর্থবোধক সমর্থন দিয়ে অপর একজন বললো- "হ্যাঁ তো ! মনে হচ্ছে ঐ রকমই!"

একথা কানে যেতেই আঁতকে উঠলো পরীবানু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে নিরিখ করলো অনেকক্ষণ। নিঃসন্দেহ না হলেও, তাকে লাল মিয়া বলেই মনে হলো তারও। অনেকটা সেই রকমই দেখতে। কেঁপে উঠলো পরীবানুর অন্তরাত্মা। না জানি কি ঘটে! এসব ক্ষেত্রে অঘটনের নজীর আছে অনেক। খুন-খারাবীর প্রশ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক নয়। আবার তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো সেই দূর্গা পূজা। নতুন বস্তীর

www.pathagar.com

গানের দিনের সেই অবিস্মরনীয় ঘটনা! সেই কাটা-ছেঁড়া কপাল! সেই টিপ্ টিপ্ রক্ত! কপালে তার কি আছে আজ কে জানে! ছওযাল জবাবের মধ্যে দিয়েই শেষ হয়ে যাক লড়াই, সে এই কামনাই করতে লাগলো কায় মনোপ্রাণে!

ছওয়াল-জবাব শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। হাত নেড়ে কথা বলছে উভয় দলের দলপতি। হাত নাড়া দেখতে পাচ্ছে সকলেই। কথাগুলো কানে পড়ছেনা কারো। উভয় সারির কাসিদেরা দাঁড়িয়ে আছে অনড় হয়ে। এ কথাও বলা যায়- তারা এক পায়ে খাড়া আছে প্রস্তুত হয়ে।

পরিস্থিতি ভালই ছিল অনেকক্ষণ। প্রায়ক্ষেত্রেই এই রকমই থাকে। ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটে না। কিন্তু এবার সেই ব্যতিক্রমটাই দেখা দিলো হঠাৎ। হাতনেড়ে কথা বলার এক পর্যায়ে হঠাৎই শুরু হলো হাতাহাতি। ব্যস! অতঃপর লাঠালাঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে মহারণ!

উভয়দলের কাসিদেরা মার মার কাট কাট রবে ঝাঁপিয়ে পড়লো পরস্পরের উপর। শুরু হলো জঙ্গ। প্রকট হলো হুংকার ও আর্তনাদ। মুখর হলো দশদিক। চারিদিকে দণ্ডায়মান অগণিত দর্শককুল রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলো এই প্রলয়ংকরী দৃশ্য। প্রায় বিঘে দশেক রাই-সরিষা আর খেশারীর ক্ষেতজুড়ে সমানে চলতে লাগলো দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি, আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ। চার-পাঁচশো বীর সেনানীর সবিক্রম পদার্ঘাতে দলিত মথিত হয়ে মাটির সাথে মিশে যেতে লাগলো ফলবান রাইসরিষা আর খেশারী।

প্রায় মিনিট বিশেক একইভাবে লড়াই করার পর শেষ পর্যন্ত হার মানলো আগত দলের দলপতি। সে নত হলো বিদায়ী দলের দল নেতা কহিরুদ্দীনের কাছে। বন্ধ হলো রণ। কিলাকিলির পরিবর্তে শুরু হলো কোলাকুলি। ফুলা-ফাটা নাকে মুখে উভয় দলের কাসিদেরা এক হলো এক পলকে। খোশদীলে সকলেই এক সারিতে দাঁড়ালো কহিরুদ্দীনের পেছনে। কে বলবে একটু আগেই পরস্পরের মাথা ভাঙ্গতে লিপ্ত ছিল এরা। "হায় হুসেন- হায় হুসেন" করতে করতে ভিন্ন গ্রামে চলে গেল কাসিদেরা। "হায় রাই- হায় সরিষা" করতে করতে ভুইয়ের দিকে ছুটে এলো হত ভাগ্য ভূঁইয়ের মালিক।

সকলের অলক্ষ্যে নীরব হা-হু-তাশে ভেঙ্গে পড়লো আর একজন। সে পরীবানু। এই জীবন মরণ সংগ্রামে লাল মিয়াই পতিত হলো ভেবে তার হৃদপিন্ড কেঁপে উঠলো ভয়ে। শুকিয়ে গেল বুক। ঝাপ্সা হলো দৃষ্টি। মর্মব্যথা সশব্দে প্রকাশ করতে না পারায় দম তাঁর বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে। লড়াই শেষ হলেও তার শেষ হলো না মনোকষ্ট। এবার তার ভাবনা হলো- না জানি কত আঘাত পেয়েই তাকে মানতে হলো পরাজয়। পরাজয়ের গ্লানী নিয়েই তাকে ফিরতে হলো মাঝপথে। বিলবাথানে পৌছানোর সুযোগটাও সে পেলো না।

তার সব চিন্তা লাঘব হলো হুকুম উদ্দীনের এক কথায়। হুকুম উদ্দীন হন হন করে তরফদারের বাড়ীর দিকেই আসছিলো। বাহির বাড়ীতে উঠতে উঠতে কে

www.pathagar.com

একজনকে শুনিয়ে সে বললো-" আরে দূর! লাল মিয়াকে দেখলো ওরা কোথায়? ওটা তো বিন্যাতলীর তয়েজ। লাল মিয়া হলে এত সহজে ভাঙ্গে লড়াই?"

পরীবানুর সামনে দিয়েই আপনভাবে মগ্ন হয়ে চলে যাচ্ছিল হুকুম উদ্দীন। লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে ডাক দিলো পরীবানু। ডাক শুনে হুকুম উদ্দীন কাছে আসতেই পরীবানু জিজ্ঞেস করলো- "ঐ যে হেরে গেল, ঐ সর্দারটা কে? কার কথা বললে?"

সত্যটা যে সে জানে এবং সে-ই তা বলতে পারছে, এই আনন্দেই তখন হুকুম উদ্দীন বুঁদ। সে সোচ্চার কণ্ঠে বললো-" তয়েজ -তয়েজ, বিন্যা-তলীর তয়েজ। আমার একদম সামনে দিয়েই তো এলো ওরা এই দিকে। আমি ওদের পিছে পিছেই এলাম। আমি জানিনা কে ওটা? এরা আজগুবী রব তুলেছে- ওটা ঐ লাল মিয়া। যত্তসব গাঁজা-খোরের দল। লাল মিয়াকে কাসিদ হতে দেখেছে কেউ কোনদিন? মহররমে ওরাতো শুধু লাঠি খেলে আর মর্শিয়া গায়। কাসিদের দলে ও আসবে কোত্থেকে?"

হুকুমউদ্দীনের এ বিবরণ ষোল আনাই সত্যি। লাল মিয়ারা কাসিদ হয়নি কোন দিন। মহররমের মৌসুমে তারা দল বেঁধে মর্শিয়া গায় পাড়ায় পাড়ায়। লাঠি খেলে গাঁয়ে গাঁয়ে। এ বিদ্যায় হাত তাদের পাকানো। লাঠি খেলায় সমজান আবার লাল মিয়ারও বাড়া।

কোন প্রতিযোগতিার খেলা হলেই লাল মিয়াদের পাওয়া যাবে সেখানে। আর লাল মিয়াদের খেলা থাকলেই নাই বাজারে বাজার বসে দর্শকদের ভিড়ে। প্রতিযোগিতার আয়োজন এবার খুবই কম। তাই মর্শিয়া গেয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল মিয়ারা। মর্শিয়া গানের দলও আবার এই একটাই শুধু নয়। চলন বিলে এর সংখ্যা অনেক। এ সময়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠে মর্শিয়া গানের দল। অহোরাত্র শুনা যায় মর্শিয়া গানের হাঁক। গাঁয়ে, গঞ্জে, বস্তিতে। পথে প্রান্তে কাসিদের বিলাপ আর লোকালয়ে মশিয়ার মুর্চ্ছনায় চলন বিল তুঙ্গে উঠে মহররমের সময়। এর সাথে আছে আবার লাঠি খেলার কাড়া নাকাড়া। ধিন্‌তা-নাতান ধিন্‌তা-নাতান রবে মহররমের পরশ পৌঁছে চলনবিলের অথৈ পানির অন্তরেও।

হুকুমউদ্দনের কথা শুনে হাঁফ ছাড়লো পরীবানু। আরো অধিক নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সে পুনরায় প্রশ্ন করলো-"তুমি সত্যি সত্যি নিজের চোখে দেখেছো?"

প্রশ্ন করার পর পরই পরীবানু বুঝতে পারলো, এর চেয়ে নিজের গালে চড় মারাও অধিক সুখের ছিল তার। পরীবানুর প্রশ্নশুনে আরো দশগুনে ফুলে উঠলো হুকুম উদ্দীন। দশদিক চমকিয়ে দিয়ে সে চীৎকার করে বলতে লাগলো- "আরে নিজে-নিজে! এই হুকুমউদ্দীন ফালতু কথা বলে না। আমার সাথে ঐ মইরদ্দিও ছিল। বিশ্বাস না হয়, আমি ডাক দিচ্ছি তাকে, তার মুখেই শুনো।" বলেই সে হাঁক দিলো- "মইরদ্দি ভাই, ও মইরদ্দি ভাই-।"

চমকে উঠলো পরীবানু। উপায়ান্তর না দেখে সে দৌড় দিয়ে পালিয়ে এই লজ্জাকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচলো।

পরীবানুর বিয়ে নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জরণ বিরাজ করছে বিলবাথান গাঁয়ে। ভাতুরিয়া থেকে নায়েব মিয়াজান আলী মিয়া ফিরে আসার পর পরই এই গুঞ্জরণের

www.pathagar.com

গোড়াপত্তন হয়েছে। বীজ বুনেছেন নায়েব সাহেব নিজেই। বয়নার মায়ের সার-পানিতে সেই গুঞ্জরণের গাছ আরো পল্লবিত হয়েছে। পরীবানুর চরিত্রগত দোষের কথা জানতে পেরেছে বর আর সেই কারণেই সে রাজী হয়নি বিয়েতেঃ এইটেই এই গুঞ্জরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরীবানুকে গাঁয়ের লোকে জানে। জানে মিয়াজান আলী মিয়াকেও। বয়নার মাকে জানার তো কোন প্রশ্নইকারো উঠেনা। পরীবানুর বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে দিচ্ছে না বাপঃ গাঁয়ের লোকের যে টুক বলার, তা এটুকুই। পরীবানুর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তিল পরিমান ত্রুটির কথা কেউ কোন দিন বলেনি। বলার মতো কিছুমাত্র হেতুও কেউ পায়নি। বড় ঘরের বয়সী মেয়ে হলেও পরীবানুর স্বভাব চরিত্রের প্রশংসায় সব মানুষই পঞ্চমুখ। কাজেই, নায়েব আর বয়নার মায়ের মাধ্যমে পরীবানুর চরিত্র নিয়ে হঠাৎ এই গুঞ্জরণ শুরু হওয়ায় সন্দেহের ছোঁয়া লেগেছে অনেকেরই মনে। মিয়াজান মিয়া। নিজেই ভেঙ্গে দিয়েছে বিয়ে-এবং উদ্দেশ্য প্রবণ হয়েই সে রটাচ্ছে এই বদনাম- এই ধারণাই অনেকের। এ নিয়েও পাল্টা একটা গুঞ্জরণ তীব্র হচ্ছে ক্রমেই। বড়ঘরের ব্যাপার বলে এসব নিয়ে ঢোল পিটে না কেউ। কিন্তু ছাই চাপা আগুনের মতো এ নিয়ে অন্তরালে ফিস্‌ফাসও কম হয় না বড় একটা।

এর কিঞ্চিৎ আভাস কোন না কোন সূত্রে তরফদার সাহেব পেয়েছেন। এমনিতেই চাপা মানুষ তিনি। তদুপরি মেয়ের সম্বন্ধে কথা বলে তিনি এসব কথা চেপে গেছেন আভাস পাওয়ার পরই। এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু এতে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য চিন্তা। সেটা হলো-পরী বানুকে অতি সত্বর বিয়ে দেয়া। অধিক দেরী হলে হয়তো তিলটাই তাল হয়ে দাঁড়াবে আর তাতে বিয়ে দেয়াটা কঠিন হবে সত্যি সত্যিই।

তরফদার সাহেব ব্যক্তিটি বিজ্ঞ বটেন, তবে সরল মানুষ। ধুরন্ধর নন। তাই মিয়াজান মিয়ার চরিত্র আর পাঁচজনের কাছে দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তাঁর কাছে উঠেনি। মিয়াজান মিয়ার কুটিলতা এক বিন্দুও ধরতে তিনি পারেননি। একজন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী হিসাবেই তিনি তাকে দেখে আসছেন বরাবর। সেই মিয়াজান মিয়াই ভেঙ্গে দিয়েছে বিয়ে-এটা শুনে হক চকিয়ে গেছেন তিনি। মনের সাথে কথাটাকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। একটা অদৃশ্য কাঁটার মতো তাঁর মর্মস্থলে খুচ খুচ করে অবিরাম ফুটছে। কথাটা মিথ্যে হলে যারপর নেই খুশী হতেন তিনি।

আজ মহররম মাসের নয় তারিখ। আগামীকাল দশ তারিখ। মহররম উদযাপনের শেষ দিন। প্রতি বছরই এই শেষ দিনে শিরণী করেন তরফদার সাহেব। ব্যাপক এই আয়োজন। বিস্তর লোককে এই শিরনীতে দাওয়াত করেন তিনি। এর সাথে বাজার বসে বুড়াপীরের বটতলায়। মহররমের বাজার। তরফদার সাহেবই লাগান এই বাজার। বাজারের বড় আকর্ষণ প্রতিযোগিতার লাঠি খেলা। অনেক নাম করা খেলোয়াড়রা খেলতে আসে এখানে। কেউ আসে দাওয়াত পেয়ে। কেউ আসে রেওয়াজ মাফিক।

www.pathagar.com

আয়োজনাদি সমাধাকরার পর বিকেল বেলা নায়েব এলেন দেখা করতে। তরফদার সাহেব বৈঠক খানাতেই ছিলেন। ফুরশীতে মুখ লাগিয়ে বসে ছিলেন তিনি। ফুরশী রেখে আয়োজনের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে তিনি আলাপ করলেন কিছুক্ষণ। প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি আবার মুখ লাগালেন ফুরশীতে। নায়েব সাহেব উঠি উঠি করতেই তিনি হাত ইশারায় বসতে বললেন নায়েবকে। আনমনে কিছুক্ষণ ধুমপানের পর নলটা মুখ থেকে নামিয়ে রাখলেন একপাশে। অল্প একটু নড়ে চড়ে বসে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- "কি ব্যাপার নায়েব? ভাতুরিয়া গেলে সেই কবে, এতদিনও ওদিক থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না! খবর টবর নিয়েছো আর কিছু?"

হঠাৎ এই নাজুক প্রশ্ন উঠে পড়ায় মনে মনে প্রমাদ গুনলেন নায়েব সাহেব। তিনি খানিক আঁই-গুঁই করে মাথা চুলকিয়ে বললেন-"খবর আর কি নেবো হুজুর! ওখান থেকে এসেই তো জানালাম, ওদের মতিগতি সুবিধের নয়। আমি এত করে বললাম, তবু কোন উৎসাহই ওপক্ষের পেলাম না।"

তরফদার সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন-"কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে, ওদের মতামত ওরা সত্বর জানিয়ে দেবে! কোন চিন্তে করার দরকার নেই?"

- বলেছিলাম তো ঠিকই হুজুর। কিন্তু যে ভাবে জানানোর কথা, ওরা তো আর সেভাবে জানালো না। জানালো অন্যভাবে।

- অন্যভাবে মানে?

- মানে, অরুচির খানা যেমন হয়। নিজেরা কেউ না এসে ওরা লোক মারফত খবর দিয়েছে-এখানে তারা ছেলের বিয়ে দেবে না।

- কৈ, সে কথা তো বলোনি আমাকে কোন দিন?

- এসব কি আর বলার কথা হুজুর। ধীরে ধীরে অমনি-অম্‌নি জানতে পারবেন- এই ভেবেই বলিনি।

- মানে?

- মানে, সত্যি কথা বলতে কি হুজুর, ঐদিনই ওরা এক রকম জবাবটা দিয়েই দিয়েছিল। ভয়ে আপনাকে বলতে পারিনি।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন তরফদার সাহেব। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হলো কিঞ্চিত। পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন-"কিন্তু আমি যে শুনছি, বিয়েটা তুমিই নাকি ভাঙ্গিয়ে দিয়ে এসেছো? বলেছো- চরিত্রে দোষ আছে পরীবানুর?"

ধড়াশ্ করে কেঁপে উঠলো নায়েব সাহেবের বুক! এই চরম সত্য খবরটা যে জানতে পারবেন তরফদার সাহেব, আর সে প্রশ্ন তিনি নিজেই করবেন সরাসরি- এটা তাঁর কল্পনাতেও আসেনি। তাই তিনি চমকে উঠে বললেন- "তওবা-তওবা! আপনি এটা বিশ্বাস করেন হুজুর! এমন একটা কথা"

- মানে?

- এটা একটা নিছকই রটনা হুজুর!

- রটনা !

www.pathagar.com

- নির্ঘাত কোন শত্রুর রটনা ছাড়া আর কি হতে পারে হুজুর? এ দুনিয়ায় কারো ভাল কি দেখতে পারে কেউ? আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেন, বিশ্বাস করেন, ভাল বাসেন। এতটা সইবে কেন শত্রুদের। এছাড়া, আমি কড়া নজর রেখেছি বলে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে আপনার জমিদারীটা বানচাল করার সুযোগ পাচ্ছেনা অনেকে। তাই তারা এখন এই পথ বেছে নিয়েছে। আমাকে আপনার অবিশ্বাসী করে সরিয়ে দিতে পারলেই তাদের আশা ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

- তা- মানে-

- আপনারই অনুগ্রহে অন্নজোটে আমার, আর সেই আমি আপনারই এত বড় অনিষ্ট করবো! এতবড় পাষন্ড আমি? ছি-ছি-ছি! এ কথা ভাবতেও যে লজ্জায় আমার মাথাকাটা যাচ্ছে!

নায়েবের এ অভিনয়ে ভুলে গেলেন তরফদার। বললেন- "হ্যাঁ, এটা অবশ্যি রটনাও হতে পারে। তবে ফিরে এসেই সব কথা যদি খুলে বলতে তুমি, তা হলে আর আমাকে এই মিথ্যা আশার পেছনে বসে থাকতে হতো না। ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও যোগাযোগ করতে পারতাম। মেয়েটার বিয়ে নিয়ে আর তো বেশী দেরী করা চলে না।"

ওষুধটা ধরেছে দেখে মনে মনে খুশী হলেন নায়েব। তরফদারকেও খুশী করার জন্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে বললেন-"কথা হুজুর আপনার একে বারেই খাঁটি। বয়স তো ভালই হলো মেয়ের। বিয়ে যখন দিতেই হবে, অন্যথা যখন সম্ভব নয়, তখন আর দেরী করা সত্যি সত্যিই ঠিক হবে না। দেশে তো আর দুষ্ট লোকের অভাব নেই। কে কখন কোন বদনাম রটায়, তার ঠিক ঠিকানা কি!"

তরফদার সাহেব বললেন- "সেই জন্যেই তো বলছি- এ যাবত শুধু শুধুই নষ্ট হলো সময়টা। চেষ্টা তদবির করলে সুরাহা একটা হয়েই যেতো এত দিন।"

নায়েব সাহেব মিনমিনিয়ে বললেন- "তা হুজুর যা হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে। ও নিয়ে আর না ভেবে এখন আবার নতুন করে একটু-"

সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন দিয়ে তরফদার সাহেব বললেন-"হ্যাঁ, তাই করো। নতুন ভাবেই আবার একটু দেখো। মেয়েতো আমার রূপেগুণে কম যায় না কিছু! একটু চেষ্টা করলেই ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে ইন্‌শাআলাহ্। ভাতুরিয়ার বর ছাড়া কি আর বর নেই দেশে?"

- হুজুর!

- কত ভাল ভাল ঘর থেকে কত বিয়ে এলো, সাধা সাধিও কতজনে করলো। শুধু আমি নীরব থাকাতেই তারা আর এগোয়নি। একটু আভাস দিলেই তারা আবার সাগ্রহে এগিয়ে আসবে- এ বিশ্বাস আমার আছে।

- তা ঠিক -তা ঠিক ! তবে-

কথা শেষ না করে থেমে গেলেন নায়েব। মাথা নীচু করে তিনি অবিরাম হাত কচলাতে লাগলেন। তা দেখে তরফদার সাহেব বললেন-" কিছু বলতে চাও?"

www.pathagar.com

- মানে, বলছিলাম কি হুজুর! মতিজানের বাপটা কিন্তু ভালই করেছে কাজটা। মা-মরা মেয়েকে পরের বাড়ীতে না দিয়ে বাড়ীতেই রেখেছে। আপনিও যদি এমন একটা ব্যবস্থা নিতেন হুজুর, মানে মেয়েটাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে বাড়ীতেই যদি রাখতেন-

কথার মাঝেই অলক্ষ্যে তরফদার সাহেবের মুখখানা এক পলক দেখে নিলেন নায়েব। দেখলেন, মুখে তাঁর বিষাদের ছাপ স্পষ্ট। আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে লক্ষ্য করেই তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন- আমার দৃঢ় বিশ্বাস হুজুর, তাহলে মতিজানের চেয়েও আমাদের পরীবানু হাজারগুণে বেশী সুখী হতো।

একটু দম ধরে বসে রইলেন তরফদার। কিছুক্ষণ যাবত কোন কথাই বললেন না। পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললেন- "সে ইচ্ছে তো আমারও হয় নায়েব! আর তুমি তো তাজানোই। কিন্তু তেমন ছেলে তো এযাবত পেলাম না। তুমিও তো খোঁজ করতে চেয়েছিলে? তেমন কেউ আছে তোমার খোঁজে?

হাতে আকাশ পেলেন নায়েব। এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাই তিনি করছিলেন। সুযোগ যে বার বার আসে না, তা তিনি অনেকের চেয়েই অনেক বেশী জানেন।

তাই তিনি সঙ্গেই সঙ্গেই বললেন- "আছে তো ঠিকই হুজুর! যদি অভয় দেন, তাহলেই বলতে পারি।"

তরফদার সাহেব আগ্রহ ভরে বললেন, "আহহা! এতে আবার ভয় অভয়ের কি আছে? বলেই ফেলো না, কে সেই ছেলে !"

মাথা চুলকিয়ে হেলে দুলে নায়েব সাহেব বললেন

- "মানে আমার ঐ হুকুম উদ্দীনের কথাটাই বলছিলাম হুজুর।"

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না তরফদার। বললেন- "হুকমউদ্দীন! হুকুমউদ্দীন কি?"

নায়েব সাহেব বিনয়ের সাথে বললেন, আমার হুকুমউদ্দীন তো দেখতে গেলে আপনার হাতেই মানুষ। ওকেই যদি আপনি আপনার মেয়ের জন্যে রাখতেন হুজুর!"

এবার ভূত দেখারও অধিক চমকে উঠলেন তরফদার সাহেব। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে তাঁর সারা অঙ্গ জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। এমন একটা আবাস্তব ও অবান্তর প্রস্তাব মিয়াজান মিয়ার মুখ থেকে আসতে পারে এটা তাঁর কল্পনারও অতীত। অন্য কেউ হলে হয়তো এমন প্রস্তাবের সাথে সাথেই বরখাস্ত করতেন নায়েবকে। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেন ত্রিসীমানার বাইরে। কিন্তু তরফদার সাহেবের ধাতটা একেবারেই উল্টো বলেই এমন কিছু ঘটলোনা। মনের ক্রোধ মনে চেপে তরফদার সাহেব ক্ষুন্ন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন- "তোমার হুকুম উদ্দীন! এটা বলতে পারলে তুমি?"

নায়েব সাহেব না বোঝার ভাণ করে বললেন- "হুজুর!"

- ওতো একটা নিতান্তই না লায়েক। একেবারেই নাদান আর অপদার্থ বলতে যা বুঝায়, তোমার হুকুম উদ্দীন তাই। অপর পক্ষে আমার পরীবানুর রূপগুণের কথা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষাই রাখে না। এমন একটা অসম্ভব আর উদ্ভট ধারণা তুমি

www.pathagar.com

মনের মধ্যে স্থান দিলে কি করে?

- না, মানে-

- অথচ ঐ সোনাকোলের লালমিয়া তোমার হুকুম উদ্দীনের চেয়ে হাজারগুণে, না শুধু হাজারগুণে কেন, লক্ষগুণে ভাল ছেলে। যেমন চেহারা, তেমনি গুণী। তার কথা কতজনে বলছে তবু আমি সরাসরি রাজী হতে পারছিনে। আর তুমি তোমার ঐ আস্ত একটা -

কথা শেষ না করে দাঁতের উপর দাঁত পিষে থেমে গেলেন তরফদার।

কোন কিছু নিজের ভোগে না লাগলে অন্যের ভোগে লাগুক-এটা যারা বরদাস্ত করতে পারে না, মিয়াজান আলী মিয়া তাদের দলের লোক। লাল মিয়ার প্রতি তরফ দারের এই অনুরাগের আভাস পেয়েই তিনি বলে উঠলেন

- "কার কথা বললেন হুজুর? লাল মিয়ার ?"

তরফদার সাহেব ও জোর দিয়েই বললেন- "হ্যাঁ, লাল মিয়ার রূপে-গুণে-বংশে-বিত্তে সে কি কোন দিক দিয়ে কারো কাছে খাটো? যতগুলো বিয়ে এলো, তার মধ্যে কি একটা ছেলে পাওয়া গেছে এই রকম? বাপের বিষয়টুকু ছাড়া কি কোন বরের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে কিছু ওর মতো? শুধু দোষের মধ্যে দোষ, ছেলেটার সংসারে মন নেই।"

তরফদার সাহেবের এতখানি প্রত্যয়ের সামনেও চক্ষুলজ্জার বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে নায়েব সাহেব বললেন- "শুধু ঐটুকুই নয় হুজুর। আরো অনেক দোষ আছে ওর। ওর মতো বাজে ছেলে এতল্লাটে আর দ্বিতীয়টি নেই।"

তরফদার সাহেবও তেমনি ইটের বদলে পাটকেল ছুড়ে মারলেন। বললেন-" তবু তোমার হুকুম উদ্দীনের মতো অপদার্থ নয়।"

নায়েব এবার একেবারেই চুপ মেরে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পরিস্থিতি আজ একেবারেই প্রতিকুল। তার মতামতের বিরুদ্ধে এমন শক্তভাবে প্রতিবাদ করতে তরফদারকে আর কোন দিন দেখেন নি। এ অবস্থায় আরো অধিক এগুলে হিতের বদলে অহিতই হবে বেশী। অন্য কোন দুর্ব্বল এক মুহূর্তে প্রস্তাবটি পুনরায় উপস্থাপন করার আশায় আর তিনি কোন কথাই বললেন না। মাটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে বসে রইলেন চুপ করে। কথা বলার ইচ্ছে আর তরফদার সাহেবেরও ছিল না। নীরব হয়ে বসে রইলেন তিনিও। ঘরের মধ্যে গুমোট একটা পরিস্থিতি বিরাজ করতে লাগলো। কিছুটা অস্বস্তিতে ভূগতে লাগলেন উভয়েই।

উভয়কেই রক্ষে করলো পরীবানু। সে অন্দর থেকে ছুটতে ছুটতে বাহির বাড়ীতে এলো। তরফদার সাহেব একাই আছেন ভেবে বৈঠক খানার ঘরের কাছে পৌঁছেই আব্দার মাখা কণ্ঠে সে ডাকতে লাগলো- "বাপজান -বাপজান- একটা কথা শুনো-"

তার ডাক শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন উভয়েই। মৌনতা ভঙ্গ করে তরফদার সাহেব বললেন- "তুমি এখন যাও নায়েব। পরে কথা বলবো।"

- " জি আচ্ছা"-বলে উঠে ক্ষুন্নমনে বেরিয়ে গেলেন মিয়াজান মিয়া। তিনি বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকলো পরীবানু। বললো- "বাপজান- এই বাপজান-"

www.pathagar.com

মেয়ের এই শিশু সুলভ চটুলতায় অল্প একটু হেসে ফেললেন তরফদার সাহেব। আদর ভেজা কণ্ঠে তিনি বললেন- "কি মা মনি, কি হুকুম?"

পরীবানু আদল কণ্ঠে বললো- "মতিজান এসেছে, আমি মতিজানের বাড়ী যাবো।"

- মতিজানের বাড়ী? কেন বলো তো?

- ও পাড়ায় বাড়ী বাড়ী মর্শিয়াগান হচ্ছে। তোমার বাড়ীতে একটা দলও আসে না। আমি মর্শিয়া শুনতে যাবো।

- ও, এই কথা?

হো হো করে হেসে ফেললেন তরফদার সাহেব। বললেন-"আমার বাড়ীতে আসেনা, কে বললে সে কথা? একেবারে অন্দরের দিকে এগুতে কেউ সাহস পায় না ঠিকই। কিন্তু কাচারী বাড়ীতে তো হরদমই হচ্ছে।"

- তো কাচারীতে হলে আমার লাভ কি?

- মানে?

- মতিজানের বাড়ী গেলে ঘরের মধ্যে বসে থেকেই সব কিছু দেখাও যায়, শোনাও যায়। তোমার ঐ কাচারীতে আমি যাবো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মর্শিয়া শুনার জন্যে?

- না- না। আমার মা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মর্শিয়া গান শুনবে, তা কি কখনও হয়? তুমি এই খানে বসেই মর্শিয়া গান শুনবে।

- এই খানে?

- হ্যাঁ। ওবেলা যেমন বাড়ীতে বসে বসেই কাসিদ দেখলে, সেই রকম এখানে বসে বসেই মর্শিয়া শুনবে এই বেলা। সেই ব্যবস্থাই করেছি। তোমরা যাতে বাড়ীতে বসেই মর্শিয়া শুনতে পাও, সেই জন্যেই মর্শিয়া দলকে এখানে আসতেই বলেছি।

- সত্যি?

- একদম সত্যি। তাও আবার যেমন তেমন মর্শিয়া নয়। এ অঞ্চলের একেবারে সেরা দলের মর্শিয়া। আমার আম্মা অন্যপাড়ায় যাবে ঐসব যাচ্ছে- তাই মর্শিয়া শোনার জন্যে? অন্যপাড়ার লোকই এখন এসে দেখুক, আমার আম্মা কেমন মর্শিয়া শোনে। হুঁ-হুঁ, বাবা, জমিদারের মা বলে কথা।

- যাও, তোমার সবটাতেই ঠাট্টা! যেতে দেবে না তাই এসব চালাকী করে বলছো।

- চালাকী? তওবা - তওবা! মায়ের সাথে ছেলে কখনও চালাকী করে পার পায়? ধরা পড়লে তখন? বিশ্বাস না হয়, ঐ মতিজানকে ডেকে এনে বসো এখনই এখানে। হাতে হাতে প্রমাণ পাবে।

- তাই নাকি? তাহলে কোন দল বাপজান? কোথাকার দল?

- আলতু-ফালতু দল নয়। ঐ সোনাকোলের লাল মিয়ার দল। সব ভদ্দরলোকের ছেলে। ঐ যে সেই দূর্গাপূজায় ভাসান গান গাইলো, ওরা। ঐ লাল মিয়ার বাপও একটা মস্তবড় জোতদার ছিল এ অঞ্চলে।

www.pathagar.com

লটারীতে লাখ টাকা পুরস্কার পাওয়ার খবর শোনার চেয়েও এ খবরে অধিকতর বিহবল হলো পরীবানু। তার কাছে এখবর তার সারাজীবনের পূণ্যফলের সমান। এ খবর কানে যেতেই সপুলক শিহরণে বিপুল বেগে দুলে উঠলো পরীবানুর অন্তর। বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মতো তার সারা দেহের রক্ত হু-হু করে ছুটে এলো মুখ মন্ডলে। মর্শিয়াটা কেবলই একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মতিজানের বাড়ীতে যাওয়ার তার যত আগ্রহ তা শুধু ঐ লাল মিয়ার জন্যেই। তাই, এই দূরের গঙ্গা নিকটে পাওয়ার আনন্দে সে অস্থির হয়ে উঠলো। তার এই বিহবলতা বাপের চোখে ধরা পড়ার আগেই সে- " তাহলে মতিজানকে এক্ষুনি ডেকে আনি"-বলেই দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরীবানু বেরিয়ে যেতেই বারান্দায় এসে হাজির হলো আছিরুদ্দীন পেয়াদা। সালাম দিয়ে বললো-"হুজুর, কাচারী বাড়ীতে দুই দুইটি মর্শিয়া দল এসেছে। একদল সোনা কোলের লাল মিয়ার। ওরা বলছে- আপনিই নাকি আসতে বলেছেন ওদের। ওরা কি ওখানেই গাইবে?"

তরফদার সাহেব ব্যস্তভাবে বললেন-"আরে না-না! ঐ লাল মিয়াদের এখানে পাঠিয়ে দাও। অন্য দলকে ওখানেই গাইতে বলো। লোকজনের ভিড় সব ওদিকেই ধরে রাখো। এদিকে যেন ভিড় না করে কেউ।"

"জি, আচ্ছা হুজুর "বলে সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেল আছিরুদ্দীন। মতিজানকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে বৈঠকখানায় পুনরায় ফিরে এলো পরীবানু। অন্দর মহল থেকে ঝি-চাকরানীও কয়েকজন ছুটে এলো খবর পেয়ে। ছুটে এলো চাকর-বাকর পাহারাদার। পুরুষেরা সব বারান্দার নীচে এক পাশে দাঁড়ালো। মতিজানকে দেখেই তরফদার সাহেব বললেন- "এই যে মা মতিজান! এসো-এসো। তোমরা এখানেই এই বারান্দায় বিছানা পেতে বসো। এখানেই আজ শুনতে পাবে মর্শিয়া।"

মতিজান হাত তুলে সালাম দিয়ে স্মিতহাস্যে বললো- "তাই?"

সালাম নিয়ে তরফদার সাহেব উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন "হ্যাঁ। ঐ সোনাকোলের লাল মিয়ার দল। আগামী কালের মেলায় লাঠি খেলার জন্যেও দাওয়াত করবো ওদের। আগামীকালও আসবে কিন্তু অবশ্যই।"

বলতে বলতে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তরফদার সাহেব। একটা চাকরকে ইঙ্গিত করতেই সে একটা চেয়ার এনে বারান্দার এক কোণে পেতে দিলো। একটা চাকরানী ও একটা বিছানা এনে বিছিয়ে দিলো বারান্দায়। মেয়েদের সবাইকে এই বারান্দায় বসার ইঙ্গিত করে তরফদার সাহেব চেয়ারের উপর বসতেই আঙ্গিনার অপর প্রান্তে হাঁক দিলো লাল মিয়া- "বোল মোমিনা-"

তার সঙ্গীরা হাঁক দিয়ে সাড়া দিলো -"ইয়া-হুসেন-"

লাল মিয়ার পেছনে প্রায় একই বয়সের পনের বিশ জন যুবক সারি বেঁধে এগিয়ে এলো সামনে। তারা এসে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে তরফদারকে লক্ষ্য করে সমস্বরে বললো-"আস্‌সালামু ওয়ালায় কুম!"

www.pathagar.com

"ওয়ালাই কুম সালাম"- বলে সালাম নিয়ে তরফদার সাহেব খুশী মনে বললেন "এসো বাবারা, এসো।"

দূর থেকে পরীবানুকে দেখতে পেলো লাল মিয়া। লাল মিয়াকে দেখতে পেলো পরীবানুও। এবার নিকটে এসে চোখ তুলতেই সরাসরি উভয়ের চোখে চোখ পড়লো উভয়ের। সঙ্গে সঙ্গেই ইষৎ একটা হাসির রেখা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো উভয়েরই ঠোঁটে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে উভয়েই তা দমন করলো অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। সবার দৃষ্টি এড়ালেও মতিজানের দৃষ্টি এটা এড়ালোনা। তল চোখে চেয়ে সে অল্প একটু ঠেলা দিলো পরীবানুকে। হাসিমুখে চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললো- "খবরদার!"

দৃষ্টি এটা এড়ালোনা লাল মিয়ার সঙ্গীদেরও। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তারা পরস্পরে চাইতে লাগলো পরস্পরের দিকে। এদের ইতস্ততঃ করতে দেখে তরফদার সাহেব বললেন- "নাও, এবার শুরু করো।"

সচকিত হয়ে এবার দুই দলে ভাগ হলো লালমিয়ার সঙ্গীরা। এক এক দলে আট দশজন এক সারিতে অন্য দলের মুখোমুখী দাঁড়ালো। পাশে দাঁড়িয়ে সুর করে পয়ার ধরলো লাল মিয়া। দুই দল সামনের দিকে মুখো মুখি ঝুঁকে পড়ে তালী বাজিয়ে বাজিয়ে সেই পয়ার সেই সুরে আউড়ে যেতে লাগলো। এক পয়ারের সময় ঐভাবে এক দল এগুতে লাগলো সামনে, অন্য দল পিছুতে লাগলো পেছনে। অন্য পয়ারের সময় ঐ একইভাবে এগুনো দল পিছুতে এবং পিছানো দল এগুতে লাগলো পর পর।

লাল মিয়া ঃ (ওই) পানি পানি, দেমা পানি, পানি বিনে পরান যায়-
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল মিয়া ঃ (ওই) পানি বিনে ইমাম হোসেন শহিদ হলো কারবালায়।
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল মিয়া ঃ (ওই) কান্দেরে সখিনা বিবি ঘোড়ার বাকডোর ধরিয়া-
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল মিয়া ঃ (ওই) খালি পৃষ্ঠে এলে ঘোড়া, সওয়ার কোথায় ছড়িয়া।
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল মিয়া ঃ (ওই) সখিনা কান্দিয়া বলে, কেন রাতি পোহাইল-
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল ঃ (ওই) আমারো বিয়ার কলেমা, কোন মওলানায় পড়াইল।
সঙ্গীরা ঃ 'ঐ'
লাল মিয়া ঃ (ওই) বাড়ীর শোভা বাগ বাগিচা, রাতের শোভা চাঁন্দোনী
সঙ্গীরা ঃ ঐ
লাল মিয়া ঃ (ওই) মায়ের কোলে ছেলের শোভা, নারীর শোভা সোয়ামী
সঙ্গীরা ঃ ঐ

www.pathagar.com

গানের এক পর্যায়ে দুই সারি এক হয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেললো লালমিয়াকে। মাঝে থেকে গাইতে লাগলো লালমিয়া। লালমিয়াকে কেন্দ্র করে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তালী বাজিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সঙ্গীরা তার ধূয়া ধরতে লাগলো। আর এক পর্যায়ে সঙ্গীরা সব বৃত্তাকারে বসে পড়লো মাটিতে। মাটি চাপ্‌ড়িয়ে চাপ্‌ড়িয়ে তারা ধরতে লাগলো ধূয়া। গান শেষে পুনরায় হাক দিলো লাল মিয়া- "বোল মোমিনা

সঙ্গীরা সব দাঁড়িয়ে গিয়ে একযোগে জবাব দিলো-"ইয়া হুসেন-"

গান শেষ হতেই তরফদার সাহেব তালী বাজিয়ে তারিফ করে বললেন- "মার হাবা- মারহাবা!"

সঙ্গীরা সব গামছা খুলে ধূলা ঝাড়তে লাগলো। পকেটে হাত দিয়ে তরফদার সাহেব পয়সা খুঁজলেন কিছুক্ষণ। না পেয়ে লজ্জিত হয়ে পরীবানুকে বললেন- "ও-হো। যাও তো মা, আমার ঐ জামাতে পয়সা আছে। ওখান থেকে একটা টাকা এনে ইনাম দাওতো এদের।"

খুশী হয়ে অন্দরের দিকে ছুটে গেল পরীবানু। গান শেষ হয়ে যাওয়ায় মুষ্টিমেয় শ্রোতাও একে একে সরে পড়তে লাগলো। তরফদার সাহেব লাল মিয়াদের লক্ষ্য করে বললেন- "তা বাবা, আমি দাওয়াত করছি তোমাদের। আগামী কাল রাতে আমার বাড়ীতে মহররমের শিরনী পাকানো হবে। ঐ দিনই আমাদের ঐ বুড়াপীরের মাঠে মেলা বসবে বিকেলে। ঐ মেলায় লাঠি খেলার প্রতিযোগিতাও হবে। সেই খেলায় খেলতে আসবে তোমরা। খেলা শেষে আমার বাড়ীতে এসে রাতে দু'টো খাবে এবং থাকবে। কি, রাজী?"

লাল মিয়ার কাছে এ আহবানের মূল্য লাখ টাকারও অধিক। তাই সে খুশী হয়ে মাথা হেলিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলো- "জি, আচ্ছা!"

অন্দরের দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে তরফদার সাহেব উঠতে উঠতে বললেন- "খুব খুশী হলেম বাবা! ঐ যে আমার পরীমা দান নিয়ে আসছে। ওটা নিয়ে আজকের মতো যাও তোমরা। আমি একটু কাচারীর দিকে যাই। খুব তাড়া আছে। কাল কিন্তু অবশ্য অবশ্যই আসবে।"

কাচারীর দিকে চলে গেলেন তরফদার সাহেব। বারান্দায় শুধু মতিজান ও গুটিকয় ছেলে মেয়ে এবং আশে পাশে দু'একজন চাকর -বাকর ছাড়া ভিড় বলতে কিছুই আর রইলো না। বৈঠক খানা থেকে খানিক দূরে থাকতেই টাকা হাতে পরীবানু ডাক দিলো-"এই যে, দান নেও-।"

এই অপেক্ষাই লাল মিয়া করছিলো। সে সঙ্গে সঙ্গে "দাও-" বলে ছুটে গেল একা। টাকাটা হাতে পেতে নিতে নিতে চাপাকণ্ঠে বললো- "আবার কোথায় দেখা হবে?"

পরীবানু লজ্জিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বললো-" আগামী কাল বিকেলে। আমাদের ফুল বাগানের পেছনে।"

www.pathagar.com

চমকে উঠে লাল মিয়া ফের বললো-" বিকেলে যে লাঠি খেলা।"

পরীবানু কাঁপতে কাঁপতে ঐ ভাবেই বললো-"এক ফাঁকে এসো। আমি ওখানেই থাকবো।"

বলেই সে কম্পিতপদে চলে গেল বৈঠকখানার দিকে। লাল মিয়াও খুশী মনে ফিরে এলো ইয়ার বন্ধুদের কাছে। "বোল্ মোমিনা- ইয়াহুসেন-" হাঁক দিয়ে সদল বলে চলে গেল লাল মিয়া। বারান্দায় বসে বসে সব কিছুই লক্ষ্য করলো মতিজান। তার চোখে তখন দুষ্টুমীর কপট আগুন দাউ-দাউ।

[দশ]

তরফদার সাহেবের বাড়ী থেকে বিধ্বস্ত মনোরথে বেরিয়ে নায়েব আর বাড়ী ফিরে গেলেন না। নতুন ভাবে জাল বিছানোর চিন্তায় উত্তপ্ত মস্তিষ্কে তিনি অস্থির হয়ে ঘুরতে লাগলেন নির্জন পথে ঘাটে। হাজার রকম চিন্তা তার মাথার মধ্যে কিলবিল করছে অবিরাম। এখন তার বড় বাধা লাল মিয়া। তরফদারের চোখে তাকে খাটো করতে না পারলে আর উপায় নেই। তরফদারের যা মনোভাব, তাতে যে কোন সময় লালের হাতেই পরীবানুকে দিতে পারেন তরফদার। লাল মিয়াদের ডেকে আনার খবর পেয়ে তাঁর এ ধারণাটা প্রকট হলো আরো। যেভাবেই হোক, ঠেকাতে হবে লাল মিয়াকে। এটাকে ঠেকাতে পারলে আপাততঃ কিছুদিন নিচিন্ত হন তিনি। অবকাশ পান ঠান্ডা মাথায় জাল বিছানোর। লাল মিয়াকে অচল করার পর তাঁকে কোমর বেঁধে লাগতে হবে পরীবানুর পেছনে। সৃষ্টি করতে হবে তার এক কলংকের ইতিহাস। পরীবানুর কলংক-কথা কায়দা করে পাঁচ গায়ে প্রচার করতে পারলেই খামুশ হবেন তরফদার। এরপর, সম্পর্ক যা আসবে, তা কৌশল করে ভেঙ্গে দেয়া কঠিন হবে না এমন কিছু। কোথাও তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে যখন পারবেন না, তখন বাধ্য হয়েই অরুচির খানা খেতে হবে তরফদারকে। এ অঞ্চলের মানী লোক তিনি। মান সম্মান টাঁকতে তাঁকে হবেই। তখনও যদি হুকুম উদ্দীনকে অপছন্দ করেন তিনি, হুকুমদ্দীনের বাপটা তো আর ছেলের মতো অপদার্থ নয়, বাপটাই না হয় দাঁড়াবে তার ছেলের জায়গায়। বেকায়দায় পড়লে মানুষ চাকর-বাকর দেখেনা। তার একটু বয়েস হলেও তিনি তো একজন নায়েব। পাঁচ পাঁচটা নিকেহ্ করলে কি হবে? ঘরে আছে মোটেই এখন তিনটে মাত্র স্ত্রী। চারটের বিধান শরিয়তেই আছে।

এসব কথা মনে আসতেই ক্ষনিকের জন্যে খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মিয়াজান মিয়ার মুখ। তিনি ভারতে লাগলেন- আরো কয় বছর আগে হলে এবং ঘরে তাঁর একাধিক স্ত্রী না থাকলে, নিজের জন্যেই প্রস্তাবটা পাঠাতে পারতেন তিনি। তাঁর নিজের যোগ্যতা নিয়ে তো আর প্রশংসার ঘাটতি নেই তরফদারের। আসলে হুকুম উদ্দীন তো সত্যি সত্যিই এক বিন্দুও যোগ্য নয় পরীবানুর। জমিদারীর সম্পর্ক না

www.pathagar.com

থাকলেও পরীবানু নিজেই একটা দুর্লভ রত্ন। তার মূল্য হুকুমউদ্দীন কি বুঝবে! অবোধের কাছে মুক্তার কদর কি আছ! এ ব্যাপারে হুকুম উদ্দীনের বাপটাই তো জাত-জহুরী। সামাজিক আর অর্থনৈতিক বাধা-বিপত্তি না থাকলে, আরো কত মেয়েই আসতে পারতো ঘরে তার। এ তল্লাটে কোথায় কোন পাকা ফল কাকে খাচ্ছে, সে খবর কি মিয়াজান মিয়ার অজানা? সূফী-খান্দানী ঘর থেকে চাঁড়াল-ডোম-সাঁতালের ঘরে কোথায় কি হচ্ছে, সে হদিস কি মিয়াজান মিয়া রাখেনা ? হারু সাঁতালের নাতনী ঐ পুষ্পটা সাঁতাল হলে কি হবে, কেমন ডাগর-ডাগর ডপকি-ডপকি মেয়ে! স্বামীটা তো থেকেও তার নেই। পোট্‌কা-কুঁড়ে, রোগা। সারা বছর পড়ে থাকে বিছানায়। খাজনার দায়ে বাঁধা পড়েছে শুনে স্বামীটাকে খুলে নিতে ঐ পুষ্পটাই কি আসতোনা ? হারু সাঁতাল এসেই তো ভেঙ্গে দিলে সব!

এ ছাড়া, ঐ ন'লে পাড়ার কামিনী, চাঁড়ালপাড়ার দুলালী, শেখের ভাগ্নী আতরজান, আহাদের বোন নছিরণ, ফয়জার মেয়ে বাদলী-এরা? এদের ঘরে তো স্বামী নেই একজনেরও। তালাক দেয়া, তাড়িয়ে দেয়া আর বিধবা সব মেয়ে। পটপটে যুবতী! এদের দিন ক্যাম্‌নে কাটে নায়েব কি তা জানে না? এদের হাঁড়ির চাল কি আর সে টিপে দেখেনি অল্প বিস্তর? বেশী দূরে যেতে কি! এই বয়নার বউ এর কথাটাই তো ধরা যায়! হোক না গরীব, তাগড়া জোয়ান মেয়ে। একেবারেই কাঁচা বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের বউ। বয়না করে ভিন্-গাঁয়ে চাকরী। মাইনে-করা কিষাণ। বাড়ীতে এই বউ থাকে একা। বয়নার মা-ই একমাত্র পাহারাদার। সেও আবার পৃথক অন্নে ভিন্ন ঘরে থাকে। কয়েককাঠা জমি পেয়ে সেই বয়নার মাও নায়েবের এখন কেনা গোলাম। তার বাড়ীতে গেলে কি আর বয়নার বউও খাতির করতে কম করে কিছু?

সমাজের তিনি অন্যতম মাথামুন্ডু বলেই তো এসব কথা চেপে যেতে বাধ্য হন তিনি। তাঁকে চলাফেরাও করতে হয় সন্তর্পনে। এ ছাড়া, নীতির অনেক বড় বড় কথাই তাঁকে বলতে হয় শালীশ দরবারে বসে। মুখোশটাতো আর একেবারেই খুলে ফেলা যায় না! চাকরীটারও ভয় তো একটা আছে।

মনে কোন অশান্তি দেখা দিলে বড় একটা ঘরে যান না নায়েব। ঘরে তাঁর শান্তি নেই। ঝগড়া-ফ্যাসাদ-খিটিমিটি তিন তিনটে বউ-এর মাঝে লেগেই আছে সব সময়। সবার ছোট গুলাপজান। সেটা তো একটা দজ্জাল। তাকে বাগে আনার সামর্থ নেই নায়েবের। নায়েব নিজেও তা বোঝেন। শুধু রূপ দেখেই ঘরে এনেছেন তাকে। দশ বিঘে সরেস জমি লিখে দিয়ে। গুলাপজান তার ঘরে এসেছে বটে, কিন্তু বশে আসেনি একটুও। সে তোয়াক্কাই করে না নায়েবকে। চরিত্রও তার গোড়া থেকেই গোল মেলে। নায়েবের তা জানা। আগে যাদের যাতায়াত ছিল গুলাপজানের বাড়ীতে, তাদের দলে ভিড়েই তো গুলাপজানের সাথে তার প্রথম প্রথম পরিচয়। ঐ দশবিঘে জমির কিস্তি চেপেই তো তিনি মাৎ করেছেন বাজী। সবার মুখে ছাই দিয়ে ঘরে এনেছেন গুলাপজানকে। ঐ দশ বিঘে জমির জন্যেই এখন আর তাকে বিদেয় করতে পারছেন না। সব কিছুই সহ্য করছেন মুখ বুজে। নিজের ঘর সামাল দেয়ার

www.pathagar.com

সামর্থ নেই নায়েবের। কিন্তু পরের ঘরের দিকে তাঁর নজর বড় টনটনে।

তরফদারের বৈঠকখানা ত্যাগ করে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন নায়েব। সন্ধ্যের পরই পা বাড়ালেন বয়নার মায়ের বাড়ীর দিকে। কারো কোন কুৎসা-রটানোর ব্যাপারে ঢোলপেটার মতোই কাজে লাগে বয়নার মা। নায়েব সাহেবের অভিষ্ট সিদ্ধির পথে বয়নার মা-ই এখন একমাত্র হাতিয়ার। লাল মিয়ার কুৎসা একটা রটাইতেই হবে সত্বর। তাই বয়নার মায়ের প্রয়োজন আজ চরম। বয়নার বউ-এর পান তামাকের আকর্ষণটাও আছে। বিধবস্ত মেজাজটা মেরামত করাও দরকার।

বয়নার মায়ের বাড়ীটা আর পাঁচটা বাড়ী থেকে অল্প একটু ফাঁকে। একটা মেঠো পথের মাথায়। সকলের অলক্ষ্যে মাঠের পথ ধরেই সেখানে এসে হাজির হলেন নায়েব। ঘরেই ছিল বয়নার মা। তাকে ডাক দিতেই সে উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলো-"কেডা গা? কে ডাকে?"

কুপী হাতে বেরিয়ে এলো বয়নার মা। নায়েব সাহেব এগিয়ে এসে নীচুকণ্ঠে বললেন, "আমি নায়েব। জরুরী আলাপ আছে তোমার সাথে?"

কুপীটা উঁচিয়ে ধরলো বয়নার মা। নায়েবকে চিনতে পেরেই সে বিগলিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে লাগলো "ওম্মা! সে কি গা! এ যে দেখছি গরীবের বাড়ীতে হাতীর পাড়া! ও-বউ! বউ-! আরে ও আবাগীর বিটি! তুর ঐ লতুন বিছ্ন্যাডা লিয়া আয়তো শিগিগর! দ্যাখ, কেডা আচ্চে!"

বয়নার মায়ের কণ্ঠস্বরে শংকিত হলেন নায়েব। চাপাকণ্ঠে বললেন- "বয়নার মা, ধীরে। একটু গোপন আলাপ আছে। লোকজন এসে পড়লে অসুবিধে হবে।"

গলার তেজ কিছুমাত্র না কমিয়ে বয়নার মা ঐ একইভাবে বললো- "হ্যাঁ, তা পারেই তো! পাড়াডা কি ভাল? যতসব কুট্নী মাগীর বসত! কার বাড়ীত্ কে যাচ্ছে, কার সাথে কে কি কচ্চে- ল্যাং-খাকীরা দিনরাত ঐ লিয়াই থাকে! ঝাঁটা মারি ল্যাংখাকীদের মুখেত্! আসেন-আসেন-। তুমি আস্যা এই ঘরের ভিতর বসেন। তা, এ কতাও বুলে দিচ্ছি, বয়নার মায়ের বেড়াত্ (দেয়ালে) যুদি কান লাগায় কেউ-তারও আমি চৌদ্দগুষ্টি থুয়ে কতা কবোনা, হ্যাঁ! বয়নার মাকে চেনে না কোন ভাতার খাকী ?"

- বলেই সে আবার হাঁকতে লাগলো-"বউ, আরে ও ঘুঁটেকুড়ানীর বিটি।"

প্রমাদগুণলেন নায়েব। অতিকষ্টে বয়নার মাকে শান্ত করে তিনি তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন বয়নার মায়ের ঘরে। হম্ড়ি খাওয়া কুড়েঘর। স্যাঁৎ সেঁতে দুগর্ন্ধময়। খড়-খড়ি, হাঁড়িকুড়ি, ঝুল কালী ও ইঁদুরের মাটি ভর্তি ঘরটির মাঝখানে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা। এইটুকুই মেঝে। বয়নার মায়ের শয়ন স্থান। একপাশে ছেঁড়া কাঁথা জোড়ানো। সবগুলোই নোংরা। কুটকুটে কালো, ঘরের মধ্যে দুর্গন্ধের উৎসস্থল অনেক। এটিও তার একটি। স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু মানুষ যে নরকে প্রবেশ করতেও দ্বিধা বোধ করেনা-নায়েবের এই আচরণই তার একটা প্রমাণ। নায়েব সাহেব ঘরের

www.pathagar.com

মধ্যে প্রবেশ করতেই বয়নার বউ মাদুর এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিলো। বয়নার বউকে দেখেই সাহেবের মুখ মন্ডলে খুশীর একটা ঝিলিক লাগলো। তিনি দরদী কণ্ঠে বললেন-"তুমি কেমন আছো? শরীর টরীর ভাল?"

ঘোমটার আঁচলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বয়নার বউ স্মিতহাস্যে বললো- "জে, ভালই আছি।"

হাতের কুপী একপাশে রাখতে রাখতে বয়নার মা বললো- "যা তো বউ, আমার ঘরেত্তো কিছুই নাই, থাকলে একটু পান-তামুক লিয়া আয়তো। আজা-বাদশা মানুষ আচ্চে বাড়ীত্। একটু যত্ন আত্তি না করলে চলে?"

ইতস্ততঃ করে বয়নার বউ বললো- "তামুক নাই, খালি পান আছে।"

মিয়াজান মিয়া উৎসাহ দিয়ে বললো-"ব্যস্ ব্যস! ঐ পানই একটু আনো। আর কিছুর দরকার নেই।"

তবু বয়নার বউকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বয়নার মা বললো-" ওম্মা! তাও যে সঙ্গের মুতো দাঁড়ায়্যা থাকলু? পানডাও জিউ দিয়া বাড়াচ্চে না? বেন্ন্যার বিটি হলে মানুষ এত বেন্ন্যাই হয়? শরমে মরে যাই লো, মরে যাই।"

নিজের ঘরে ছুঁচোর বাসা আর পরের উপর ফোড়ন কাটা দেখে পিত্তি জ্বলে উঠলো বয়নার বউ এর। অন্য সময় হলে এর উচিত জবাব দিতো সে। নায়েব সামনে থাকাতেই তা পারলো না। গায়ের রাগ গায়ে মেরে সে কোন মতে বললো- "সুপারী নাই, তালের কুচি দিয়া পান যে!"

তাতেই বর্ত্তে গেলেন নায়েব। বললেন-"আরে তাতে কি আছে? ঐ দিয়েই আনো। সুপারীটাই কি বড়? পানটা দেয়ার মধ্যে দরদটাই তো আসল!"

বয়নার বউ এর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন নায়েব সাহেব। একপলক তেমনি ভাবেই চেয়ে, হাসিমুখে বেরিয়ে গেল বয়নার বউ।

মিয়াজান মিয়া বিছানার উপর বসতেই একপাশে মাটিতেই বসে পড়লো বয়নার মা। বললো-" তা কি কতা লিয়া আচ্চেন তুমি? খাজনা টাজনা হলে কিন্তুক ইবছর কিছু দিতে পারবোনা তা আগেই বুলে দিচ্চি।"

নায়েব সাহেব হাসতে হাসতে বললেন- "আরে- না-না। ওসব কথা নিয়ে আসিনি। একটু অন্য কথা আছে। মানে-ঐ লাল মিয়া ছেলেটার স্বভাব চরিত্রের কথা।"

বয়নার মা আশ্বস্ত হয়ে বললো- "কুন লাল মিয়া? ঐ সোনাকুলের?"

নায়েব বললেন- "হ্যাঁ। সোনাকোলের। ছেলেটার স্বভাব-চরিত্র নাকি খুবই-"

বয়নার মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো -"চমেৎকার। খুবই চম্যেকার! খাশা ছাত্তয়াল ঐ লাল মিয়া। একেবারে অষ্টধাতুর ছাওয়াল। যেমুন চেহারা, তেমনি গায়েত্ বল, তেমনি স্বভাব-চত্তির। কুনো আজাজমিদারের ঘরেত্ ও এমুন ছাওয়াল নাই।"

ভড়কে গেলেন নায়েব। বিরক্ত হলেন। আর পাঁচ জনের মতো বয়নার মাও প্রশংসা করবে লাল মিয়ার, ঐটা তিনি ভাবেন নি। তাই কায়দা করে বললেন-"হ্যাঁ, আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু লোকে তো এখন একে বারেই উল্টা কথা

www.pathagar.com

বলছে। লোকে বলে-"

নায়েবকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বয়নার মা বললো- "বুলবিই তো। লোকে তা বুলবিন্যা? লিজের ছাওয়াল যে সগ্‌গলেরই লুচ্চা আর লটি। পরের ছাওয়ালেক কি ভাল বুলবি ওরা? চ্যাক চ্যাক করে লাথি মারি ঐসব গো-হিংসুকদের মুখেত্!"

অসহিষ্ণু হয়ে নায়েব এবার থামিয়ে দিলেন বয়নার মাকে। বললেন- "আহ্! বয়নার মা! তোমার ঐ এক দোষ! যা জানোনা, তাই নিয়েই তুমি বেশী কথা বলো।"

হক চকিয়ে গিয়ে বয়নার মা বললো-"এ্যাঁ।

নায়েব সাহেব বললেন- "আসলে ঐ লাল মিয়া ছেলেটা সত্যি সত্যিই ভাল নয়। আমিও তা জানি।"

- তাই?

- ষন্ডা-ষন্ডা! একেবারেই চরিত্রহীন। কত মেয়ের ইজ্জত যে সে মেরেছে, তার হিসেব নিকেশ নেই।

গালে হাত দিয়ে বয়নার মা বললো-"ওম্মা!"

নায়েব আরো জোর দিয়ে বললেন-" কেন হবে না? বয়স হলো কত সেটা কি খেয়াল করেছো? জোয়ান তাজা মানুষ, এত বয়সেও বিয়ে না করে কেমন করে থাকে- তা ভেবে দেখছোনা?"

বয়নার মা ঐ একই ভাবে বললো- হ্যাঁগা!- তাইতো !"

- কাজ নেই, কামনেই, দিনরাত শুধু হৈ-হৈ। এই যে দল বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়ায়, তা কি জন্যে? সেটা কি কারো বাঁকী আছে জানতে? সাঁতাল-বুনো, হাড়ি-ডোম, -কারো ঘর বাদ রেখেছে বদমায়েশ।

- ওম্মা! তাইতো গা! তাই তো ঐ সাঁতাল পাড়ার পুষ্পের সাথে সেদিন ঢলাঢলি করতে দেখনু! ঐ হারু সাঁতালের নাতনী গা! আস্তার উপুর দেখি-দুইজন হাত পা নেড়ে কি সব অঙ্গের কতা কচ্চে আর হেসে হেসে ঢলে ঢলে পড়িচ্চে। আমি ভাবনু, এমনি বুঝি। তা এই ব্যাপার ? ছি-ছি-ছি!

পুষ্পের কথা উঠতেই নায়েব একটা অবলম্বন পেলেন। এইটেই তিনি আঁকড়ে ধরলেন সবলে। বললেন, "শুধু ঐ টুকু? ঐ মহিষখালীর ফেলু ওকে পুষ্পের ঘরে একেবারে বিছানার উপর- মানে, ওসব কথা বলা যায় না, নিজ চোখে দেখেছে। তাও আবার একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন।"

- সে কি গা! ঐ সাঁতালের ঘরেত?

- তো আর বলছি কি? ঐ পুষ্পকেই নিকাহ করার জন্যে তো লাল মিয়া এখন পাগল। দরকার হলে নিজেও সে সাঁতাল হবে, এই রকমই কথাবর্তা চলছে। অমনি কি আর সাঁতালেরা লাল মিয়ার এত ভক্ত?

- ওয়াক থু! কি ঘেন্নার কতা গা! তা পুষ্পের সোয়ামী -ড্যা?

www.pathagar.com

- ওটা তো চিররুগ্ন। কিছু পয়সা কড়ি নিয়ে সে ছেড়ে দেবে বউ! আর লাল মিয়া সেই ছেড়ে-দেয়া সাঁতালনীকে ঘরে তুলবে বউ করে।
- ঘেন্না ঘেন্না।
- ওর আর ঘেন্না-তিক্কে আছে? মোহনপুরের কারিকর পাড়ায় ঐ বেশরমটা কি ধরা পড়েনি সেবার? আচ্ছামতো পিটে ওকে কি বস্তার মধ্যে ভরেছিল না কারিকররা? ওর ঐ গুন্ডার দল গিয়েই তো খুলে আনে ওকে।
- লাথি মারো! ওমন বেজন্মা মানুষের মুখেত লাথি মারো দশ গোন্ডা।
- আরও কতজায়গায় কত লোকে ওকে হাতে নাতে ধরেছে তার কি হিসেবে আছে? এগাঁয়েও কত ঘরে ঢুকে ও তাড়া খেয়েছে কত দিন! শুধু তুমিই কিছু দেখোনি!

আত্মমর্য্যাদায় ঘা লাগলো বয়নার মায়ের। সে ফুঁসে উঠে বললো- "দেখিনি! কে কয় দেখিনি? কুন্ আবাগীর পুত কয় দেখিনি? চোখ দুড্যা কি খুল্যা থুচি? ঐ ন'লে পাড়ায় কম্লীর ঘরেত্, চাঁড়াল পাড়ার গণশার বাড়ীত কি দেখিনি আমি অক্ (ওকে)? দক্ষিণ পাড়ার ময়জানের ঘরেত কি দেখিনি অক্ ফাসুর-ফুসুর করতে? সেদিন তো ঐ ডহরের উপুর কলার ঝাড়ে মিয়ামানুষের সাথে অং করতে অক্ আমি লিজে চোখে দেখনু। আমার চোখকে ফাঁকি দিবি ঐ ফ্যান-চাক্নীর পুত? ছি-ছি-ছি! ঘেন্নায় আর বাঁচিনে! এতবড় লুচ্চা আমি ইজন্মে দেখিনি!"

নায়েব বললেন-" তাহলেই বুঝো একবার! অথচ ঐ গোব্রার চাচী কয়- লালের মতো ভাল ছেলে আর হয় না।"

পূর্বপর কিছু না জেনে মিয়াজান মিয়া অমনি অমনিই বলে ফেললেন গোব্রার চাচীর কথা। ব্যস! এতেই এবার আগুন ধরলো বারুদে আর ষোলকলায় পূর্ণ হলো মিয়াজান মিয়ার মনোষ্কাম! গোববার চাচীর সাথে বয়নার মায়ের সাতজন্মের শত্রুতা। গোবরার চাচী যে রাস্তায় হেঁটে যায়, বয়নার মা টের পেলে, গিয়ে সেই রাস্তাটাকেই দুই পায়ে গুড়ায়। গোবরার চাচী যা বলে, তার উল্টোটা সাথে সাথেই সারা গাঁয়ে প্রচার করতে না পারলে, পেটের ভাত হজম হয় না বয়নার মায়ের। এক রাজ্যে দুইরাজা আর এক গাঁয়ে দুই কুট্নী থাকলে, সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গোবরার চাচীর কথা উঠতেই আগুনের ছ্যাকা লাগলো বয়নার মায়ের গায়ে। সে তড়পে উঠে বললো-"ঝাঁটা মারি, গুনে গুনে দেড় কুড়ি মুড়ো ঝাঁটার বাড়ি মারি ঐ সাত ভাতারীর মুখেত্। বুললেই হলো? লালের মতো বেহায়া আর বেজন্মা যে দুড্যা নাই এই পিত্তিমীত্, তা দ্যাশের লোক কে না জানে? ঐ ছিনালমাগী বুললেই কি তা হবি? লিজের বিটির ঘরেত্ই যে ঐ লাল মিয়া আস্যা দিনের মধ্যে সাতবার যায়, তা কি মাগী জানে না?"

বয়নার মাকে আরো অধিক উত্তেজিত করার লক্ষ্যে নায়েব সাহেব বললেন- "সেই জন্যেই তো বলছি! আমি যতই বলি- লাল মিয়ার চরিত্রটা একেবারে যাচ্ছে-তাই, গোবরার চাচী ততই কয়- না-না, খুব ভাল, খুব ভাল।"

www.pathagar.com

দকেই ছিল বয়নার মা। সে আরো জ্বলে উঠে বললো- "এই আতটা কুনোমুতে পোয়ায়ে যাক, কালই আমি দেখে লিবো কয় গোন্ডা দাঁত আছে ঐ ল্যাংখাকীর মুখেত্। ঐ লাল মিয়ার চরিত্তিরড্যা যে কি, তা কালই আমি সবাইকে জানায়ে দিয়া অর থোতা মুখ ভোতা করে দিবার যুদি না পারি, তো আমি সাত বাপের জন্মা। কোমিনের বিটি কোমিন! বয়নার মায়েক চিনোনা? এত গুমার তুর?"

গজর গজর করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বয়নার মা। গায়ের জ্বালা সম্বরণ করে সে আর এক জায়গায় বসে থাকতে পারলো না। ঠিক এই সময়ই পান নিয়ে ঘরে ঢুকলো বয়নার বউ। পানের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নায়েব সাহেব বললেন-"এসো-এসো।"

নায়েবের হাতে পান দিয়ে বয়নার বউ বললো- "আমার একটা কতা আচে।"

উৎসুকভাবে নায়েব বললেন-"কি কথা?"

- আমার বাড়ীর নীচেই ঐ পাঁচকাঠা কাচান জমি মধ্যি পাড়ার কেতাবের। আমার গুরু-ছাগল ঐ ভিঁয়ে যেয়ে লাগার জন্যে দুই বেলাই ঝগড়া হয়। ঐ জমিড্যা কিন্তুক আমার নামে-

বুঝতে পেরেই নায়েব বললেন, "ঠিক আছে। ওকথা এখন নয়, পরে। তুমি ঘরেই থেকো। আমি যাবার সময় এ নিয়ে তোমার সাথে গোপনে আলাপ করবো। এ কথা তোমার শাশুড়ীর কানে গেলেই সর্বনাশ।"

বয়নার বউ জিজ্ঞেস করলো- "আপনী কখন যাবেন?"

উত্তরে নায়েব বললো-" রাতটা একটু বাড়ুক। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো না যেন! কেমন?"

ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বয়নার বউ-এর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন নায়েব। সেই ইঙ্গিতে সায় দিয়ে অমনি ভাবেই হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বয়নার বউ।

বয়নার মা ফিরে এলে লালমিয়ার চরিত্র নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলাপ করে, প্রচার কার্য্য জোরদার করার মানসে তাকে আরো অধিক ক্ষেপিয়ে দিয়ে বয়নার মায়ের ঘর থেকে নায়েব যখন বেরুলেন, পাড়ার প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। নায়েব সাহেব বেরিয়ে এসে পথে উঠার ভান করতেই বয়নার মা ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করলো। তা লক্ষ্য করে নায়েব সাহেব ফিরে এলেন সন্তর্পনে। হাজির হলেন বয়নার বউ এর আঙ্গিনায়। বয়নার বউ দুয়ারেই বসেছিল। নায়েবকে দেখে এগিয়ে আসতেই চাপাকণ্ঠে নায়েব বললেন- "ঘরে চলো। জোতজমার কথাবার্তা বাইরে বলা ঠিক না। এ ছাড়া কেউ দেখে ফেলতেও পারে।"

উভয়েই ঘরে ঢুকে ভেজিয়ে দিলো দুয়ার। বয়নার বউ ফিস্ ফিস্ করে বললো- বাপরে। এত বুদ্ধি আপনার?"

নায়েব সাহেব হাসতে হাসতে বললেন- "এমনিই কি আর এত বড় জমিদারীর নায়েবী করছি আমি? বুদ্ধিতে ঘাটতি থাকলে শালীশ দরবারে প্রধানী করে, পাঁচজনের কু-কর্মের বিচার করে, তোমার কাছে আসতে পারতাম আমি? বলো?

www.pathagar.com

খুশী হয়ে বয়নার বউ বললো-"তাই, তারিফ করি আপনার বুদ্ধির।

নায়েব সাহেবের লক্ষ্যবস্তু বয়নার বউ। বয়নার বউএর লক্ষ্যবস্তু ঐ পাঁচকাঠা জমি। নায়েবই তার পীরিতের একমাত্র দোসর নয়। তার চেয়ে ঢেরগুণে প্রিয় দোসর বয়নার বউ এর আছে। তাই তড়িঘড়ি করে বয়নার বউ ফিরে এলো স্বার্থে। একটু থেমেই বললো-"আচ্ছা, আপনে লিজেই দিবার পারেন জমি, না তরফদার সাহেবের"

নিজের দাম বাড়ানোর জন্যে তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নায়েব সাহেব বললেন-"কিসের তরফদার! এই নায়েব যা করবে তাই একদম চূড়ান্ত। শুধু ঐ পাঁচকাঠা কেন? চাও তো আরো এক দেড় বিঘে জমি তোমার খতিয়ানে তুলে দেয়া আমার কাছে মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়।"

বয়নার বউ এতখানি বিশ্বাস করতে পারলো না। ইতস্ততঃ করে বললো- "কিন্তুক তরফদার সাহেব জানতে পারে যদি?"

নায়েবের কাছে দশদিক এখন একাকার। তাই তিনি ঐ একই কণ্ঠে বললেন- "আরে দূর। তোমার তো হলো ঐ এক দেড় বিঘের প্রশ্ন! কত বিঘে নিজের নামে করে নিয়েছি আমি, তরফদার তা টের পেয়েছে কিছু, না পেতে দেবো কোন দিন? কত মারাত্মক মারাত্মক ব্যাপার জানতে দেইনি তরফদারকে, আর এটা তাকে জানতে দেবো? হুঃ! কি যে বলো?"

নায়েব সাহেবের বুদ্ধির এবং ক্ষমতার খবর শুনে গলে গেল বয়নার বউ। নিজের আর্জিটা পেশ করে সে নিজেকে সঁপে দিলো নায়েবের হাতে। বয়নার বউএর ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন নায়েব, রাত তখন অনেক।

লোক বসতি এড়িয়ে চোরাপথে বাড়ীর দিকে রাস্তা ধরলেন নায়েব। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। থেমে গেছে গ্রামগঞ্জে মর্শিয়ার সুর। দশ দিক নিস্তব্ধ। শুধু দূর-দূরান্ত থেকে মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে দু'একটি কুকুরের নেতিয়ে-পড়া বিলাপ। সারারাস্তা পেরিয়ে এলেন নিশ্চিন্তে। বাড়ীর ভিঁটের পা দিয়েই তিনি দেখতে পেলেন- ছাঁয়ার মতো কে একজন মিলিয়ে গেল বাঁশঝাড়ে। দেখেই তাঁর গা'টা একবার কাঁটা দিয়ে উঠলো। দ্রুত গতিতে পা চালালেন তিনি। দেউটির কাছে পৌছেই তিনি দেখতে পেলেন-গুলাপ জানের দুয়ার খোলা। বাইরে থেকে এসে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকছে গুলাপজান। তার বেশবাস আলুথালু। আলুথালু মাথার চুল। বুঝতে আর এক বিন্দুও বাঁকী রইলোনা নায়েবের। তিনি দুমদাম করে ক্রোধভরে গুলাপজানের দুয়ারে এসে দাড়ালেন। ইতোমধ্যেই ঘরের দুয়ার বন্ধ করেছে গুলাপজান। দুয়ারে করাঘাত করে নায়েব সাহেব হাঁকতে লাগলেন সগর্জনে। সে গর্জনের কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে গুলাপজান শুয়ে রইলো নীরবে। কিছুক্ষণ বৃথা আস্ফালন করার পর শ্রান্ত ক্লান্ত নায়েব অন্য ঘরে গমন করলেন টলতে টলতে।

www.pathagar.com

[এগার]

পরের দিন দুপুরের পরেই বুড়াপীরের বটতলায় জড়ো হলো লাল মিয়ারা। মেলা তখন তোড়জোড়ে বসতে শুরু করেছে। দোকান পাট বেশীরভাগই এসে গেছে। বাদবাঁকী আসছে। লোকজনও জমা হচ্ছে দলে দলে। লাল মিয়ারা জড়ো হয়ে মেলার এক ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে বসলো।

লাল মিয়ার সঙ্গী এখন লাল মিয়া নিজেই। তার সঙ্গীরা সব পাশে বসে থাকলেও, মনের কাছে সে এখন একা। পরীবানু র সাথে সে আজ সাক্ষাৎ করতে যাবে। যেতেই হবে তাকে। কিন্তু এ কথাটা কাউকেই সে বলেনি। শরমের বালাই ছাড়াও এই না-বলার একটা কারণ- এসব কাজে গোপনীয়তা বাঞ্ছনীয়। বড় কারণ- লাঠি খেলার জয়-পরাজয়। যদিও এই লাঠি খেলায় সমজান-বছির বাহারেরা ওস্তাদের চেয়ে কম যায় না কিছু, তবু ওস্তাদের অনুপস্থিতি ও অমনোযোগের খবর তার দলের লোক জানলে, দলের মনোবল ভেংগে পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। জিততেই হবে দলকে তার। তাদের সম্বন্ধে তরফদারের ধারণাটা অক্ষুন্ন রাখতেই হবে প্রাণপণে। তার অভাবটা বড় নয়। বড় তার সেই অভাবটার জানা জানি। নইলে, সমজান-বছির-বাহারকে সামলাতেই নেতিয়ে পড়বে প্রতিপক্ষ। তার প্রয়োজনটা শেষ পর্যন্ত পড়বেই না হয়তো বা।

খানিক পরেই খেলার মাঠে ডাক পড়লো খেলোয়াড়দের। আট-দশটা খেলার দল হাজির হলো লাঠি হাতে। ভাগ্য তার সুপ্রসন্নই ছিল। তার দলের খেলা পড়লো সব দলের পরে। সুযোগ পেলো লাল মিয়া। 'একটু' আসি'- বলেই সে হারিয়ে গেল ভিড়ে। এদিক ওদিক ঘুরে সে বেরিয়ে এলো ফাঁকে। মেলার দিকেই সব মানুষের ভিড় আজ। অন্য দিক সব ফ্যাঁকা। সকলের অলক্ষ্যে পরীবানুদের বাড়ীর দিকে রওনা হলো লাল মিয়া।

পরীবানুদের বাড়ীটা বেশ বড়। পূর্ব দিকে ফাঁকা, পশ্চিম দিকে গাছ-গাছড়া। বাড়ীর পরই ফুল বাগান। অল্প কিছু গুল্মজাতীয় আর অধিকাংশই বৃক্ষজাতীয় ফুলের গাছ। করবী, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, গন্ধরাজ, রক্তজবা ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে গোলাপ, দোপাটী, গাঁদা আর পাতা বাহারের ঝাড়। এর পরই ফল বাগান। আম-জাম, বেল-বড়ই, ও তাল-কাঁঠালের বন। হরেক রকম দেশী ফলের সুনিবিড় বৃক্ষরাজী। সবশেষে বাঁশঝাড় ও বন। গুল্মলতা আর আগাছায় মিশে এই ফল বাগানটি এক হয়ে হারিয়ে গেছে গ্রামের একঘন বনের কাতারে। ফুল বাগান আর ফলবাগানের উত্তর দক্ষিণ ফাঁকা। ডহর ও মাঠ। সদর রাস্তা এড়িয়ে মাঠের এক কেনার ঘেঁষে পরীদের এই ফল বাগানে চুপি চুপি ঢুকে পড়লো লাল মিয়া।

আশে পাশে লোক বসতি না থাকায় ফুল বাগানটি নির্জন। ফল বাগাতনতো বটেই। পরীবানু প্রায়শঃই একা একা ঘুরে বেড়ায় ফুল বাগানে। নিঃসঙ্গ জীবনের

www.pathagar.com

অবসাদ বিমোচনে সে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, গান গায়। এটা তার নিত্যদিনের স্বভাব। সকলের তা জানা। তাই লুকোচুরির প্রয়োজন পরী বানুর ছিল না। পূর্বশর্ত অনুযায়ী বিকেল হতেই ফুল বাগানে চলে এলো পরীবানু। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর অজুহাতে সে লাল মিয়াকে খুঁজতে লাগলো সন্তর্পনে। অনেকক্ষণ খোঁজার পরও লাল মিয়ার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে হতাশায় ভেংগে পড়লো পরীবানু। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সে চুপ করে বসে রইলো বাগানের এক প্রান্তে।

বসন্তের আগমনে ফুল বাগানটি উৎফুল্ল। ঘন কচি পল্লবের নতুন সমারোহ। ফুল ফুটেছে হরেক রকম। শুরু হয়েছে মৌমাছির আনাগোনা, কোকিলের কুহু আর ভ্রমরের গুঞ্জন। পাতায় পাতায় ভিড় করেছে প্রজাপতি। শাখায় শাখায় বিহঙ্গ। রং-বেরংয়ের বিহঙ্গ। দোয়েল-কোয়েল, ময়না-টিয়া, ঘুঘু-শালিক, বাবুই-চড়ুই, বক। বাগানের অপর প্রান্তে জোড়া জোড়া ময়ুর। তারা পাখনা মেলে নৃত্য করছে আনন্দে। তাদের পাশেই পারাবত। ঝাঁক-ঝাঁক, জোড়া-জোড়া। তারা নীল আকাশে বাজী খেলছে উড়ে উড়ে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে পরীবানু। নাচ দেখছে ময়ূরের, খেলা দেখছে কপোতের, গান শুনছে বিহঙ্গের। ময়ূর আর ময়ূরী। কপোত আর কপোতী। বিহঙ্গ আর বিহঙ্গী। নর-নারী। জোড়া-জোড়া। একা শুধু পরীবানু। সেই শুধু বেজোড়।

অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো পরীবানু। তার সারা অঙ্গে যৌবনের প্লাবন। নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বিষহ ভারে সে দিশেহারা। বাড়ন্ত লতার মতো অবলম্বন চাই তার। বিহগীর মতো বিহগের বুকে মুখ লুকানোর সাধ তারও অন্তরে। সংযম ভেঙ্গে গেল পরীবানুর। সে আপন মনে গেয়ে উঠলো আবেগেঃ

"ফুল বাগানে ময়ুর খেলে হায়রে-
ময়ূর জোড়া জোড়া।
(ওরে) আমার জোড়া দেয়নি বিধিরে
(আল্লাহ্) আমার কপাল পোড়ারে-
দারুণ বিধিরে।'
ফুলের সাথী ভোমরা-অলি হায়রে-
রতের সাথী দিন।
(ওরে) আমার সাথী দেয়নি বিধিরে
(আল্লাহ্) আমার কপাল হীন
ওরে দারুণ বিধিরে।"

গানের সুর কানে পড়তেই পরীবানুর সন্ধান পেলো লাল মিয়া। সে চুপি চুপি এসে পরীবানুর পেছনে এক ঝোপের পাশে দাঁড়ালো। গান শেষ হতেই সে চাপা-কণ্ঠে বললো- "চমৎকার।"

চমকে উঠলো পরীবানু। পেছন ফিরে লাল মিয়াকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠলো

www.pathagar.com

উল্লাসে। স্থান কাল ভুলে গিয়ে সে আবেগে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো-"ওম্মা! তুমি ! কখন এলে?"

তর্জনী আঙ্গুল মুখে দিয়ে পরীবানুকে থামিয়ে দিলো লাল মিয়া। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে নীরব হলো তখনই এবং ছুটে এলো লাল মিয়ার সান্নিদ্ধে। পাশে এসে দাঁড়াতেই পরীবানুর হাত একখানা হাতের মধ্যে তুলে নিলো লাল মিয়া। থর থর করে কেঁপে উঠলো পরীবানু। মৃদু কম্পন লাল মিয়ারও অন্তরে। সচকিত দৃষ্টি দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো উভয়েই। স্থানটি বড়ই ফাঁকা ফাঁকা। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো। পরীবানুর হাত ধরে মৃদু একটা টান দিলো লাল মিয়া। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে রওনা হলো তারা ফল বাগানের ভিতর দিয়ে অরণ্যের এক গভীরতম স্থানে এসে হাজির হলো দুজন। লতা পাতার আড়ালে উঁচু একটা টিপির উপর বসে পড়লো পাশাপালি। পরীবানুর হাত তখনও লাল মিয়ার হাতে। থর থর করে তখনও কাঁপতেই আছে পরীবানু। লাল মিয়ার কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম। তারও হাত পরীবানুর হাতখানা সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারছেনা। প্রবলবেগে না হলেও মৃদু মৃদু কাঁপতেই আছে অবিরাম। তবু সে পুরুষ মানুষ। পরীবানু মেয়ে। পুরুষোচিত অভয় দানের তাকিদেই সে পরীবানুকে বললো- "ভয় পেয়েছো?"

চোখ তুললো পরীবানু। মৃদুকণ্ঠে বললো- "না।"

লালমিয়া ফের প্রশ্ন করলো- "এত কাঁপছো যে?"

এবার স্মিতহাস্যে চোখ দুটি নামিয়ে নিলো

পরীবানু। লজ্জাবনত মস্তকে সে মাটির দিকে চেয়ে রইলো নীরবে।

হাতে একটা নাড়া দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলো লালমিয়া-"চুপ করে রইলে কেন? কথা বলো?"

পরীবানু আস্তে আস্তে চোখ তুললো আবার। বললো-"শরম লাগে না বুঝি।"

- শরম! শরম কিসের ? আমি তুমি ছাড়া আর কে আছে এখানে?

- তুমি কাঁপছো কেন?

আলতোভাবে চেয়ে মুখটিপে হাসতে লাগলো পরীবানু। লজ্জিত হলো লাল মিয়া। ইতস্ততঃ করে বললো- "আমি? কৈ?"

- এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি।

ধরা হাতে নাড়া দিয়ে ইঙ্গিত দিলো পরীবানু। হাত খানি তার দুই হাতে আরো অধিক শক্ত করে চেপে ধরলো লাল মিয়া। এই চরম সত্যের মুখে সে আর জবাব খুঁজে পেলো না। লাল মিয়াকে নীরব দেখে পরীবানু ফের বললো- "পুরুষ মানুষ তুমি। তোমার আবার ভয় কি?"

সত্যটা এবার লাল মিয়াকে স্বীকার করতেই হলো। বললো-" না, মানে- , এমন নিরালায় আগেতো কখনও কথা বলিনি কোন মেয়ে সাথে, তাই।"

এবার পরীবানুর ইচ্ছে হলো, এর জবাবে সেও বলে- আমিই কি এর আগে এমন ভাবে কথা বলেছি কোন পুরুষের সাথে? কিন্তু শরমে সে তা পারলো না। আস্তে

www.pathagar.com

আস্তে হাত খানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো-"কারো সাথেই না?"

লাল মিয়া এবার অল্প একটু হাসলো। বললো-কার সাথে বলবো বলো? তোমার মতো আমাকেও যে সাথী দেয়নি বিধাতা!"

- তুমি ব্যাটা ছেলে। নিজেই নিজের মালীক। দেখে শুনে একটা বিয়ে করলেই তো সাথী পেতে এতদিন। তোমার আবার ভাবনা কি?
- বিয়ে করলেই কি সবাই সবার সাথী পায় সব সময়?
- পায় না?
- কেমন করে পাবে বলো? যাকে যার মনে ধরে, তাকে যদি না পায়, অন্যে তার সাথী হবে কেমন করে?
- মনে-ধরা লোক বুঝি আছে কেউ?
- আছেই তো।
- কে সে?
- এই তো আমার পাশেই।
- আবার তার হাত খানা হাতের মধ্যে টেনে নিলো লাল মিয়া। পরীবানু খুশী হয়ে বললো- "সত্যি?"
- তো আর কি এমনি এত পথে পথে ঘুরছি?

পরীবানুর চোখের উপর চোখ রেখে উত্তর দিলো লাল মিয়া। তৃপ্তিতে ভিজে গেল পরীবানুর মন। তার চোখ দুটো বুজে এলো ধীরে ধীরে। অর্ধোন্মেলিত নয়নে সে বললো-"আমার সাথে তোমার তো অল্পদিনের পরিচয়। মাস কয়েকের ঘটনা। এর আগে মনেধরোনি কাউকে?"

পরীবানুর চিবুক খানা উঁচিয়ে ধরে লাল মিয়া বললো-" কাউকে না। তুমি ছাড়া আর একজনকেও মনে ধরেনি এর আগে। তবে-"

হঠাৎই এহ 'তবে'টা বলে ফেললো লাল মিয়া। আর এই 'তবে'টা কানে যেতেই চমকে উঠলো পরীবানু। বিস্ফারিত নেত্রে লাল মিয়ার মুখের দিকে চেয়ে, সে বললো-"তবে ? "

বাক হারিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো লাল মিয়া। মন তার চলে গেল কয়েক বছর পেছনে। চলে গেল তাদের গাঁয়ের পৌষ পার্বনের মেলায়। ইমাম যাত্রার গান হচ্ছে আসরে। যুদ্ধ চলছে অবিরাম। বটগাছের ঢিঁপির উপর দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোরী। এমনই সেই মুখ, এমনই সেই টানা টানা চোখ দুটো, এই রকমই খোদাই করা ঠোঁট দুটি। সেদিনও তার মনে ধরেছে সেই কিশোরীকে। তার জন্যেও পথে পথে কম ঘুরেনি লাল মিয়া। এতবড় সত্যটা সে এড়িয়ে যায় কেমন করে?

লাল মিয়াকে নীরব দেখে তাকে নাড়া দিলো পরীবানু। বললো-"তবে কি? থামলে যে?"

তবুও কোন সাড়া নেই লাল মিয়ার। সে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো পরীবানুর মুখের দিকে। নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো তার চোখ, মুখ আর অবয়ব। অবাক হলো

www.pathagar.com

পরীবানু। বললো-"কি ব্যাপার? কি হলো? আমার মুখের দিকে কি দেখছো অমন করে?"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো লাল মিয়া প্রশ্ন করলো- "আচ্ছা, তুমি কি কখনও মেলা দেখতে গিয়েছিলে আমাদের গাঁয়ে ? মানে- অল্প একটু বড় হয়ে ?"

- এ কথা বলছো কেন?
- বলোনা, গিয়েছিলে কি কোন দিন?
- কৈ আর গেলাম।
- এ্যাঁ !! যাওনি? ও !
- গিয়েছিলাম। একবার মাওর গিয়েছিলাম। তাও সাত-আট বছর আগে!
- সত্যিই?
- হ্যাঁ পৌষ পার্বনের মেলায়। মতিজানের সাথে ঐ একবারই যাই সেখানে।
- পৌষ পার্বনের?
- পৌষ পার্বনের। মানে, ঐ যে ইমাম হোসেনের না কি সের গান হলো, সেবার। সেও এক মজার ব্যাপার! সে কি যুদ্ধ হলো আসরে। বাঁশের না কিসের তলোয়ার দিয়ে দুইজনে যুদ্ধ শুরু করলো তো করলোই। তলোয়ার দুটো থেঁতলে গেলা, আসর থেকে লোকজন উঠে যাওয়া শুরু করলো, তবু যুদ্ধ থামেনা। উঃ! কি যে বিরক্ত লেগেছিল তখন! মানে ঐ একবারই যাই।
- বটগাছের তলায় বুঝি দাঁড়িয়েছিলে তুমি?
- হ্যাঁ।
- একটা উঁচু মাটির ঢিপির উপর?
- হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো ছিলাম। তুমি কি করে জানলে?
- তোমার বয়সী আরো কি কয়জন মেয়েছিল তোমার পাশে দাঁড়িয়ে? ঐ ঢিপির উপরই তোমাদের পাশে কি অনেক বয়সী মেয়েরাও বসেছিল?
- সে কি! এসব কথা তুমি জানলে কি করে? সে তো অনেক দিনের কথা। আমিই প্রায় ভুলে গেছি ওসব।
- ভুলে গেছো!
- একটু একটু মনে হয়। ঐ ঢিপি থেকে আমরা সরে একটু ফাঁকে আসতেই হৈ হৈ করে দাঁড়িয়ে গেলো গানের আসরের লোকজন। মতিজান আমাকে ধমক দিয়ে বললো- তাড়াতাড়ি চল্ ছুঁড়ি, গান ভেঙ্গে গেছে। রাস্তায় খুব ভিড় হবে। সেই যে কি ছুটতে ছুটতে এলাম!

নিশ্চিত হওয়ার আনন্দে বিহ্বল হলো লাল মিয়া। ভুল করেনি চোখ তার। লাল মিয়া এবার আপ্লুতকণ্ঠে বললো-" ঐ 'তবে'র উত্তর এইটা। ঐ মেয়েকেও ঐ ছেলে বেলায় মনে ধরেছিল আমার। গান ভাঙ্গতেই ছুটে গেলাম বটতলায়। গেলাম ঐ ঢিপির উপর। কিন্তু খুঁজে আর পেলাম না। এরপর অনেকদিন মেলা বাজারে কত খোঁজ করলাম, কিন্তু পেলাম না তো পেলামই না। বড় হয়ে আজ যাকে মনে ধরলো আবার, এখন দেখছি, ঐ মেয়েই এই মেয়ে। দ্বিতীয় কেউ নয়। মন আমার বেইমানী করেনি।

www.pathagar.com

তন্ময় হয়ে লাল মিয়ার মুখের দিকে চেয়ে ছিল পরীবানু। অভিভূত হয়ে সে লাল মিয়ার বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। লাল মিয়া থামতেই সে বিহ্বল কণ্ঠে চীৎকার করে বললো- "সে কি!"

দুই হাতে পরীবানুর দুই হাত ধরে লাল মিয়া বললো-" হ্যাঁ, তাই। তুমিই আমার একমাত্র মনে ধরা মেয়ে। ছোটকালেও তোমারই জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে দিনরাত। আজ আমার মনোবাঞ্ছা ষোল আনায় পূরণ করেছে আল্লাহ।

অসফুট কণ্ঠে একবার শুধু 'লাল' বলে ডেকে লালের বুকে মাথা রাখলো পরীবানু।

খানিক পরেই কিসের একটা শব্দ হলো দূরে। সচকিত হয়ে উঠলো উভয়েই। এদিক ওদিক চেয়ে কোন কিছুই না দেখে পরীবানু বললো- "এতই যদি মনে ধরলো আমাকে, তাহলে বাপজানের কাছে এতদিন ঘটক পাঠাওনি কেন?"

লাল মিয়া এর জবাবে হাসিমুখে বললো-" তা কি করে হয়? তোমাকে আমার মনে ধরেছে ঠিক, কিন্তু আমাকে তোমার মনে ধরবে কিনা তা না জেনে ঘটক পাঠিয়ে লাভ কি? এক তরফা ভাল লাগার কি দাম আছে কিছু?"

পরীবানুও হাসিমুখে বললো," এবার তাহলে পাঠাও।"

- তুমি বললেই পাঠাবো।
- আমিই তো বলছি।
- আমাকে তো সত্যি সত্যিই মনে ধরেছে তোমার?
- এটাও আবার বলতে হবে?
- তবু আমি শুনতে চাই।

লালের বুকে পুনরায় মুখ লুকালো পরীবানু। মুখ লুকিয়ে বললো- "হুঁউ।"

- মত পাল্টাবেনা তো?
- না, না, না। তিন সত্যি করলাম। হলো তো?

একটু পরেই আবার সেই শব্দ। এবার তা দূরে নয় নিকটে। মৃদু নয়, প্রকট। সড় সড়- মড় মড়- সড়াৎ! বিপুল বেগে চমকে উঠলো উভয়েই। উভয়েই লাফিয়ে উঠলো ভয়ে। সন্ত্রস্ত নয়নে চাইতে লাগলো এদিক ওদিক। সড়- সড় শব্দ হচ্ছে পেছনের ঝোপের ভেতর। যেন ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে চুড়ে এগিয়ে আসছে অনেক লোক। আঁতকে উঠে প্রস্থান উদ্যোগ করতেই তারা এক ফাঁকে দেখতে পেলো- মানুষ নয়, গরু। ঝোপের মধ্যে গরু ঢুকে লতাপাতা টেনে টেনে খাচ্ছে। লতার বাঁধন মুক্ত হয়ে ডালপালা মাথা তুলছে সশব্দে।

এতক্ষণে দম সরলো তাদের। এটা লক্ষ্য করে খানিকটা সশব্দেই হেসে উঠলো দু'জনই। নিশ্চিন্ত হয়ে পরীবানু বললো-" বাব্বা! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম! ভাবলাম, নির্ঘাত টের পেয়েছে কেউ!"

লাল মিয়াও হাসি মুখে বললো- "হ্যাঁ, লোক হলেই তো বিপদ। বাঘ-ভাল্লুক বা ভূত প্রেতে ডরাই না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ওদের চেয়েও বড় দুষমন মানুষ।"

বেলা তখন গড়িয়ে গেছে একেবারেই। তা লক্ষ্য করে পরীবানু বললো- "চলো।

www.pathagar.com

এবার যাই। বাড়ী থেকে বেরিয়েছি অনেকক্ষণ আগে। কেউ খোঁজ করলে বিপদ হবে।"

লাল মিয়ারও তাড়া ছিল? খেলার কথা মনে পড়তেই চঞ্চল হলো সেও। বললো- "হ্যাঁ, চলো। কিন্তু-"

- কিন্তু কি?
- এই কি শেষ সাক্ষাৎ আমাদের? মানে, তোমার সাথে কি আর কখনো-
- আর কখনো মানে? আমি তো আমাদের ফুল বাগানে প্রতিদিনই আসি। আজকের মতো তুমি এসে ইঙ্গিত দিলেই দেখা হবে দৈনিক। আসতে পারবে না তুমি?
- খুব পারবো। দিনে রাতে যখনই বলো- তখনই এসে হাজির হবো।
- দাওয়াত পেয়েছো বাপজানের?
- পেয়েছি।
- আজ রাতে থাকবে তো আমাদের বাড়ীতে?
- থাকবো।
- ব্যস! ওখানেই আমি দেখা করবো আবার। এখন চলো।
- চলো

সূর্য্যাস্তের পরে পরেই তরফদার সাহেবের বৈঠকখানা ভরে গেল লোকে। আশপাশের সকলকেই দাওয়াত করেছেন তরফদার। দাওয়াত করেছেন গরীব-দুঃখী-কাঙালীকে। সন্ধ্যের পরেই তারা এসে হাজির হলো একে একে। ডেক্‌চি ডেক্‌চি শিরনী নামছে চুলা থেকে। বাহির আঙ্গিনার এক কোণে লম্বা করে কাটা হয়েছে চুলা। পাঁচ ছয়টা ডেক্‌চি এক সাথে চুলার উপর ফুটুছে। চুলার দুই পাশে ভিড় করে কাজ করছে বহুলোক। দাওয়াতিরা ভিড় করছে আঙ্গিনায় আর বৈঠক খানায়। দেখতে দেখতে ভরে গেল বাড়ীর বাইরের ঘরগুলো। বাহির আঙ্গিনার ঘরগুলো ভর্তিহলো মানীগুনী আর ময়-মুরুব্বীলোকে। বাহির বাড়ীর আঙ্গিনাটাও পূর্ণ হলো বাচ্চা-কাচ্চা- ফকির-মিস্‌কীন আর রবাহুতের ভিড়ে। বাড়ী নীচেও হল্লা করছে শিরনীকামী আগন্তুকেরা। কোন ঘরে আর স্থান-সংকুলান না হওয়ায় অন্দরের সাথে সংলগ্ন এক ঘরে এনে লাল মিয়াদের স্থান দিলেন তরফদার সাহেব।

খেলার মাঝেই পৌছে যায় লাল মিয়া। কিন্তু তাকে ধরতেই হয় না লাঠি। সমজান-বছির বাহারের আক্রমনই সামলাতে কেউ পারে না। নিরঙ্কুশভাবে জিতে যায় লাল মিয়ার দল। তরফদারের তারিফ আর দর্শককুলের উল্লাসে মুখর হয়ে দশ দিক। লাল মিয়াদের আর এক দফা আমন্ত্রণ জানিয়ে মেলা ভাঙ্গার আগেই বাড়ীতে

www.pathagar.com

ফিরে আসেন তরফদার সাহেব।

সন্ধ্যের পর লাল মিয়ারা পৌঁছতেই হৃষ্টচিত্তে ছুটে এলেন তরফদার সাহেব স্বয়ং। তিনি নিজেই এদের অভর্থনা জানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অন্দরের পাশে। সমাদরে স্থান দিলেন এই অন্দর সংলগ্ন ঘরটিতে। ঘরটির দুই দিকে দুই দরজা। একটি অন্দরমুখী, অপরটি বহির্মুখী। না-অন্দর না-বাইরের লোক যারা, সচারাচর তাঁরাই এসে থাকেন এই ঘরটায়।

অতিথিদের আপপায়নে পাইক পেয়াদা ছাড়াও আরো অনেক লোককে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের তদারকীর ভার পড়েছে মিয়াজান মিয়ার উপর। কিন্তু মিয়াজান মিয়ার লেশমাত্র আগ্রহ নেই কর্তব্যে। মাঝে মধ্যে তরফদার সাহেবের সামনে এসে তিনি ভাণ করছেন ব্যস্ততার। পেছনে এসে ফোড়ন কাটছেন বসে বসে। কোথায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হচ্ছে না-হচ্ছে- সেদিকে তিনি ভুলেও নজর দিতে যাচ্ছে না। অযথা এই ঝামেলা বৃদ্ধির কারণে তিনি না খোশ ছিলেন আগে থেকেই। লাল মিয়াদের আসা দেখে মনটা তাঁর বিষিয়ে গেল পুরোপুরি। ফলে, সন্ধ্যের পর তরফদার সাহেব যে পরিমাণ ব্যস্ত হলেন অতিথিদের সামলাতে, নায়েব সাহেব তার চেয়েও দশগুণে, ব্যস্ত হলেন লাল মিয়াদের সামলাতে। আর তিনি আড়ালে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। কখন কি ঘটে তা কে বলতে পারে? এমনিতেই লাল মিয়ার উপর মাত্রাধিক টান পড়েছে তরফদারের। তার উপর আবার হঠাৎ যদি চোখাচোখ হয়ে যায় লাল মিয়া আর পরীবানুর, তাহলে আর রক্ষে নেই। একটা লটোঘটো বেধে যাওয়া একটুও বিচিত্র নয়। হারামজাদার চেহারাটা তো সর্বনেশে!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে মিয়াজান মিয়া ব্যস্ত হয়ে লাল মিয়াদের সন্ধান করে ফিরছিলেন। এঘর থেকে ওঘরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখছিলেন। এমনই সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো আছিরুদ্দীন পেয়াদা। সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো- "হুজুর, মস্তবড় মুসিবত! যত লোক জুটেছে, তাতে আরো কমসে কম চার পাঁচ মন চালের দরকার আতপ চাল সব শেষ। খোঁজ করেও এত আতপচাল আর পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও এখন উপায়?"

নায়েব সাহেব রুক্ষ্মকণ্ঠে জবাব দিলেন-"আমি কি জানি তার? প্রতি বছর যে পরিমান লোক হয়, সেই পরিমান চাউলই যোগাড় করে রাখা ছিল। ওতে যদি না কুলোয় তো আমি কি করবো? এই রাত্রিকালে আকাশ থেকে আনবো? এ্যাহ্! পাঁচজনকে দাওয়াত করার জায়গায় পাঁচহাজারকে দাওয়াত করা হয়েছে। এখন যে ভাবে পারো, সামলাওগে তোমরা। আমি ওসব জানিনে।"

তিনি হন হন করে সরে এলেন ওখান থেকে। ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে আড়ালে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন হুকুম উদ্দীনকে। হুকুমউদ্দীনের দুই হাতে দুই মাটির বদনা। সে ব্যস্ত হয়ে লোকজনের দিকে এগুচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই নায়েব সাহেব ডাক দিলেন-"হুকুম উদ্দীন -এই হুকুম উদ্দীন-।"

ডাক শুনে হুকুমউদ্দীন সামনে এসে দাঁড়াতেই নায়েব সাহেব বললেন-"কোথায়

www.pathagar.com

থাকো? আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আর কোথায় গিয়ে থাকো তুমি?"

নিজের কর্মতৎপরতা জাহির করার উদ্দেশ্যে হাতের বদনা দু'টি তুলে ধরলো হুকুম উদ্দীন। হাসতে হাসতে বললো- "ঐ দিকে বাপজান! লোক জনের ভিড় জমেছে খুব। আমি ওদের হাত-পা ধোয়ার পানি দিচ্ছি।"

জ্বলে উঠলো নায়েব সাহেবের সর্বাঙ্গ। তিনি সগর্জনে বললেন-"কি? কি বললে? পানি দিচ্ছো হাত-পা ধোয়ার? অপদার্থ আহম্মক। যারা হাত পা ধোয়ার পানি দেবে তোমাকে, তুমি গেছো তাদের পানি বয়ে দিতে? উল্লুক কি আর গাছে ধরে? এই জন্যেই তো তোমাকে সবাই গোমুখ্যু আর নাদান বলে? ফেলো, ফেলে দাও বদনা পগারে।"

বলেই তিনি লাথি মারলেন হুকুম উদ্দীনের হাতের একটা বদনাতে। হাত থেকে ছিটকে গেল বদনাটা। মাটিতে পড়ে ভেংগে গেল চুরমার হয়ে। চমকে উঠে কাঁপতে লাগলো হুকুম উদ্দীন। অপর বদনাটিও তার হাত থেকে পড়ে গেল আপ্‌সে-আপ্। ভেংগে গেল অমনিভাবে। তেমন কিছুই হুকুম উদ্দীন বুঝে উঠতে পারলো না। সে থতমত করে বললো-"তা- মানে-"।

নায়েব সাহেব দাঁত খিঁচিয়ে বললেন-"ওসব মানেটানে রাখো। লাল মিয়ারা কোথায়? লাল মিয়া? ওদের উপর নজর টজর রাখছোনা, না শুধু ঐ পাইট কেষানের পা ধোয়ায়ে বেড়াচ্ছো?"

এবার হুকুম বুঝতে পারলো তার বাপের রাগের কারণ। সে বুঝলো-গাঁয়ের ঐ সব চাষা ভুষার তয়-তদবির না করে লাল মিয়াদের তয় তদবির করাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এটা করতে না দেখেই রেগেছেন তার বাপ। এই তথ্য বুঝতে পেরেই হেসে ফেললো হুকুম উদ্দীন। হাসতে হাসতে বললো-"হে-হে। আমি কি বুঝিনা বাপজান যে, কোন কাজটা আগে করার দরকার? ঐ লাল মিয়াদের নিয়ে কোন চিন্তানাই। ওদের তো একদম অন্দর মহলের পাশের ঘরে জায়গা দিয়েছেন তরফদার সাহেব। পরীবানু নিজেই ওদের তয় তদবিরে লেগে গেছে। ও নিয়ে আর ভাবতে হবে না কাউকে।"

বাজ পড়লো মিয়াজান মিয়ার মাথায়। এ কথা কানে যেতেই তিনি হারিয়ে ফেললেন সম্বিত। হতবুদ্ধি হয়ে তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন- 'অন্দর মহলের পাশের ঘরে জায়গা দিয়েছে ওদের! পরীবানু নিজেই ওদের তয় তদবিরে লেগে গেছে।"

হুকুমউদ্দীন জোর দিয়ে বললো-"হ্যাঁ বাপজান! লাল মিয়াদের গান শুনে পরীবানু এমন মজে গেছে যে, দাস-দাসী নিয়ে সে নিজেই ওদের সেবাযত্মে লেগে গেছে।"

নায়েব সাহেব ঐ একইভাবে বললেন- "লাল মিয়াদের গান শুনেছে পরীবানু।"

হুকুমউদ্দীন প্রত্যয়ের সাথে বললো- শুনেছে মানে? কয়েকবার শুনেছে। সোনাপীরের গান, মর্শিয়া গান ঐ লাল মিয়ারা ওকে কয়েকবার গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছে। আমি নিজেই জানিতো।"

হুঁশ হলো মিয়াজান মিয়ার। মর্শিয়া গানের জন্যে লাল মিয়াদের ডেকে পাঠানোর

www.pathagar.com

খবর তার কানেও গিয়েছিল। সে কথা তাঁর খেয়াল ছিল না এতক্ষণ। এবার তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন- "বলো কি। যাও- যাও, শিগিগর যাও। কোন কিছুই করতে হবে না তোমাকে। তুমি শুধু ঐ লাল মিয়াদের উপর নজর রাখো সব সময়।"

এ নির্দ্দেশটা নিতান্তই নিরর্থক বলে মনে হলো হুকুম উদ্দীনের কাছে। সে আপত্তি করে বললো-"আমি আর কি নজর রাখবো? বললামই তো, পরীবানুই সব কিছু করছে। কিছুই আর করতে হবে না কাউকে। খড়ম-পানি দেয়াও লাগবে না, বিছানা পেতে দেয়াও বাঁকী নাই। সব আগেই সারা।

দাউ দাউ করে আগুন ধরলো মিয়াজান মিয়ার মাথায়। এই অপদার্থ অপোগন্ডকে নিয়ে তিনি কি করবেন, তা ভেবে কোন কুল কিনারাই পেলেন না। একবার তাঁর ইচ্ছে হলো, এটাকে তিনি সাষ্টাঙ্গে আছাড় মারেন টুঁটি ধরে তুলে। অবেশেষে দাঁতের উপর দাঁত পিষে সক্রোধে বললেন- মারবো এক থাপ্পড়। গোমুখ্যু, না লায়েক, নাদান। আমি তোমাকে ঐ খড়ম পানি দেয়ার জন্যে নজর রাখতে বলছি?"

থাপপড় বাগিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলেন নায়েব। চমকে উঠে হুকুমউদ্দিন পিছিয়ে গেল কয়েকধাপ। বললো- "তবে?"

- ওরে গধর্ভ- গাঁড়োল, লাল মিয়ার সাথে পরীবানু কোন ফষ্টিনষ্টি লাগায় কিনা,সেদিকে একটু নজর রাখো। তেমন কিছু ঘটলে, তোমার মুখে ছাই দিয়ে ঐ লালের সাথেই চলে যাবে পরীবানু। তা গেলে ওর সাথে তোমার বিয়েও হবে না, জামিদারীও পাবে না। ঐ তেরাস্তায় বসে শুধু বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হবে।

- তাই নাকি!

- আজ্ঞে হ্যাঁ। যাও, তেমন কিছু দেখলেই আমাকে খবর দেবে। ওদের মধ্যে ভাব জমার আগেই সে পথ বন্ধ করতে হবে। বুঝতে পেরেছো কিছু?

- হ্যাঁ, পেরেছি। অন্যের সাথে ভাব হলে আর বিয়ে করে লাভ কি? আমি এখনই যাচ্ছি।

দ্রুত পদে চলে গেল হুকমউদ্দীন। নায়েব সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে স্বগতোক্তি করলেন- "উঃ! আবার তো একটা মস্তবড় ফ্যাসাদ হলো দেখছি!"

লাল মিয়ারা আসার পরই কর্ম-মুখর হয়ে উঠলো পরীবানু। লাল মিয়ারা আসবে আজ, সে কথা তার জানা। কিন্তু এমন হাতের মধ্যে আসবে তার, এতটা সে ভাবেনি। বাড়ীর মধ্যে কর্ত্রী বলতে পরীবানু নিজেই। কতৃত্ব সে কোন দিনই করে না। আজ তার বান ডেকেছে কতৃত্বের। দাস-দাসীদের নির্দ্দেশ দিচ্ছে অবিরাম- এটা আনো, ওটা করো, ওদিকে যাও-ইত্যাদি। এই নির্দেশ গুলির পনের আনাই লাল মিয়াদের সেবা যত্ন সম্পর্কিত, যে ঘরটায় স্থান হয়েছে লাল মিয়াদের, সেই ঘরের অন্দর মুখী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম করছে পরীবানু। লাল মিয়াদের পাখা-পানি-পান তামাক যোগান দিয়ে তা তামিল করছে দাস দাসীরা। লাল মিয়াও নড়ে সরে ঐ দরজার কাছে এ সেই পুনঃ পুনঃ দাঁড়াচ্ছে। তা লক্ষ্য করে দরজার আরো কাছে আসছে পরীবানু। রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেরে

www.pathagar.com

নিচ্ছে তারা। লাল মিয়ার সঙ্গীরা তা দেখেও না দেখার ভান করে ছেড়ে রেখেছে লালমিয়াকে। সম্পর্ক এদের গভীর হোক, এই তাদের কাম্য।

ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে অনেক কথাই উভয়ের মাঝে হলো। অনুরাগের এক পর্য্যায়ে লাল মিয়া প্রশ্ন করলো-"আজকেই তো?"

পরীবানু উত্তর দিলো-"হ্যা, আজকেই।"

- কখন?
- সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর।
- কোথায়?
- ঐ সেইখানে।

এর পর পরীবানু সরে এলো ফাঁকে। দরজার কাছে আর সে তেমন গেলই না। এ দিক ও দিক ঘুরে ঘুরে হয়রান হলো হুকুম উদ্দীন। বাইরে থেকে কোন কিছুরই সন্ধান সে পেলো না।

গভীর হলো রাত। মিটে গেল খাওয়া দাওয়া। পাতলা হলো ভিড়। শেষ হলো উৎসব। তরফদার বাড়ীর কর্মক্লান্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়লো একে একে। ঘুমিয়ে পড়লো পৃথিবী। স্তব্ধ হলো দশ দিক। শুধু জেগে রইলো দুইজন। লাল মিয়া আর পরীবানু। এ রাত তাদের ঘুমের নয়। এরাত তাদের জাগরণের। তারা চুপি চুপি বেরিয়ে এলো বাইরে। হাত ধরাধরি করে তারা হারিয়ে গেল অরণ্যের গভীরে। দশমীর চাঁদ তখন অরণ্যের ওপারে ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

[বার]

হালে আর এক সঙ্গী জুটেছে লাল মিয়ার। ঠিক সঙ্গী নয় ভক্ত। নাম আবেদ আলী। বিলবাথানের ছেলে। আবেদ আলীর বিষয়বিত্ত অনেকই। কিন্তু মানুষ খুবই কম। এক বউ আর এক ভাই। ভাইটেই তার সংসারে গরুর মতো খাটে। আবেদ আলী বাউরের মতো ঘুরে বেড়ায় সারা দিন। সভা-সমিতি, আচার-অনুষ্ঠান আর গান বাজনার প্রতি তার আকর্ষন দুর্বার। উঠা বসা করতে করতে এই আবেদ আলীও ভিড়ে গেছে লাল মিয়াদের দলে। লাল মিয়ার নামে এখন সে অজ্ঞান।

নাছোড়বান্দা আবেদ আলীর দাওয়াত রক্ষে করতে তার বাড়ীতে এসে হাজির হলো লাল মিয়া। এর আগেও একবার নাছোড়-বান্দা দাওয়াত ছিল আবেদ আলীর। লাল মিয়া তা রক্ষে করতে পারেনি। সে দিনও এক অনুষ্ঠান ছিল আবেদ আলীর বাড়ীতে। মুস্কিল বিবির মানত সুজার (পালন করার) অনুষ্ঠান। মুস্কিল বিবি আর এক পীরানী (মহিলাপীর) যে মুস্কিল থেকে উদ্ধার করে মানুষকে। বাচ্চা আসে আবেদ আলীর স্ত্রীর পেটে। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী গর্ভবর্তী হওয়ায় যেমনই আনন্দিত হয়ে উঠে আবেদ আলী, তেমনই শংকিত হয়ে উঠে সে। একে প্রথম পোয়াতী, তার উপর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে শরীর। বাচ্চা হওয়ার সময় কি যে হয়, কে

www.pathagar.com

জানে। শংকিত ছিল আবেদ আলীর শাশুড়িও। শংকা তাদের বাস্তব হয়ে দেখা দিলো সন্তান প্রসবের সময়। প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পরে গোটা একটা রাত ও একটা দিন কেটে যাচ্ছে তবু সন্তান ভূমিষ্ট হচ্ছে না। কাতরাতে কাতরাতে ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছে আবেদ আলীর স্ত্রী। তা দেখে আশ পড়শী মহিলারা আবেদ আলীর শাশুড়িকে প্রশ্ন করলো-মুস্কিল বিবির কাছে মানত টানত কিছু করেছেন কি?

খেয়াল হতেই আবেদ আলীর শ্বাশুড়ি সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো- নাতো। তা তো করা হয়নি।

পড়শীরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো- হায় হায়, করেছেন কি! এখনও সে মানতটা করেননি? কথায় বলে, "প্যাটেত্ ছাওয়াল, দুয়ারেত্ যম। তার উপর মেয়ে আপনার পয়লা পোয়াতী। যম তো তার পেছনে পেছনেই ঘুরছে। মুস্কিল বিবির কাছে মানতটা করা থাকলে কি বাচ্চা হতে এত দেরী হয়? অনেক আগেই মুস্কিল আসান হয়ে যেতো।

এইটেই এই পাড়া গাঁয়ের মেয়েদের বিশ্বাস। কোন মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পরেই শতকরা প্রায় আশি ভাগ মহিলারা এ মানত আগে ভাগেই করে রাখে। মুস্কিল বিবির দয়া ছাড়া গর্ভবতীকে বাঁচানোর আর কোন পথই তাদের কাছে নেই। মুস্কিল বিবির সুনজরই তাদের একমাত্র অবলম্বন।

এতে এদের দোষ দেয়ার কিছু নেই। কোন হাসপাতাল বা পাশ করা বড় ডাক্তার অনেক শহরেই খোঁজ করে পাওয়া যেতোনা সে সময়। অজ পাড়াগাঁয়ে এ সবের কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না কারো। ঝাড়া ফুঁক আর পানি পড়ার সাথে মুস্কিল বিবির কাছে মানত করাই ছিল তাদের সর্বশেষ অবলম্বন।

পড়শীদের কথায় আবেদ আলীর শাশুড়ি সঙ্গে সঙ্গে মানত করে মুস্কিল বিবির কাছে। এর পরে, মুস্কিল বিবির দয়াতেই হোক আর নসীবের জোরেই হোক, আরো এক বেলা কাত্রানীর পর একটা মৃত সন্তান প্রসব করে প্রসূতি। সন্তান মৃত হলেও মুস্কিল বিবির দয়ায় প্রসূতি যে প্রাণে বেঁচে গেছে, এই নিয়েই তুষ্ট হয় সকলে আর কিছু দিন পরেই সাড়ম্বরে পালন করে সেই মানত। মানত পালনের ধরণটাও অভিনব। আতপ চাল পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর গুড আর জীনকলা দিয়ে সেই চাল মাখিয়ে হাতে হাতে বিতরণ করে খাওয়ানোর নাম মুস্কিল বিবি সুজা। অর্থাৎ, সুস্কিল বিবির মানত পালন করা। অবশ্য গোছল করে এসে ভিজে চুলে চাউল মাখা নো কলার পাতায় ভাগ করা প্রভৃতি কিছু মেয়েলী আচার- অনুষ্ঠান এর সাথে আছে। এই মাখানো চাউলের গ্রহিতারা অধিকাংশই বাচ্চা কাচ্চা ও পড়শী মহিলারা। এর সাথে অনেকেই অনেককে দাওয়াত করে মধ্যাহ্ন ভোজনে, যা বেশ আয়োজন করেই করা হয়।

এমনই দাওয়াত নিয়ে আবেদ আলী লাল মিয়ার কাছে আসে। কিন্তু সেবার সে দাওয়াত রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি লাল মিয়া। এবার লাল মিয়া এসেছে আবেদ আলীর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে। এটি "মুট" রাখা অনুষ্ঠান। নতুন বছরের সর্ব প্রথম জমিতে ধানের বিছন ছিটানোর আগে কয়েক মুট বিছন ধান আগের দিন

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক পাত্রে রাখা হয় এবং পরের দিন সেই বিছন আনুষ্ঠানিকভাবে জমিতে ছিটানোর পর লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হয়। এই অনুষ্ঠানে লাল মিয়াকে দাওয়াত করেছে আবেদ আলী। বিশেষভাবে অনুরোধ করে এসেছে। মুট রাখার যাবতীয় করণীয় পালন করছে আবেদ আলীর ছোটভাই। সে মাঠে আছে পাইট কির্ষাণ নিয়ে। আবেদ আলী বাড়ীতে আছে লোকজনকে খাওয়ানোর যোগাড় যন্তর করার কাজে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা রাতে। দাওয়াতীদের আগমন ঘটবে নৈশ ভোজনে।

এই দাওয়াত রক্ষে করতে সকাল সকাল চলে এলো লালমিয়া। আবেদ আলীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা নাস্তা খাওয়ার ওয়াক্তেই আবেদ আলীর বাড়ীতে এসে হাজির হলো সে। লাল মিয়াকে দেখেই আনন্দে নেচে উঠলো আবেদ আলী। ওস্তাদ তার সত্যি সত্যিই দাওয়াত রক্ষায় এলো দেখে তার খুশীর অবধি রইলোনা। ওস্তাদকে সমাদরে নাস্তাপানী খাইয়ে রেখে সে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো মাংস মিষ্টির সন্ধানে। অন্যান্য লোকজনদের খাওয়ানো হবে সাধারণ খানা। মাছ-ভাত, ডাল-টক ইত্যাদি। সেরেফ এগুলো তো দেয়া যাবেনা ওস্তাদকে। তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা চাই। মাংস-মিষ্টি-দই, এ সমস্ত থাকতে হবে জরুর। আগেই সে এসব ব্যবস্থা করে রাখতে পারতো। কিন্তু লাল মিয়ার আসা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকায় এবার আর আগেই এসব যোগাড় করতে যায়নি গতবারে অনেক আয়োজন করেছিল আবেদ আলী। অনেক পয়সা খরচ করেছিল। কিন্তু লাল মিয়া না আসায়, সব পণ্ড হয়ে গেছে। অনেকের অনেক উপহাসও সইতে হয়েছে এনিয়ে। তাই, এবার আর সে বেয়াকুফী করতে যায়নি সে। উস্তাদ এবার সত্যি সত্যিই এলো দেখে আবেদ আলী বেরিয়ে পড়লো সানন্দে।

আবেদ আলীর বৈঠকখানা অল্প একটু ফাঁকে। মূল বাড়ীর বাইরে। সেই বৈঠকখানায় একা একা শুয়ে রইলো লাল মিয়া। শুয়ে শুয়ে তন্দ্রাভাব আসতেই দুমদাম করে ঘরে ঢুকলো পুল্প। হারু সাঁতালের নাতনী পুল্প। লাল মিয়াকে দেখেই সে বলে উঠলো হেই বাবু, তু এখানে আছিস্ বটেক। হামি তুর মাকান-উকান ঢুর ঢাঁর করি, হয়রান।

পুল্পকে দেখে অবাক হলো লাল মিয়া। পুল্প অনেক বারই তার বাড়ীতে গিয়েছে। সেবার অসুখের সময় হারুর সাথে সেও দৈনিক এসেছে। একা একাও এসে সে সেবাশুশ্রুষা করে, ফায়ফরমাস খেটেছে। মাঝে মধ্যে এখনও সে তার বাড়ীতে আসে। এটা কিছু বিচিত্র নয়। হারু সাঁতালের প্রিয় লোক এই লালমিয়া, সেই সুবাদে পুল্পেরও খানিক দরদ আছে তার উপর। কিন্তু আজ হঠাৎ এখানে এসে হাজির হওয়া দেখে বিস্মিত হলো লাল মিয়া। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়। বললো- "আরে পুল্প! তুমি! কি ব্যাপার?"

ব্যস্তকণ্ঠে পুল্প বললো- "তুর জন্যে বাবু। তু হামার সাথে আখুনি চলি আয়। জব্বোর কাম পড়ি গেইঁচে।"

www.pathagar.com

- কাম?
- হঁ। উ মোহন্ত তার লাত জামাইয়ের সাথে কেচাল বাধাই দিচেক। জব্বোর কেচাল। লাত জামাইরে উ খুন করি দিবেক বটে।
- খুন!
- কেন, মোহন্ত এত ক্ষেপলো কেন?
- উর, লাতজামাই যে ছুকালে হামারে মার লাগাই দিচে। সি কুতা ছুনি, মোহন্ত বেজায়ে বেহাল হই গেইঁচে। কইচে-ছুয়ার-কা বাচ্চা হামার লাত্-নীরে মারবেক কেনে? উরে হামি ঠিকঠাক খতম করি ছাড়বেক বটে।
- আচ্ছা!
- বোল্ লাল বাবু, ছোয়ামী বহুরে মারবেক লাইতো ছোব ছুমায় ছোহাগ কোরবে-তু বোল্?

হো হো করে হেসে উঠলো লাল মিয়া। স্বামীটা তার রোগা। মেজাজটাও খিট খিটে। এদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে দুইবেলা। স্বামীটা তার পছন্দ নয় - সেকথাও সে তার স্বামীর সাক্ষাতে অসাক্ষাতে অনেককেই বলেছে। এদের ভাঙ্গাঘর অনেক বারই জোড়া লাগানো হয়েছে। এই জোড়া লাগানোর কাজে লালমিয়াও হাত দিয়েছে কয়েকবার। হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হলেই ভেঙ্গে যায় এদের সংসার। সুস্থ হলেই সে সংসার আবার জোড়া লাগে অমনি অমনি। অসুখ-বিসুখে স্বামী তার মর মর হলেই হাউ মাউ করে কান্দতে থাকে পুষ্প। সেরে উঠলেই পুষ্প তাকে মরার জন্যে অভিশাপ দেয়, দুই বেলা। পুষ্পের এই ব্যতিক্রম ধর্মী পতিপ্রেম দেখে লাল মিয়া আর না হেসে পার লোনা। হাসতে হাসতে বললো- "তো সে কথা তুমি তোমার দাদুরে বুঝিয়ে বলো।"

কাতরকণ্ঠে পুষ্প বললো, "বুঝবেক লাই। উ বুঢঢা সি কুতা বুঝবেক লাই। নেছা করি বেহোড় মাতাল হই আঁচে। লাত জামাইরে উ জরুর খুন কোরবেক বটে! তু চল্ লালবাবু। ছুবাই কইচেঁ -তু ছাড়া উ বুঢ়ঢারে কেহু সামাল দিবার পারবেক লাই।"

লালমিয়া বললো- "আহ! এ নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? খুন করতে চাইলে কি মানুষ সব সময় খুন করতে পারে? নেশায় আছে তাই আবোল তাবোল বক্‌ছে। নেশা পড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাধা দিয়ে পুষ্প বললো-"লাই বাবু, ঠিক হোবেক লাই। তু লাই যাবি তো ই বিবাদ, আর ঠান্ডা হোবেক লাই! মোহন্ত বহুত গোস্বা হই গেইচে। আগুন হই গেইচে। বিবাদ খতম হোবেক লাইতো উর লাতজামাই হামারে ছাড়িয়ে দেবেক বটে!"

ব্যাপারটি যেমন ঠুনকো, পুষ্পর উত্তেজনাও তেমনি আকস্মিক। সময়ের কিছু প্রলেপ পেলেই ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু। লাল মিয়া এটা জানে। কিন্তু না বলারও উপায় নেই পুষ্পর কাছে। তা হলে সে মাথা ঠুকতে শুরু করবে পায়ে। কিংবা হয়তো সে দিনের সেই নেশার ঘোরের মতোই আজও সে বলে বসবে- লাই যাবি

www.pathagar.com

তো লাই যাবি। হামিও কুতাও যাবেক লাই। তুর মাকানেই থাকবেক বটে হঁ! তাই পুষ্পকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে লাল মিয়া শেষে বললো- "আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এদের এখানে এসেছি। এভাবে কি যাওয়া যায়? বিকেলেই আমি তোমাদের ওখানে যাবো। এখন তুমি যাও।"

পুষ্প বললো-"বিকালে ?"

লাল মিয়া বললো- "হ্যাঁ বিকেলে। এখান থেকে যাবার সময়ই ওদিক দিয়ে যাবো।"

- ঠিক ঠিক যাবি তো বাবু।

- আরে যাবো, যাবো।

লাল মিয়ার পায়ের কাছে হুড়মুড় করে বসে পড়লো পুষ্প। 'দোহাই বাবু'- বলে তার পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই তার হাত দু'টি ধরে ফেললো লাল মিয়া। বললো- 'আরে- করো কি- করোকি! আমি যাবো তো বলছিই।

এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন শেখের পো। হাঁচন শেখের পুত্র বাচন শেখ। বাচন আলী শেখ। মুরুব্বী গোছের মানুষ। 'আবেদ আলী আছো নাকি, আবেদ আলী' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে এদের এ অবস্থায় দেখেই তিনি হক চকিয়ে গেলেন। বললেন- "এ্যাঁ ! একি! লাল মিয়া না? ওটা কে? ও ঐ সাঁতাল পাড়ার পুষ্প? তোমরা এখানে! আবেদ কৈ, আবেদ?"

পুষ্পর হাত ছেড়ে দিয়ে লাল মিয়া তাঁকে বললো- "আবেদ আলী বাড়ীতে নেই। বাইরে গেছে। একটু বসুন। ও এখনই এসে পড়বে।"

বাচন শেখ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন-"না বাপু, তোমরাই থাকো। আমি যাই। ছি-ছি-ছি! বয়নার মাতো মিছে কথা কয়না। পরের বাড়ীতে এসেও ঐ সাঁতালনীকে নিয়ে দিনে দুপুরে লটোঘটো! এতবড় খারাপ চরিত্রের মানুষ তো এ জন্মে দেখিনি।" লাল মিয়া কিছু বলার আগেই দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন বাচন শেখ। পরিস্থিতির আচমকা ধাক্কায় হতবাক হয়ে বসে রইলো লাল মিয়া ও পুষ্প। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে থাকার পর উঠে দাঁড়ালো লাল মিয়া। ধীরে ধীরে বললো-"তুমি যাও পুষ্প। এখানে আসা ঠিক হয়নি তোমার।"

পুষ্পও উঠে দাঁড়িয়ে বললো- "হঁ বাবু! হামারে লিয়া উ ছেকের পো কি ছোব বুড়া বাত বুললো। হামি যাই। তু একবার যাস্ বটে বিকলে।"

ধীরে ধীরে বেরয়ে গেল পুষ্প।

বাচন শেখ সেখান থেকে বেরিয়ে কিছু দূর এগুতেই সামনে পেলেন বয়নার মাকে। সঙ্গে সঙ্গেই উথলে উঠলেন শেখের পো। তার সত্য বাদিতার প্রশংসায় তিনি তাকে ঘটনাটি সবিস্তারে জানালেন। ঘটনাটিকে আকর্ষনীয় করার জন্যে অতিরঞ্জিত করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করলেন না। শুধু বয়নার মাকেই নয়, পথে আর যাদের সামনে পেলেন, এ কাহিনী এমনিভাবেই সবাইকে তিনি জানিয়ে জানিয়ে চললেন। নায়েব সাহেবের সুহৃদ এই শেখের পো- অবিশ্বাসী বয়নার মাকে একদিনেই

www.pathagar.com

বহুলপরিমানে বিশ্বাসী করে তুললেন।

এমন মুখরোচক খবর পেয়ে বয়নার মাও আর স্থির থাকতে পারলো না। সে বদল করলো গন্তব্য স্থল, দ্রুতপদে রওনা হলো আবেদ আলীর বাড়ীর দিকে। খানিকপথ এগুতেই তার সামনে পড়লো পুষ্প। পুষ্প তার পাশকেটে যেতেই তাকে চিনতে পারলো বয়নার মা। চিনতে পেরেই পেছনে ফিরে বললো-"ওম্মা! সে কি লো! এত শিগ্গির অং-তামাশা শ্যাষ হয়্যা গেল!"

এর অর্থ পুষ্প কিছুই বুঝলো না। একটুখানি তাকিয়েই সে যেমন ভাবে যাচ্ছিলো তেমনি ভাবেই চলে গেল আপন মনে। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো বয়নার মা। মুখ বিকৃত করে স্বগতোক্তি করলো-"ঘেন্না ঘেন্না।"

মাংস মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করে বাড়ীর দিকে ফিরে আসছে আবেদ আলী। মনে তার আনন্দের প্লাবন। সে পথ বেয়ে আসছে আর হেঁকে হেঁকে গাইছেঃ

"আজবদেলের দুঃখ,
আল্লাহ বিধি হলো বাম-রে,
আহা বিধি হলো বাম-রে,
আজব দেলের দুঃখ॥
(ওরে) কোন ঘরে মরিল রাজা,
রাজার কোন খানে দাফন রে,
আহা কোন খানে দাফন রে,
আজব দেলের দুঃখ।"

কোথা থেকে ছুটে এলো হুকুম উদ্দীন। বললো- "আবেদ ভাই, ও আবেদ ভাই, এটা কি গান আবেদ ভাই?"

আবেদ বললো-"এটা আজবদেলের গান। শুনোনি এ গান কোন দিন?"

- শুনেছি তো। কিন্তু আমার তো আবার খেয়াল থাকে না কিছু। বড় চমৎকার গান তো! তুমি আর গান জানোনা আবেদ ভাই?

- জানবোনা কেন? অনেক গান জানি। কাঞ্চন মালা, মাধব মালঞ্চ, কেষ্টযাত্রা, ভাসান যাত্রা- কত গান জানি।

- আমাকে তুমি গান শেখাবে আবেদ ভাই?

- এ্যাঁ?

- আমাকে কথা দাও আবেদ ভাই, তুমি আমাকে গান শেখাবে দৈনিক?

- দৈনিক তোমাকে গান শেখাবো! আমি?

- হ্যাঁ আবেদ ভাই। একটু একটু করে যখন পারো তখন! এর জন্যে তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো আবেদ ভাই!

নায়েবপুত্র হুকুমউদ্দীন যে একটা অপদার্থ, এটা সবার মতো আবেদ আলীও জানে। এই হুঁশ বুদ্ধিহীন মানুষটার হঠাৎ গানের প্রতি এই আকর্ষণ দেখে অবাক হলো আবেদ আলী। বললো-"তা হঠাৎ তোমার গানের উপর এত আগ্রহ হলো কেন?"

www.pathagar.com

হুকুম উদ্দীন কাতর কণ্ঠে বললো-"গান আমাকে শিখতেই হবে আবেদ ভাই। তা না হলে-"

থেমে গেল হুকুমউদ্দীন। আবেদ আলী ধমক দিয়ে বললো- "বলো, তা না হলেও?"

হুকুমউদ্দীন বললো- "আমার মাথায় বাড়ি হয়ে যাবে আবেদ ভাই। ঐ ঘাসুর বোন বলে দিয়েছে, গান না শিখলে সে আর কথাই বলবেনা আমার সাথে। আমার বাপজানের মতো সেও কয়- আমার নাকি কোন গুনই নাই। একটু-আধটু গান-বাজনা না শিখলে তো আর মান থাকে না আমার? ঐ ঘাসুর বোনও শেষ পর্য্যন্ত আর পাত্তা দেবে না আমাকে। হয় তো ঐ ফয়জদ্দিকেই পছন্দ করবে, ও ফয়জদ্দির আবার গানের গলা খুব ভাল কিনা!"

এতক্ষণে হুকুমউদ্দীনের গরজটা বুঝতে পারলো আবেদ আলী। বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলো-"কেন, ঘাসুর বোনের পছন্দ-অপছন্দে তোমার কি এসে যায়? তোমার বাপ নাকি পরীবানুর সাথেই বিয়ে দেবে তোমাকে?"

হুকুমউদ্দীনের মন পরীক্ষা করার জন্যেই সে এ প্রশ্ন করলো তাকে। হুকুমউদ্দীন এর জবাবে বললো-" কি যে বলো আবেদ ভাই! বাপজান চাইলেই কি তা হয়? পরীবানু তো ঐ লাল মিয়াকে বিয়ে করবে?"

পরীবানু কাকে বিয়ে করতে আগ্রহী তা আবেদ আলী জানে। কিন্তু হুকুম উদ্দীন এটা কেমন করে জানলো, তা জানার জন্যে পুনরায় সে প্রশ্ন করলো-" লাল মিয়াকে? কে বললে সে কথা?"

- আমার বাপজান কয়- পরীবানুর সাথে ঐ লাল মিয়ার যদি ফষ্টিনষ্টি বেধে যায়, তাহলে পরীবানু ঐ লাল মিয়াকেই বিয়ে করবে। আর কাউকে বিয়ে করবেনা।
- আচ্ছা!
- সেই ফষ্টিনষ্টি বেধে গেছে আবেদ ভাই। আচ্ছা মতো বেধে গেছে!
- মানে?

হিহি করে হাসতে লাগলো হুকুমউদ্দীন। পরীবানুকে পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র উদগ্রীব নয়। তার কেন্দ্রবিন্দু ঘাসুর বোন। নায়েব সাহেবের ছেলের সাথে খাতির থাকলে সুবিধে আছে জেনে ঘাসু তাকে খাতির করে খুব। তার অযোগ্যতার জন্যে তাকে দূর দূর করে সকলেই। ঘাসুর কাছে খাতির পেয়ে বর্তে গেছে হুকুমউদ্দীন। সেই সুবাদেই সে পাত্তা পেয়েছে ঘাসুর বোনের। নায়েব সাহেবের ছেলে বলেই ঘাসুর বোনও ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে। ঘাসুর বউ শিখিয়ে পড়িয়ে-আরো তৎপর করেছে ঘাসুর বোনকে। তাই, ঘাসুর বোনের স্বপ্নেই সে বিভোর। সেই ঘাসুর বোনের উদাসীনতায় হুকুমউদ্দীনের। বরং সে খানিকটা ভয়ই করে পরীবানুকে। কাজেই, পরীবানুর ব্যাপার আর পাঁচটা প্রেমঘটিত ব্যাপারের মতোই তার কাছে একটা মুখরোচক ব্যাপার বৈ অন্য কিছুই নয়। আবেদ আলীর কথায় তাই সে হাসতে হাসতে বললো-"আমি নিজে কানে শুনেছিঃ ওদের দুইজনের মধ্যে

www.pathagar.com

এখন গলায় গলায় পিরীত!"

- কার কাছে শুনলে?

- পরীবানুদের কাজ করা মেয়ের কাছে। ঐ লালমিয়া এসে ইশারা দিলেই তার কাছে ছুটে যায় পরীবানু। লালের হাতে পান দিতেও পরীবানুকে সে দেখেছে। মানে খুব জমজমাট ব্যাপার।

হাসতে লাগলো হুকুমউদ্দীন। চিন্তিত হলো আবেদ আলী। বললো-"তোমার বাপজানকে তা বলেছো?"

- না, এখনও বলিনি। আমার বাপজান মানুষটাতো খুব ভাল নয়। ভাল কথা বলতে গেলেও তেড়ে আসে শুধু শুধু।

- বলবেনা। কখখনো বলবেনা। বুঝলে? কারো কথা কাউকে বলা ঠিক নয়।

- হ্যাঁ, সে কথা তো ঠিক।

- বললে কিন্তু তোমাকে আমি গান শেখাতে রাজী নই। একজনের কথা আর একজনকে যে বলে তাকে আমি ত্রিসীমানায় হাঁটতে দেই না।

- ঠিক আছে আবেদ ভাই, আমি বলবোনা। কছম করে বলছি-কোনদিনই বলবোনা। তুমি তো সত্যি সত্যিই গান শেখাবে আমাকে?

হুকুমউদ্দীনকে গান শেখানোর দুঃসাহস করা আর বুকে হেঁটে গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করা প্রায় একই কথা। তবু প্রয়োজনের তাকিদে সে বললো, "অবশ্যই। শেখাবো না মানে?"

এর মধ্যে হাজির হলো সমজান আলী। দূর থেকে সে হুকুমউদ্দীনকে দেখেই বলে উঠলো

-"কে-রে? হুকুমউদ্দীন না?"

সমজানের উপর নজর পড়তেই "ওরে-বাপরে!" বলে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল হুকুম উদ্দীন। প্রাণ পণে ডেকেও আবেদ আলী আর তাকে দাঁড় করাতে পারলোনা। জিজ্ঞাসা করায় সমজান আলী হাসতে হাসতে বললো-"আরে ওতো একটা একেবারেই নাদান। ওর বাপের কথায় সেদিন ও বদনাম করছিলো আমাদের। শুনতে পেয়েই আমি তাকে তেড়েছিলাম। বলেছিলাম- যেখানে পাবো, সেখানেই আমি খুন করবো বদমায়েশকে। সেই থেকে আমার নাম শুনলেই সে ছুটে পালায়।"

হো হো করে হাসতে লাগলো সমজান আলী। আবেদ আলী তার হাসিতে অল্প একটুসায় দিয়ে চিন্তিত ভাবে বললো-"সমজান ভাই, ওস্তাদ বোধ হয় ইদানিং কিছুটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। লাগামটা তার টেনে ধরার দরকার।"

হাসি থামিয়ে সমজান আলী বললো-"মানে?"

আবেদ বললো- "মানে পরীবানুর সাথে তার মেলা মেশাটা ক্রমেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। সে বোধ হয় খুব অসাবধানে চলা ফেরা করছে। তাকে সাবধান করে দেয়ার দরকার।"

- ব্যাপারটা কি বলোনা?

www.pathagar.com

- বলবো। চলো, ওস্তাদ আমার বাড়ীতেই আছে ওখানে গিয়ে তার সামনেই বলবো। এসো-।

সমজানকে টেনে নিয়েই তার বাড়ীর দিকে রওনা হলো আবেদ আলী।

[তের]

পুষ্পর কথা মিথ্যা নয়। এ দুনিয়ায় একটা লোকের পরোওয়াও যদি হারু সাতাল করে, তা এই লালমিয়া। হারু সাঁতাল লাল মিয়ার শুধু একনিষ্ঠ ভক্তই নয়। সে তাকে ভালও বাসে, ভয়ও করে। স্নেহ-শ্রদ্ধা সম্পৃক্ত এক ভিন্নধরণের ভয়। তাই নেশাটা তার কেটে যাওয়ার পর, লাল মিয়ার কাছে পুষ্প গিয়ে অভিযোগ দিয়েছে জেনেই সে আর স্থির থাকতে পারলো না। বিকেলেই সে ছুটে এলো। লাল মিয়ার সন্ধানে। ছুটে এলো আবেদ আলীর বাড়ীতে। তার সম্বন্ধে পুষ্পর ধারনাটা একেবারেই সত্য নয়, সে আর সত্যিসত্যিই তার নাতজামাইকে খুন করতে পারে না, তার কথাগুলোর একটাও তার মনের কথা নয়, এসব কথা লাল মিয়াকে জানিয়ে সে হাল্কা করলো মন এবং অপরাধ স্ফালনের আনন্দ নিয়ে সে ফিরে চললো পুনরায়।

তরফদার সাহেবের বাহির বাড়ীর তল দিয়ে তার পথ। সেখানে এসে পৌঁছতেই তাকে ডাক দিলেন তরফদার সাহেব। চেয়ার পেতে বাহির আঙ্গিনায় বসে ছিলেন তিনি। ডাকশুনে হারু সাঁতাল মুখ তুলে চাইতেই তাকে হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন তরফদার সাহেব। বিগলিত হারু সাঁতাল সেখান থেকেই বলে উঠলো-"পেন্নাম হই জমিনদার বাবু!" তরফদার সাহেব বললেন-"আরে এসো-এসো। এখানে এসো।"

হারু সাঁতাল উঠে এলো বাড়ীর উপর। একটা চাকর এসে ছোট্ট একটা টুল এনে পেতে দিলো তরফদারের পাশেই। হারু সাঁতাল কাছে আসতেই তরফদার সাহেব বললেন-"কেমন আছো হারু? অনেক দিন তো দেখাই নাই তোমার সাথে। বাড়ীর খবরটবর ভাল?"

তরফদারের এই হৃদ্যতায় আপ্লুত হলো হারু। সে হৃষ্টচিত্তে বললো- "তু দেউতা আদমী জমিনদার বাবু! তুর কিরপায় ছোব ঠিকঠাক আছে বটেক।"

তরফদার সাহেব টুলটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন-

- "এসো, এখানে এসে বসো।

আঁতকে উঠলো হারু সাঁতাল। একধাপ পিছিয়ে গিয়ে বললো-"হেই বাবা! তু দেউতা আদমী। হামি ছোটা জ্বাত। উ কসুর হামি করবেক লাই বাবু।"

- আরে কসুর কি? বসো-বসো।
- লাই বাবু, জব্বোর গুণা হবে।

বলতে বলতে পার্শ্ব অবস্থিত একটা কাঠের চেলা টেনে নিয়ে তারই উপর বসে পড়লো হারু সাঁতাল। স্মিতহাস্যে তরফদার সাহেব বললেন-"তুমি বরাবর ঐ একই রকম বয়ে গেলে হারু!"

www.pathagar.com

হারু সাঁতাল মুখ তুলে বললো-
- হুজুর!
- কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?
- হুই আবেদ আলীর মাকানে। লাল বাবুর কাছে।
- লালবাবু!
- হেই বাবা! ছোনাকুলের লালবাবু। উ লালমিয়া।
- ও, লালমিয়া ?
- হঁ বাবু। উ আখুন আবেদ আলীর মাকানে আঁচে বটেক।

তরফদার সাহেব অল্প একটু ভাবলেন। অতঃপর নড়েচড়ে বসে তিনি বললেন- "আমি কয়দিন থেকেই তোমার কথা মনে করছি হারু। একটা আলাপ ছিল তোমার সাথে। মানে-একটা কথা।"
- কি কুতা বাবু?
- লালমিয়ার সাথে তো তোমার খুব উঠাবসা আছে- না?
- হঁ বাবু! খুব আঁচে বটেক।
- ছেলেটাকে কেমন মনে হয় তোমার?
- আচ্ছা ছেলিয়া বাবু! একদোম বাঘের বাচ্চা। খুব ছাহস, জব্বোর তেজ।
- আরে না-না। আমি ও কথা বলছিনে। বলছি-ওর আক্কেল স্বভাবটা কেমন।
- হেই বাবা! উ তো দেউতা আদমী বাবু। উর দীল একদোম ছাফা। খাছা লেড়কা!
- কিন্তু কেউ কেউ যে বলে, ও একটা বাজে ছেলে? ওর স্বভাব চরিত্র ভাল নয়?
- হাইরে বা! লালবাবুর সুবাব ভাল লয়? উ কুতা বুলবেক লাই বাবু, গুণা হোবে। এমুন সুবাবের ছেলিয়া হামি আর কুথাও দেখচেক লাই বাবু।
- তুমি ঠিক বলছো তো?
- বাবু, ই হারু সাঁতাল বজ্জাত আদমী বটেক। হাঁড়িয়া খায়, মাতাল হয়। ছোব ঠিক কুতা। কিন্তুক ঝুটা বাত ই হারু সাঁতাল বুলবেকলাই বাবু। জান থাক্‌তি বুলবেক লাই।

তরফদার সাহেব এটা বিশ্বাস করেন। এরা যা দেখে বা বুঝে, তা সরাসরি বলে। আর যে দোষই থাক, কিছু বানিয়ে বলার অভ্যেস এদের নাই। একারণেই লাল মিয়ার ব্যাপারে জানার জন্যে হারু সাঁতালের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বেশী অনুভব করছিলেন তিনি। একমাত্র নায়েব ছাড়া, আর যাদের সাথে কথা বলেছেন- এ ব্যাপারে তারাও লাল মিয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি ভাল ধারনাই দিয়েছে। হারুর কাছে শুনে তিনি এবার নিশ্চিন্ত হলেন পুরোপুরি। আর এই নিশ্চিন্ত হতে পারায় তৃপ্তিতে আবিষ্ট হয়ে তিনি নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ নীরব রইলো হারু সাতালও। সে কি যেন একটু ভাবলো। পরে ধীরে ধীরে বললো-বাবু, হামি একটা কুতা বুলবেক বটে!"
- কথা? কি কথা, বলো?

www.pathagar.com

- তু কসুর লিবেক লাইতো বুলবেক বটে।
- আহা! বলোই না কি কথা?
- উ লালবাবু ছেলিয়াটাকে তু লিয়ে লে। উ একদম আজ-পুত্তুর আঁচে। তুর পরীবানুর সাথে উকে জব্বোর মানাবে বাবু।

চমকে উঠলেন তরফদার সাহেব। তাঁর অন্তস্থলে হাত দিয়েছে হারু সাঁতাল। বললেন-"হারু!"

অমনিভাবেই হারু বললো-"হামার বহু মলুয়া কয়- এক লালমিয়া ছাড়া উ পরীবানুর ঠিকঠাক জুটি আর কুথাও মিলবেক লাই বটে।"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তরফদার সাহেব। বলেই চললো হারু-" উ জমিনদার লয় ঠিক বাবু, কিন্তুক একটা জোতদারের বেটাবটেক। খুব কম্‌তি হোবেক লাই বাবু। তু লিয়া লে। উতে তুর পরীবানু জব্বোর ছুখি হোবে।

তরফদার সাহেব কয়েকদিন ধরে শুধু এই কথাই ভাবছেন। জুটিটা যে নিঃসন্দেহে সুন্দর হবে, এটা তিনি লালমিয়াকে দেখার পরই বুঝেছেন। ওর বাপ জসমত মিয়ার সাথে তার পূর্বশত্রুতার দরুণ একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও, তাঁর অসম্ভব রকমের পছন্দ হয়েছে ছেলেটাকে। আর এই কারণেই তিনি এত খোঁজ নিচ্ছেন, সে কথা হারু সাঁতালের মুখ দিয়ে এমন সরাসরি ভাবে আসতে দেখে তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বললেন-"ঠিক বলছো হারু? আমার পরীবানু সত্যিই এতে সুখী হবে?"

হারু সাঁতাল বললো-"হঁ বাবু, জব্বোর ছুখী হোবেক। হামি তা বুঝি লেইচি বটেক।"

আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তরফদার- সাহেব। নিজের মনের সাথে বোঝাপড়াটা চূড়ান্ত হওয়ার আগে ব্যাপারটা অধিক ফাঁশ হোক, এটা তিনি চাইলেন না। তাই প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে কিছুক্ষণ অন্য আলাপ করে সেদিনের মতো বিদেয় করলেন হারুকে।

সমজান আর আবেদ আলীর হুঁশিয়ারীটা কাজেই তেমন এলো না। পরীবানুর আকর্ষণে লাল মিয়ার মতো মানুষও শেষ পর্য্যন্ত দেওয়ানা হয়ে উঠলো। দিন রাত সব সময় সে বিল বাথানেই ঘুর ঘুর করতে লাগলো। পরীবানুর অবস্থাও হলো তদ্রূপ। লাল মিয়ার এক দিনের অদর্শনও সহ্য করার সামর্থ তার রইলো না। সকাল সন্ধ্যে সব সময়ই সে লাল মিয়ার পথ চেয়ে ঘুরতে লাগলো ঘরের বাইরে। এখন প্রায় প্রতি দিনই রাত্রি গভীর হলেই লাল মিয়া এসে অপেক্ষা করে আড়ালে। সন্তর্পনে বেরিয়ে আসে পরীবানু। পরস্পরের হাত ধরে হারিয়ে যায় অন্ধকারে। দিবা ভাগেও মাঝে মধ্যেই সাক্ষাৎ ঘটে উভয়ের। তারা ফাঁক পেলেই চলে আছে মতিজানের বাড়ী। গল্প করে ঘরের কোনে বসে।

আধিক্য কোন কিছুরই ভাল নয়। ভাল নয় কোন কিছুতেই অসাবধানতা। এসব ব্যাপার দীর্ঘদিন গোপন থাকারও ব্যাপার নয়। এটাও তাই থাকলো না। একদিন এটা কানে গেল নায়েবের। এর সন্ধান নায়েবই প্রথম পেলেন। ধূর্ত মানুষ নায়েব।

www.pathagar.com

লাল মিয়ার চাল চলনে এমনটির আঁচ আগেই তিনি করেছিলেন। তাই অনেক কিছুর লোভ দেখিয়ে তরফদারের এক বাঁদীকে তিনি হাত করেছিলেন আগেই। সেই বাঁদীই তাঁকে জানালো এই খবর। খবরটা পাওয়ার পরই এর সত্যতা নিরুপণে অতিশয় তৎপর হলেন নায়েব। সন্ধ্যের পর ঘর ছেড়ে তিনিও ঘুরতে লাগলেন-আড়ালে অন্ধকারে।

কিছু বাধাবিপত্তির মুখেও লাল মিয়া আর পরীবানুর গোপন সাক্ষাৎ অব্যহত রইলো। হারু সাঁতালের মুখে তরফদারের মনোভাবের আভাস পেয়ে এবং কতকটা হারু সাঁতালেরই চাপে পড়ে এরই মধ্যে একদিন ঘটক পাঠালো লাল মিয়া। ঠিক ঘটক নয়, একটা প্রাথমিকভাবে আলাপ আলোচনার লোক পাঠালো লালমিয়া। প্রেরিত লোকের প্রস্তাবটি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন তরফদার সাহেব। কথাবার্তা অনেকদূর এগুলো। শুধু ঠেকে গেল একজায়গায়। তরফদার চান-মেয়েকে অন্যের বাড়ীতে পাঠাতে হলে তাঁর চেয়ে উঁচ ঘর বা নিদেন পক্ষে সমপর্য্যায়ের ঘরেই তিনি পাঠাবেন। তাঁর চেয়ে নীচুঘরে পাঠাতে তিনি অনিচ্ছুক। এটা তাঁর জিদ নয়, সামাজিক মর্য্যাদার বালাই। কাজেই লালমিয়ার হাতে মেয়ে দিতে আপত্তি নেই তাঁর, বরং তিনি বিশেষভাবে আগ্রহীই, তবে মেয়েকে তিনি লালমিয়ার সাথে তুলে দিতে পারবেন না-এইকথা জানালেন। লাল মিয়ার প্রেরিত লোককে বললেন, লালমিয়াকে ঘর জামাই হিসেবে থাকতে হবে। ঘরজামাই বা দত্তক রাখার ব্যাপারে উঁচু-নীচুর প্রশ্নটা বিশেষ কোন বাধা নয়। এর জন্যে লাল মিয়াকে অনেক কিছুই লিখে দিতেও রাজী তিনি।

মেয়েকে বাড়ীতে রাখার বড় ইচ্ছে তরফদারের। লাল মিয়াকে ঘিরে তিনি এই স্বপ্নই দেখছিলেন। কিন্তু লালমিয়া যে আগা গোড়াই স্বাধীনচেতা ও জেদী, লাল মিয়ার এ লোকটি তা জানতেন। তাই, এ হীনতা মেনে নিতে লাল মিয়া আদৌ রাজী হবে কিনা, তিনি এ ব্যাপারে তরফদারকে কোন কথাই দিতে পারলেন না। অনেক আলাপ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত স্থির হলো- ঘরজামাই থাকতে রাজী হলে, এ নিয়ে আর কথাই নেই। পুত্র সন্তান নেই তাঁর। লাল মিয়াকে পেলে তিনি বর্তে যাবেন। অন্যথায়, আরো খানিক ভেবে দেখবেন তরফদার সাহেব। হাঁ-না-কোনটাই তিনি এই বৈঠকেই চূড়ান্ত করে ফেলবেন না।

তরফদারের এই আগ্রহটা জানতে পেরেই আনন্দে নেচে উঠলো লাল মিয়া। নেচে উঠলো পরীবানু। আজ আরো সকাল সকাল মিলিত হলো তারা। লোকজন ঘুমিয়ে পড়তেই ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো পরীবানু। তাকেও সহায়তা করে অন্য একজন দাসী। তার অনুপস্থিতিটা কায়দা করে সামাল দেয় সে-ই। লাল মিয়াও অপেক্ষায় ছিল অদূরে। এক সাথে হয়েই তারা রওনা দিলো দ্রুতপদে। বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলো এলো তারা। থামলো এসে অরণ্যের এক কিনারে। কয়দিন আগেই শেষ হয়েছে পূর্ণিমা। আকাশ ভরা মাঝরাতের জ্যোৎস্না। আজ তারা নিশ্চিন্ত। ঘর জামাই এর প্রশ্নটা আদৌ কিছু মূখ্য নয়। পরীবানুর জন্যে এখন আগুনে ঝাঁপ দিতেও লালমিয়া প্রস্তুত। মুখ্য হলো তরফদারের সম্মতি। সম্মতির

www.pathagar.com

আনন্দে আজ তারা উৎফুল্ল। ভবিষ্যতের আলোকোজ্জল সম্ভাবনায় আজ তারা বিহ্বল। লোকালয় দূরে ফেলে অরণ্যের প্রান্তে এসেই তারা উল্লাসে গেয়ে উঠলো তাদের নিয়ে বছির বাহারের বাঁধা সেই অতি প্রিয় গানটা। লাল মিয়ার মারফত পরীবানুও এ গানটি রপ্ত করে ফেলেছিল। আনন্দের আতিশয্যে কিঞ্চিৎ নিম্নকণ্ঠে গেয়ে উঠলো আবেগেঃ

উভয়েঃ ধরিতে মনের মানুষ,
ধরিতে মনের মানুষ হাজার মানুষ থুয়ে
লাল ঃ সোনা কোলের ছেলে খোঁজে বিল বাথানের মেয়ে।
উভয়েঃ খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ-
খোঁজ করিল-
খোঁজ করিয়া জোড় বাঁধিল-
বিলচলনের লালপরীগো,
লাল ঃ ও আমার সুন্দরী গো, সখী আমার সোনার বরণ-
পরী ঃ ও আমার বৈদাশী গো, বন্ধু আমার জীবন মরণ ॥
উভয়েঃ ধরিতে মনের মানুষ।
ধরিতে মনের মানুষ হাজার মানুষ ফেলে।
পরী ঃ বিল্‌বাথানের মেয়ে খোঁজে সোনাকোলের ছেলে।
উভয়েঃ খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ, খোঁজ করিল-
খোঁজ করিয়া জোড় বাঁধিল-
বিলচলনের লালপরী গো,
লাল ঃ ও আমার প্রাণপ্রিয়া গো, সখী আমার ফুলের ডালা,
পরী ঃ ও আমার মনচোরাগো, বন্ধু আমার গলার মালা ॥

গান শেষে হাসতে হাসতে এলিয়ে পড়লো দুজন। তারা বসে পড়লো ঝোপের পাশে ঘাসের উপর। লালমিয়ার গলাটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পরীবানু ঠাট্টা করে বললো- "ঘরজামাই, ও ঘরজামাই-।"

পরীবানুকে জড়িয়ে ধরে লাল মিয়া বললো- "ঘর জামাইটা বড় কথা নয়, এই বউ পাওডয়াটাই বড়।"

লাল মিয়ার কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে পরীবানু। লালমিয়াও বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে একটি নর একটি নারী। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

খানিক পরে মৌনতাভঙ্গ করলো পরীবানু। বললো- "ঘরজামাই থাকতে কষ্ট হবে তোমার?"

লাল মিয়া বললো-"কি আর কষ্ট! আমি তো বলেছিই, তোমার জন্যে সব কিছুতেই রাজী আমি। তোমার বাপজান যদি আমার বাড়ীতে তোমাকে নিতান্তই না পাঠান, তাহলে আমি ঘর জামাই থাকতেও প্রস্তুত।

www.pathagar.com

- তাহলে আর দেরীনা করে তাড়াতাড়ি সেই কথাটা বাপজানকে জানিয়ে দাও। এভাবে আর অধিকদিন চলাফেরা ঠিক নয়। কে কখন দেখে ফেলে-

খশ্-খশ মট্-মট্ মটাশ! পাশেই এইশব্দ। একটা ঝোপ পরেই। চমকে উঠলো উভয়েই। বাঘ, না ভাল্লুক, না মানুষ, না গরু! নাকি অশরীরী কিছু?

"কে?"-বলে লাফ দিয়ে উঠে সেই দিকে ছুটে গেল লালমিয়া। সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ হারিয়ে গেল অন্ধকারে। ঢুকে পড়লো অরণ্যের গহিনে। স্পষ্টভাবে দেখতে পেলো লাল মিয়া। চিনতে না পারলেও এটা যে একটা মানুষ, এ সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহই রইলো না। পরীবানু ভয় পাবে জেনেই তাকে একা ফেলে অধিক দুর লোকটাকে সে ধাওয়া করতে পারলো না। ফিরে এলো তাড়াতাড়ি।

মানুষ সে ঠিকই। অন্য কেউও নয়। স্বয়ং মিয়াজান আলী মিয়া। পরীবানুর বেরিয়ে আসার সন্ধান পেয়েই এদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন তিনিও। কিন্তু দিকভ্রান্ত হয়ে এদের অন্যদিকে খুঁজে বেড়ান এতক্ষণ। এই মাত্র এদিকে তিনি এসেছেন। মাঠের দিকে খুঁজে মাঠ পেরিয়ে যেতেই তিনি উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখতে পেয়েছেন এদের। ঝোপের পাশে না বসে, ঝোপের কিঞ্চিৎ আড়ালে থাকলে, এদের হয়তো খুঁজেই তিনি পেতেন না। এদের অসাবধানতার জন্যেই এদের দেখতে পেলেন তিনি। দেখতে পেলেন-ঝোপের একদম কেনার ঘেঁষে মানুষের মতো দুটি জীব বসে আছে চুপচাপ। দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন পায়ে পায়ে। স্পষ্টভাবে দেখার জন্যে এদের ঝোপের পাশেই তিনি অন্য একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে দেখতে লাগলেন উঁকি দিয়ে। এদের চিনতে পেরেই আরো অধিক আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি। আরো কিঞ্চিৎ নিকট থেকে দেখার জন্যে ধাপ তুলতেই এই অঘটন। বিশুষ্ক ডালপালার উপর শুকনো পাতা জমা হয়ে এক হয়ে মিশে ছিল মাটির সাথে। তার উপর পা ফেলতেই-খশ্ খশ্ মট-মট্ মটাশ্! চমকে উঠলো লালমিয়ারা। আওয়াজ দিতেই তিনি আঁতকে উঠে পালিয়ে গেলেন অন্ধকারে। ডাকাত-পানা মানুষ এই লালমিয়া। এই অবস্থায় তার হাতে পড়ার যে কি পরিনাম, তা চিন্তা করেই ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন নায়েব সাহেব।

লালমিয়া ফিরে আসতেই পরীবানু উৎকণ্ঠার সাথে বললো- "মানুষ নাকি?"

লাল মিয়া উত্তর দিলো- "হ্যাঁ, কে একজন পিছু নিয়েছে আমাদের। চলো, বাইরে আর অপেক্ষা করা আদৌ ঠিক নয়।"

দ্রুত পদে চলে গেল তারাও।

[চৌদ্দ]

ইতিমধ্যেই বয়নার মায়ের মাহাত্ম্যে বিল বাথান ডুবে গেল লালমিয়ার বদনামে। হরেক রকম রূপক কাহিনী রচনা করে সে লাল মিয়ার কুৎসা কথা গাইতে লাগলো পাড়ায় পাড়ায়। গোব্রার চাচীর থোতা মুখ ভোতা করার প্রয়াসে সে দিনের পর দিন

www.pathagar.com

চালিয়ে গেল বিরামহীন সংগ্রাম। নায়েব সাহেবের বুকের কাঁটা লালমিয়া। বয়নার মায়ের চোখের বালী গোবরার চাচী। দিনরাত একটানা গায়ের ঝাল ঝেড়ে সে গোব্‌রার চাচীর কতখানি ক্ষতি করতে পারলো তা সে-ই জানে! কিন্তু এতে অপূরণীয় ক্ষতি হলো লালমিয়ার। তার বদনামটা ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো। এর সাথে যোগ হলো বাচন শেখের বিবরণ। পুষ্পর সাথে লালমিয়ার অশ্লীল কর্মকান্ডে স্বচোক্ষে এবং সামনা সামনি দেখে ফেলেছেন তিনি। পায়ে হেঁটে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেয়ার চেয়েও অধিকতর কৃতিত্বের কাজ করে ফেলেছেন তিনি। এ কৃতিত্ব কি চেপে রাখা সম্ভব? সারাগ্রাম ঘুরে এ অমৃতকথা তিনি ভণে গেছেন কাশীরাম দাসের মতো, আর রাক্ষসের মতো হা করে এ পূণ্যকথা গিলে গেছেন আবালবৃদ্ধ বনিতা। ময়-মুরুব্বী-মানুষ তিনি। তাঁকে আর অবিশ্বাস করে কে? ব্যস্। শোনার পরই গ্রামলক্ষ্মা ঝড় উঠেছে- ছি-ছি-ছি! ও পাড়া থেকে শুরু হয়ে দমকা হাওয়ার মতো সেই 'ছি-ছি'র ধাক্কা এ পাড়ায় এসে লাগতেই আছে অবিরাম। তরফদার সাহেবের কানটা আর অক্ষত থাকে কতক্ষণ!

সর্বপ্রথম এটা তাঁর কানে দিলো পাড়া পরশী। তারপর বয়নার মা। বয়নার মায়ের তৎপরতা তরফদার পর্যন্ত পৌছাতো না। কিন্তু হারু সাঁতালই ব্যাপারটা আরো জটিল করে তুললো। বয়নার মায়ের মিথ্যাচার সামনা সামনি কানে পড়তেই রুখে দাঁড়ালো হারু সাঁতাল। গর্জে উঠলো বাঘের মতো। বয়নার মাও বাঘিনী। ছেড়ে দেয়ার পাত্রী নয় সেও। সমানে সে শুরু করলো গালীবর্ষণ। লালমিয়ার অবৈধ সম্পর্কটা পুষ্প থেকে শুরু করে হারুর বউ মলুয়া পর্যন্ত পৌছে দিয়ে ছাড়লো। কিছুটা নেশায় ছিল হারু সাঁতাল। এতটা সে সহ্য করতে পারলো না। হাতে থাকা লাঠি দিয়ে বয়নার মায়ের কুঁজের উপর সে উপর্য্যুপরি বসিয়ে দিলো কয়েক ঘা। কঁকিয়ে উঠে ধুলার উপর লুটিয়ে পড়লো বয়নার মা। গড়াগড়ি করতে করতে আর্তনাদের নামে সে দ্বিগুণ বেগে বাড়িয়ে দিলো অশ্রাব্য গালী বর্ষণ। খবরটা সঙ্গে সঙ্গেই কানে গেল নায়েবের। মওকা পেলেন তিনি। হারুর বিরুদ্ধে তরফদারের কাছে নালীশ দিতে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বয়নার মাকে। হারুর বিচার হোক না হোক, মূল ব্যাপারটা তরফদারের কানে যাক, এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য তার সফল হলো ষোল আনায়। হারুর কথা বলতে গিয়ে লাল মিয়ার একটানা কুকীর্তি গেয়ে গেয়ে তরফদারের শ্রবণ শক্তি রুদ্ধ করলো বয়নার মা। পুষ্প ঘটিত ব্যাপারটা পুনরাবৃত্তি করতে সে ক্লান্তি বোধ করলো না। শুনে বন বন করে ঘুরতে লাগলো তরফদার সাহেবের মাথা। বয়নার মায়ের বিবৃতি যে ষোল আনাই সত্যি নয়, সেটা তিনি তার বলার ধরণেই বুঝলেন। কিন্তু ষোল আনাই যে মিথ্যা, এমনটি ভাবার পেছনে কোন যুক্তিও খুঁজে পেলেন না। এর কিঞ্চিৎ সত্যি হলেও তো তাঁর সব আশা নিরাশা। অথচ এই লালমিয়াকে নিয়ে কত স্বপ্নই না তরফদার সাহেব দেখেছেন। প্রথম দিন দেখার পরই ছেলেটাকে মনে ধরেছে তাঁর। আজ তাকে পাওয়ার জন্যে দু হাত বাড়িয়ে বসে আছেন তিনি। ঘরজামাই হতে

www.pathagar.com

রাজী যদি নাও হয়, তবু তিনি এমন ছেলে হাতছাড়া করবেন না। তারই হাতে তুলে দেবেন পরীবানুকে। এমনই একটা আশা নিয়ে বসে আছেন তরফদার, আর সেই ছেলে এতবড় চরিত্রহীন! এমনই একটা লম্পট। বয়নার মায়ের নালীশ শুনে হারুর বিচার করার মতো কিছুমাত্র হুঁশ বুদ্ধি আর তরফদারের রইলো না। তিনি টলতে টলতে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামাল দিয়ে নিয়ে এর সত্যতা যাচাই করার জন্যে তিনি ডেকে পাঠালেন শেখের পোকে। শেখের পো এখানে এসে মিথ্যাচারের একেবারে চরম পর্যায়ে না গেলেও, নির্জন ঘরের মধ্যে একই বিছানায় দু'জনকে লুটোপুটি খেতে তিনি স্বচোক্ষে দেখেছেন- এ কথাটা বলে গেলেন নির্দ্বিধায়। শুনে তরফদার সাহেব একেবারেই গুম মেরে গেলেন। শেখের পো' বিদেয় হওয়ার পরও অনেকক্ষণ তিনি কথা বলতে পারলেন না। পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আপন মনে তিনি শুধু একটি কথাই বললেন- "এতবড় প্রবঞ্চক ঐ হারুটাও!"

লালমিয়াকে জখম করার স্বরচিত পরিকল্পনাটা এমন মারাত্মক ভাবে কাজ দিলো দেখে আনন্দে অধীর হলেন নায়েব সাহেব। ওকে পুরোপুরি পঙ্গু করার মাল মশলা হাতে নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছেন তিনি। তাঁর নিজের চোখে দেখা রাতের ঐ ঘটনাটাই মারণ-অস্ত্র তাঁর। কি ভাবে কথাটা তরফদারের কানে দেবেন- এই কথাটা আগে তরফদারকেই জানাবেন, না গাঁয়ের আর পাঁচজনকে দেখিয়ে দিয়ে রঙ্গটা আরো জমিয়ে তুলবেন অধিক, এই চিন্তাই করছিলেন। এখানে একটা বিপদ আছে। সবাই এটা জেনে ফেললে, লজ্জা ঢাকার কারণে লালের সাথেই বাধ্য হয়ে বিয়েটা আবার দিয়ে ফেলতেও পারেন তিনি। ওদিকে আবার পরীবানুর কলংকটাও প্রচার হোক এই ভাবে, এটাও তিনি চান। করণীয় স্থির করতে না পেরে নিভে যাওয়া হুঁকোটায় টান দিচ্ছেন পর পর। এমন সময় আছিরুদ্দীন পেয়াদা এসে খবর দিলো-তরফদার সাহেব স্মরণ করেছেন তাঁকে। এক্ষুনি। খুব জরুরী।

ভাতুরিয়ার সম্পর্কটা ভেঙ্গে যাওয়ার চূড়ান্ত খবর শোনার পর পরীবানুর বিয়ের ব্যাপারে তরফদার সাহেব সেই যে তখন সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, সেটা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ফলে নতুনভাবে শুরু হয় ঘটকের আনাগোনা। এর মধ্যে আবার লালমিয়াকে নিয়ে নানা রকম চিন্তাভাবনা মনে আসায়, তরফদার সাহেব পূর্ববৎ নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। কাউকে কোন পাকা কথা না দিয়ে, তাঁর মতামতটা পরে জানাবেন বলে তিনি ঘটকের পর ঘটককে বিদেয় করতে থাকেন। আজ আবার প্রস্তাব এসেছে সাঁতোল থেকে। এবার কোন ঘটক আসেনি প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছেন বর-কর্তা স্বয়ং। আগ্রহ তাদের অত্যধিক। তরফদার সাহেবও আজ আর কোন গড়িমসি করেন নি। ভেবে-চিন্তে দেখার জন্যে সময়ও তিনি নেননি। প্রাথমিক আলাপ আলোচনা সঙ্গে সঙ্গেই সেরে নিয়ে, তাকে বিশ্রামাগারে পাঠিয়েছেন সমাদরে। কথা-বার্তা আজকেই সব পাকা করতে চান তিনি। এ কারণেই স্মরণ করেছেন নায়েব-গোমস্তা, আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের।

www.pathagar.com

এত্তেলা পেয়ে নায়েব যখন এলেন, তখন তরফদার সাহেব একাই ছিলেন বৈঠক খানায়। অন্যেরা কেউ এসে পৌঁছায়নি তখনও। অতিশয় গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন তরফদার সাহেব। আগুনে পোড়া কয়লার মতো চোখ মুখ তাঁর মলিন। নায়েব এসে আসন গ্রহণ করতেই তরফদার সাহেব বললেন- "মিয়াজান, সাঁতোল থেকে পরবিানুর বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। ঘর-বর আমার পছন্দ। ওঁরাও অতিসত্বর সেরে নিতে চায় বিয়েটা। আমি কথাবার্তা পাকা করতে চাই।"

তরফদার সাহেবের কথা শুনে মিয়াজান মিয়া 'থ' মেরে গেলেন। দম ফেলতেও ভুলে গেলেন মুহূর্ত কয়েক। যে উদ্দেশ্যে তিনি এত কাঠখড়ি পোড়াচ্ছেন, সেই বিয়েটাই যদি অন্য জায়গায় হয়ে যায়, তাহলে আর কিসের জন্যে কি করলেন তিনি! এক গর্ত ডিঙ্গিয়ে যদি আর এক গর্তেই পড়তে হয়, তাহলে আর কিসের জন্যে তাঁর এত লাফালাফি। লালমিয়াকে সামাল দিয়েই পরীবানুর কুৎসার পেছনে ছুটবেন তিনি, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। পরীবানুর কুৎসাটা রটিয়ে দিতে পারলেই ঐ এক কিস্তিতে সামাল দেবেন সবাইকে-এই ছিল তাঁর মতলব। সেই সুযোগটাই আর পাচ্ছেন না দেখে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। ঘটক আসছে ঘটক যাচ্ছে- এটা তিনি দেখছেন। কিন্তু বিয়ে বলে কথা। মাঝে অনেক চিন্তাভাবনার কথা আছে- দেখাশুনার প্রশ্ন আছে। কথাবার্তা পাকা হতে সময় লাগবে-এই ছিল তাঁর ধারণা। এই সময়ই যথেষ্ট ছিল তাঁর কাছে। পেয়েও গেছেন খানিকটা। জালও তিনি গুটিয়ে এনেছেন অনেকখানি। এরই মাঝে হঠাৎ করে এই কথা-বার্তা পাকা করার প্রস্তাবে একেবারেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন নায়েব সাহেব।

নায়েবকে নীরব দেখে তরফদার সাহেব প্রশ্ন করলেন -"এ সম্বন্ধে তোমার কি মতামত?"

খানিক ইতস্ততঃ করে বুকে সাহস বাঁধলেন নায়েব সাহেব। বললেন- "এত তাড়াতাড়ি? না হুজুর, এটা আমরা হতে দিতে পারিনে। পরীবানুকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে একা আপনি বাঁচবেন না। মেয়েকে আপনার বাড়ীতেই রাখতে হবে। আপনি এদিকেই দেখুন।"

নায়েবের এ জবাবে তরফদার সাহেব খুশী হতে পারলেন না। বললেন-" বাড়ীতেই রাখবো! তেমন ছেলে কৈ? তোমাকে বললে তো তুমি তোমার ঐ অপদার্থ ছেলেটার কথাই বলবে-যা কস্মিনকালেও হবার নয়। অন্য কোন ছেলের সন্ধান দিতে পেরেছো এ যাবত?"

নায়েব সাহেব থতমত করে বললেন- "না, মানে-"

বলেই চললেন তরফদার, "হুকুমউদ্দীন ছাড়া কি আর একটা ছেলেও পছন্দ হয়নি তোমার?"

মওকা পেলেন নায়েব সাহেব। বললেন, "হুজুর, আমি আপনার নিমখ খাই। নিমখহারামী আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার ছেলের স্বভাব চরিত্র আমি ভালভাবে জানি বলেই তার কথা বলেছি। পছন্দ অপছন্দ-সেটা আপনার ব্যাপার! অন্য ছেলের

www.pathagar.com

স্বভাব-চরিত্র সঠিকভাবে না জেনে দায়িত্বহীনের মতো আমি যার তার কথা বলতে পারিনে আপনাকে। বাড়ীতে রাখার নামে তো আর কোন একটা লম্পটের হাতে পরীবানুকে তুলে দেয়ার পরামর্শ দিতে পারিনে। এই যে এত লোকে লালমিয়ার কথা বলেছে, আমার মুখে শুনেছেন তা কোনদিন? আজ দেখুন, তার চরিত্রটা কেমন? শুধু যদি চরিত্রটাই খারাপ হতো হুজুর, তবুও আমি তার কথা হয়তো বলতাম, কিন্তু ধর্ম বলেও কোন কিছু ওর এক ফোঁটাও নেই। দুদিন ফূর্তি লুটার পর সে আর ফিরেও তাকায়না কোন মেয়ের দিকে-তা যত রূপবর্তী আর গুণবর্তীই হোক সে। নেশাটা কেটে গেলেই সরে দাঁড়াবে পাষণ্ডটা শত কান্নাকাটি করেও কোন মেয়ে আর তার মন ভেজাতে পারবেনা। এতবড় বদমায়েশ ঐ পাজিটা!"

এক দৃষ্টে নায়েবের দিকে চেয়েছিলেন তরফদার। এবার তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন- "আশ্চর্য।"

এতে আরো জোর পেলেন নায়েব। উৎসাহিত হয়ে পুনরায় তিনি বললেন- "যেমনটি আপনি চান, তেমনটি আমার চোখে পড়লে তো তার কথা বলবো। সর্বগুণে গুণবান ছেলে এ বাজারে পাবেন কোথায়?"

তরফদার সাহেব কথাটার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেলেন। তাই উষ্মা পরিহার করে সহজ কণ্ঠে বললেন- "সেই জন্যেই তো ভাবছি মিয়াজান, বাড়ীতে রাখার চিন্তে করে লাভ নেই। যত সত্বর পারি, অন্যত্রই দিয়ে ফেলি বিয়েটা। বয়স হয়েছে মেয়ের। হঠাৎ যদি কেউ কোন বদনাম রটিয়ে ফেলে তাহলে খুব মুস্কিল হবে বিয়ে দেয়া।"

নায়েব আবার মওকা পেলেন আর একটা। বললেন- "হুজুর, সে কথা যদি বলেন, তা হলে আমাকে বলতেই হয়, সে মুস্কিলটা আর অপেক্ষা করে নেই। মুস্কিল যা হবার তা হয়েই গেছে এর মধ্যে। কোথাও তাকে সহজে আর বিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।"

চমকে উঠলেন তরফদার সাহেব। বললেন-"মানে!"

নায়েব বললেন-"কয় দিন ধরেই ভাবছি, আমি কেমন করে কথাটা আপনাকে বলি। আজ যখন সে প্রশ্ন উঠেই পড়লো, আর আপনি আমার মনিব- আপনার পারিবারিক ব্যাপারে ভালমন্দ যে কথাই আমার কানে আসুক, তা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য। এসব কথা ভেবেই আমি বলছি হুজুর, আপনার মেয়ের সাংঘাতিক একটা দোষের খবর জেনে ফেলেছে পাঁচ-জন। এটা বর পক্ষের কানে যেতে দু'দণ্ডও লাগবে না। আর এতবড় একটা কুৎসার কথা শুনলে-।"

নায়েবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে তরফদার সাহেব বললেন- "মিয়াজান! তুমি কি বলছো?"

অবিচলিত কণ্ঠে নায়েব সাহেব বললেন, "আমি একা বলবো কেন হুজুর। সবাই যেটা জানে, সবাই যেটা স্বচোক্ষে দেখেছে- আমি সেই কথাই বলছি।"

- সবাই দেখেছে মানে?

- মানে আপনার মেয়ের চরিত্রের ব্যাপার। মেয়েদের সব সর্বনাশের বড় সর্বনাশ

www.pathagar.com

যেটা, সেটা তার হয়ে গেছে।

ফেটে পড়লেন তরফদার সাহেব। বললেন- "মিয়াজান!"

মিয়াজান মিয়া পুনরায় ভনিতার আশ্রয় নিলো। বললো-"হুজুর, এই জন্যেই তো এসব কথা বলতে চাইনে আমি। ইদানিং একটা সত্যি খবর দিতে গেলেও আপনি তা বিশ্বাস করতে চাননা, উল্টো ভয়ানক রেগে যান আমার উপর। কাজেই থাক হুজুর, এ ব্যাপারে আমি আর একটা কথাও বলতে চাইনে। পাঁচজনে যা ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে, তাতে অম্‌নি অম্‌নিই ওটা কানে পড়বে আপনার।"

তরফদার সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন- "না, শুরু যখন করেছো, তখন তোমাকেই বলতে হবে সব কথা। বলো, কি সর্বনাশ হয়েছে আমার মেয়ের? আর কে তার সেই সর্বনাশ করেছে?"

- হুজুর, দুধকলা দিয়ে যে কাল সাপকে ঘরে এনোছিলেন সেদিন, সেই লাল মিয়াই আপনার মেয়ের চরম সর্বনাশ করেছে।

- অসম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করি না। সব তোমার বাজানো কথা! তোমার ষড়যন্ত্র!

- হুজুর, প্রতিরাতে মেয়ে আপনার ঘরে থাকে কিনা সে খোঁজটা নিলেই আপনি বুঝতে পারবেন- আমার কথা সত্যি, না মিথ্যে!

- ঘরে থাকে না মানে? কোথায় যায়?

- ঐ লাল মিয়ার কাছে। প্রায় রাতেই ঐ লালমিয়া এসে আপনার মেয়েকে গোপনে বের করে নিয়ে যায়। সারারাত ফূর্তি করে ভোরের আগে পৌঁছে দিয়ে যায় আবার।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তরফদার সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন-"খামোশ্!"

নায়েব সাহেব বিনীত কণ্ঠে বললেন-"যা ঘটনা, তাই বলছি হুজুর! আমি আপনার নগণ্য দাস! আমার উপর রাগ করে লাভ কি?"

তরফদার সাহেব বললেন-"বটে! দেখাতে পারবে আমাকে?"

- নিশ্চয়ই পারবো হুজুর।

- হুঁশিয়ার। যদি দেখাতে না পারো, তোমাকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

- তা বুঝেই আমি বলছি হুজুর। দিনের মতো স্পষ্ট ঘটনা। না হলে আন্দাজে আমি এতবড় কথা কোন দিনই বলতাম না।

অসহায় শিশুর মতো থর থর করে কাপতে লাগলেন তরফদার সাহেব। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন-"আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে মিয়াজান! এমন খবর দেয়ার বদলে তুমি আমার মাথায় একটা লাঠি দিয়ে বাড়ি মারলে না কেন?"

- হুজুর!

- ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার মান সম্মান সব গেল! সমাজে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

- কি আর করবেন হুজুর! সবই অদৃষ্ট!

এমন সময় হাজির হলো আবেদ আলী। দূর থেকে 'আস্‌সালামু আলায় কুম' বলে সে এগিয়ে এলো নিকটে। হৃষ্টচিত্তে খাড়া হলো সামনে।

www.pathagar.com

এদিকে যে এত পানি গড়িয়ে গেছে, এর কোন খবরই সে রাখেনা। এসব খবর লাল মিয়া বা তার সঙ্গীরাও কেউ জানে না। বয়নার মা আর বাচনা শেখের রটানো ঐ আজগুবী দুর্নামের কথা কানে গিয়েছে তাদের। শুনে সবাই হেসে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। সঙ্গী সাথীর সাথে বসে এনিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে লালমিয়াও হাসাহাসি করেছে। এমন একটা ভিত্তিহীন বদনামে যে কোন কিছুই এসে যাবেনা তার, তরফদারের মতো লোক যে এর দাম দিবেনা এক পয়সা- এই ধারণাই সকলের। এই ধারণার বলেই তারা আজ আবেদ আলীকে পাঠিয়েছে নির্দ্বিধায়। আবেদ আলীও হৃষ্টচিত্তে এসেছে বিয়ের ব্যাপারে পাকা পাকি বৈঠকের দিন ধার্য্য করার জন্যে। সেদিক দিয়ে তাদের বিশেষ দোষ দেয়া যায় না। তাদের একমাত্র দোষ যা, তা হলো- অকারণে কাল হরণ। প্রবাদে কয় "সৎকাজ করিতে ইচ্ছা, করহ সত্বরঃ কুকাজ করিতে করো বিলম্ব বিস্তর"। লালমিয়া বা তার সঙ্গীরা কেউ এই প্রবাদের পাশ দিয়েও যায়নি। আজ না কাল, একে না ওকে, এমনই করে অহেতুক দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে এত দিনে আবেদ আলীকে পাঠিয়ে দিয়েছে যখন, তখন গুটি গেছে হাতের একদম বাইরেঃ তরফদারের মনোভাব পাল্টে গেছে পুরোপুরি। প্রতিকুল পরিস্থিতি অনুকুলে আনার আর লেশমাত্র সম্ভাবনাও নাই।

অথচ তরফদারের আগ্রহটা জানতে পারার পর পরই যদি সবিশেষ তৎপর হতো লাল মিয়া, অনেক সমস্যাই অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারতো সে।

এ সময়ে আবেদ আলীকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে বিরক্ত হলেন তরফদার সাহেব। বিব্রতভাবে মুখ তুলে বললেন-"কি চাই?"

হাসি হাসি মুখ করে আবেদ আলী বললো- আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।"

আরো অধিক বিরক্ত হলেন তরফদার সাহেব। বললেন- "কথা! কি কথা?"

- মানে লাল মিয়া আমাকে পাঠিয়েছে।

- লাল মিয়া।

- হ্যাঁ। আপনি যদি একান্তই রাজী না হোন, তাহলে ঘরজামাই থাকতেও সে রাজী। তাই কথাবার্তা পাকা করার একটা দিন-।

বোমার মতো ফেটে পড়লেন তরফদার সাহেব। চীৎকার করে বললেন- "খুন করবো।"

হচকচিয়ে গিয়ে আবেদ আলী বললো- "মানে?"

তরফদার সাহেব ঐ একই কণ্ঠে বললেন- "ঐ লাল মিয়াকে যেখানে পাবো, সেখানেই তাকে খুন করবো। একটা চরিত্রহীন লম্পটের এত দুঃসাহস যে, সে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়? সামনে পেলে ওকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। হারাম-জাদা! আমার মান সম্মানটা এমনিভাবে মারলে?"

তরফদারের এই অদ্ভূত আচরণের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে হত বুদ্ধি আবেদ আলী থতমত করে বললো-" সে কি কথা! এতে আপনার মান সম্মান মারা যাবে

www.pathagar.com

কেন? লাল মিয়া তো কোন ফালতু ঘরের ছেলে নয়। রীতিমতো একটা জোতদারের ছেলে।"

পুনরায় জ্বলে উঠলেন তরফদার সাহেব। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন-" মিয়াজান, ওকে সরে যেতে বলো। নইলে- নইলে ঐ বদমায়েশকেও আমি-"

ক্রোধের আধিক্যে তিনি কথা খুঁজে পেলেন না। চেয়ারের হাতল দুটি দুই হাতে শক্ত করে ধরে অবিরাম ফুঁসতে লাগলেন খোঁচা খাওয়া গোখরোর মতো।

এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো আবেদ আলীও। সমাদরের আশায় এসে এতবড় অপমান সে সহ্য করতে পারলোনা। বললো- "কি বললেন? আমি বদমায়েশ? কিছু না জেনে না শুনে এত বড় কথা বলতে পারলেন? ছি-ছি-ছি! এই মানুষ আপনি?"

তরফদার সাহেব চীৎকার করে বললেন- "বেরোও, বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

আর একদণ্ড না দাঁড়িয়ে ক্রোধভরে সেখান থেকে চলে গেল আবেদ আলী। যাবার সময় বললো-চেঁচাবেন না, যাচ্ছি। ওসব জমিদারী অহংকারের পরোয়া এই আবেদ আলীরা করে না।"

তরফদারের কান্ডজ্ঞান পুরোপুরি লোপ পেয়েছে তখন। এতবড় বেসামাল তিনি আগে কখনো হয়েছেন- এমনটি কারো জানা নেই। তিনি ঐ একইভাবে চীৎকার করে বলতে লাগলেন- "মিয়াজান-মিয়াজান- ধরো, ধরো ঐ বদমায়েশকে-।"

[পনের]

পরীবানুর রূপের কথা আগেই তারা শুনেছিলেন। এবার স্বচোক্ষে সে রূপ দেখে সাঁতোলের বরকর্তা মোহিত হয়ে গেলেন। এ পাত্রী চাই-ই তাদের। পরিস্থিতির শিকার হয়ে, তরফদারও খাড়া ছিলেন এক পায়ে। ফলে, পরের দিন এক কথায় পাকা হলো বিয়ের কথা। নায়েব সাহেবের ওজর আপত্তি কোন কাজেই এলো না।

সোজাপথে কাজ হলো না দেখে, নায়েব সাহেব বাঁকা পথ ধরলেন। নানা জনকে দিয়ে পরীবানুর কুৎসা কথা ইতিমধ্যেই বরকর্তার কানে দিলেন বার বার। ফাঁশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজমুখে সব কিছু খুলে বলতে না পারলেও, আকারে ইঙ্গিতে তিনি নিজেও তাঁকে সে আভাস পুনঃপুনঃ দিলেন। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সাঁতোলের বরকর্তা এসব কথায় এক বিন্দুও টললেন না। বরকর্তা হিসেবী লোক। রাজকন্যার চেয়েও সুন্দরী কন্যার সাথে ভবিষ্যতে অর্দ্ধেক নয়, গোটা রাজত্বটাই পেতে যাচ্ছেন তাঁরা। এমন দাঁও ছাড়বেন কেন তিনি? শেখের পো বাচন শেখ এ ব্যাপারে তাঁর সাথে গোপনে কথা বলতে গেলে বরকর্তা জানালেন-বিয়ের আগে অনেক কিছুই ঘটে বা রটে। ওসব কথায় কান দিয়ে এমন কনে ছাড়তে তিনি নারাজ। কিছু দোষত্রুটি থাকলেও বিয়ের পর সব কিছুই শুধরে যাবে অমনি অমনি। বাচন শেখ আরো অধিক উলঙ্গভাবে বলার চেষ্টা করলে বরকর্তা গরম কণ্ঠে বললেন-" নিকাহ্‌র বউকে নিয়েও তো ঘর করে মানুষ ! আমরা না হয় মনে করবো নিকাহ্‌ই দিলাম

www.pathagar.com

ছেলেকে! এ নিয়ে আপনাদের এত মাথাব্যথা-কিসের?"

এর পর আর এ নিয়ে বলার থাকে কি! করারই বা এর পর আর কি থাকে নায়েবের।

হতাশার অতল তলে তলিয়ে গেলেন নায়েব। তাঁর এতবড় মারণ অস্ত্র এমন আকস্মিকভাবে অকেজো হয়ে পড়ায়, নিজেও তিনি একেবারেই পঙ্গু হয়ে পড়লেন। সযতনে লালিত তাঁর দীর্ঘদিনের আশার আলো দপ্ করে নিভে গেল মুহূর্তের এক ফুৎকারেই। আশা ভঙ্গের যাতনা নিয়ে তিনি ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন অর্হনিশ- আকাশ পাতাল ঘুরতে লাগলেন বিকল্প পথের সন্ধানে।

আকাশ পাতাল ঘুরতে লাগলো পরীবানু আর লাল মিয়াও। অরণ্যের কিনারে আজও এসে বসে আছে তারা। সুপ্তপ্ত রজনী। ঘুমন্ত পৃথিবীর অতন্দ্র পাহারাদারের মতো মুখোমুখী বসে আছে দু'জন। আজ তাদের উচ্ছ্বলতা নেই। নেই কোন আবেগের নীবিড় অভিব্যক্তি। ধ্যানমগ্না ধরিত্রীর মতোই আজ তারা চিন্তা মগ্ন। তরফদার সাহেবের আচরণের আকস্মিক বিবর্তনে উভয়েই মূহ্যমান। উভয়েই দিশেহারা। বসন্তের আকাশে কাল বৈশেখীর আকস্মিক দৌরাত্ম্যে থমকে গেছে তারা। প্রতিরাতের অভ্যেসমতো আজও তারা বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বসে আছে বাক হারিয়ে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর পরীবানু বললো- "চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। পথ একটা দেখো।"

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে লাল মিয়া বললো- "কি পথ দেখবো, কিছুই স্থির করতে পারছিনে। শুধু আবেদ আলীর জন্যেই যদি তোমার বাপজানের রাগ হতো, তবু একটা কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি হঠাৎ এভাবে মত পাল্টালেন কেন, তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।

- হয়তো পাচজনে পাঁচ রকম উল্টাপাল্টা কথা তাকে বুঝিয়েছে। ঐ বাচন শেখ এসে নাকি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দুর্নাম গেয়ে গেছে।

- তাতেই তাঁর মতো লোক এমন আবে মত পাল্টাবেন?

- সেইটাই তো কথা। তার এই ভুল ধারনা তুমি আর পাঁচজনকে দিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করো।

- হ্যাঁ, ঐ টুকুই এখন ভরসা। প্রধান-মাতবর লোকদের দিয়ে তাঁকে এখন বুঝানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন পথই চোখে পড়ছেনা আপাততঃ।

- তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তা তুমি করো। কাজ না হলেও ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। যেখানে ইচ্ছে সেখানে আমাকে বিয়ে দিতে চাই লেই বিয়ে হলো?

www.pathagar.com

শেষ অবধি পথ তো একটা আছেই।

পরীবানুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো লাল মিয়া। বললো-"আছে?"

স্মিতহাস্যে পরীবানু বললো-"বিয়েতো দেবে আমাকে। আমি যদি রাজী না হয়ে তোমার হাত ধরে হারিয়ে যাই কোথাও, তাহলে আর কাকে দেবে বিয়ে?"

বিহ্বল কণ্ঠে লাল মিয়া বললো-" পরীবানু। তা পারবে? প্রয়োজন হলে পারবে তা?"

- কেন পারবোনা। আমার জন্যে এত পারলে তুমি, আর আমি এটুকু পারবোনা? তোমাকে ছাড়া আমার আর এ জীবনের কি মূল্য বলো? কিসের মোহে বেঁচে থাকবো আমি?

অনুভূতির আধিক্যে লালের কোলে ঢলে পড়লো পরীবানু। আদরে সোহাগে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো লাল মিয়া।

এমন সময় হঠাৎ এদের সামনে এসে দাঁড়ালেন নায়েব মিয়াজান আলী মিয়া। সঙ্গে তরফদার সাহেব স্বয়ং। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নায়েব সাহেব বললেন, "ঐ দেখুন হুজুর, নিজের চোখে দেখুন। মিয়াজান মিয়া কখনো মিছে কথা বলে না।"

নায়েবের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো লাল মিয়াও পরীবানু। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো তারা। এদের এ অবস্থায় দেখে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন তরফদার সাহেব। বাঘের মতো গর্জে উঠে বললেন- "পরীবানু-!"

পরীবানু কিছু বলার আগেই তিনি ছুটে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে টান মারলেন সজোরে। টানতে টানতে বললেন-"হতচ্ছারী! নচ্ছার! আয়, তোকে আমি আজ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। এতবড় বেশরম হয়ে উঠেছিল তুই? ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোর হাড় মাংস আমি আজ কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।"

হতভম্ব লাল মিয়া দুইহাত জোড় করে তরফদারের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো- "দোহাই আপনার! যা হয় আমাকে করুন। সব দোষ আমার। পরীবানুর কোন দোষ নেই। আমিই ওকে-"

পুনরায় গর্জে উঠলেন তরফদার। বললেন-"খামোশ। বেহায়া-লম্পট-নেমখহারাম! তোমার এত দুঃসাহস যে আমার মেয়েকে কুপথে টেনে আনো? তোমাকে আমি সহজে ছাড়বো ভেবেছো? যত শিগ্গির পারি, তোমাকেও জীবন্ত পুঁতে ফেলে তবে আমি থামবো!"

লালমিয়া কাতর কণ্ঠে বললো, "তাই করুন। আমি সইচ্ছায় আপনার হাতে ধরা দিচ্ছি। আপনি আমাকে নিয়ে গিয়ে এই রাতেই পুঁতে ফেলুন। আমি একটুও প্রতি বাদ করবোনা। তবু দোহাই আপনার, পরীবানুকে আপনি কিছু বলবেন না। ওর একটুও দোষ নেই।"

www.pathagar.com

এর জবাবে তরফদার সাহেব আর একবার গর্জে উঠে বললেন- "চোপরাও শয়তানের বাচ্চা! তোমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে, আজ আমার পাইক-পেয়াদা সঙ্গে নেই।"

অতঃপর পরীবানুর হাতে টান দিয়ে বললেন, "আয় নচ্ছার! আগে তোর ব্যবস্থা করি, তারপর দেখছি সব।"

পরীবানুকে টেনে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে তোলেন তরফদার সাহেব। মিলিয়ে গেলেন মিয়াজান আলী মিয়া। কিংকর্তব্যবিমূঢ় লালমিয়া ঐখানে দাঁড়িয়ে রইলো প্রস্তর মূর্তির মতো।

এরপর শুরু হলো সমঝানোর পালা। লাল মিয়ার অনুরোধে পর পর কয়েকদিন আশ-পাশের গন্যমান্য-প্রধান মাতবর লোক এসে তরফদারকে বুঝালেন। লালমিয়া আর পরীবানু পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে, এদের মধ্যে বিয়ে হলে অত্যন্ত সুখী হবে এরা নইলে জীবন দুটি একেবারেই বরবাদ হয়ে যাবে-এসব কথা বললেন। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। তরফদার সাহেব পাহাড়ের মতো অনড় হয়ে রইলেন। বললেন, লাল মিয়ার উপর তাঁর আর একবিন্দুও আস্থা নেই, তিনি পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন সাঁতোলের বরপক্ষকে, কথা তার কারো কথাতেই নড়চড় হতে পারে না।

ফলে, হতাশ হয়ে ফিরে এলেন সকলেই।

খবর শুনে পাগলের মতো ছুটে এলো হারু সাঁতাল। এসেই সে হুড়মুড় করে পড়ে গেল তরফদারের পায়ের উপর। পায়ে তাঁর একটানা মাথা কুট্‌তে লাগলো। বলতে লাগলো- "তু হামারে খুন করি দে জমিন্দার বাবু, হামার মাথা তু পা দিয়ে গুঁড়িয়ে দে। কিন্তুক ই সব্বনাছ তু করিস্‌নে জমিনদার বাবু। ইতে তুর পরীবানু আত্মঘাতী হোবে, উ লালমিয়া পাগল হই যাবে।"

তরফদার সাহেব হারুকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। বরং তাকে উত্তেজিত কণ্ঠে- নিমখ হারাম, মিথ্যাবাদী-বিশ্বাসঘাতক-ইত্যাদি বলে একটানা ভর্ৎসনা ও গালীগালাজ করলেন। তার জবাবে হারু সাঁতাল বার বার বলতে লাগলো- "লাল মিয়া ছেলিয়া মানুষ! উর কছুর তু মাফ করি দে বাবু। লাল মিয়া আর পরীবানুর জব্বোর আল্‌বাছা হই গেইঁচে। ছোর আদমী তা জানিয়া লিচে বটেক। ই লিয়া পরীবানুর বদনামী হই গেইচে। ই বদনামী তু ঢাকিয়ে দে। বদনামীর পর আর কেহু পরীবানুরে ছুখ দেবেক লাই বাবু, দুখ দেবেক বটে, বহুত দুখ।"

নাছোড় বান্দা হয়ে পায়ের উপর পড়ে রইলো হারু সাঁতাল। তার হাত থেকে পা দুঁটো খুলে নিতে না পেরে অবশেষে বিরক্ত হয়ে তরফদার সাহেব বললেন-"ঠিক

www.pathagar.com

আছে। আমার মেয়ের বদনাম শুনে যদি সাঁতোলের বরপক্ষ পিছু হটে দাঁড়ায়, তহন অন্য চিন্তা করা যাবে। এখন তুই সর।"

হারু সাতাল ফিরে এসে লাল মিয়াদের এ সংবাদ দিলে তারা অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেলো। স্থির হলো- অচিরেই সাঁতোলে লোক পাঠিয়ে, সব কথা খুলে বলে, তাদের নিরস্ত করতে হবে। তরফদার সাহেব কে সমঝানোর চেষ্টাও অব্যহত রাখতে হবে।

সাঁতোলে যাওয়ার দায়িত্ব হারু সাঁতালই সাগ্রহে গ্রহণ করলো। লাল মিয়ার সঙ্গীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো তরফদারকে বোঝানোর মতো আরো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানে।

সেদিন রাতে তরফদার সাহেব পরীবানুকে টেনে এনে ঘরে তুলে তালাবন্ধ করলেন। অতঃপর তাকে গৃহবন্দী করে পাহারাদার লাগালেন তার পেছনে। দিনের বেলায় তার চলাফেরা গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করলেন। রাত্রিকালে শয়নঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে পাহারাদার বসিয়ে দিলেন দরজায়। লাল মিয়ার সাথে আর কোনভাবেই যোগাযোগ না করতে পারায়, খাঁচাবন্দী পাখীর মতো পরীবানু অহোরাত্র ছটফট করতে লাগলো।

পরিস্থিতির জটিলতায় বিলবাথানে যাতায়াত লালমিয়াকেও খাটো করতে হলো। তাকে ঘিরে সত্য মিথ্যে অনেক কথা-অনেক কাহিনী- আগে থেকেই ছড়িয়ে আছে বিলবাথানে। তরফদার সাহেবের প্রত্যাখ্যান তার উঁচু মাথা আরো অধিক নীচু করে দিয়েছে। এখন তাকে যথা সম্ভব পাঁচজনের দৃষ্টি এড়িয়েই চলতে হয়। উপযুক্ত কারণ ছাড়া এখন আর সে অম্‌নি অম্‌নি বিল-বাথানে ঘুরে বেড়াতে পারে না। নানারকম ঔৎসুক্যজনিত প্রশ্ন আসে সামনে।

ঐ ঘটনার পর সে আর একবারই বিলবাথানে এসেছে। মতিজানের খবর পেয়ে আজ আবার সে পা বাড়ালো বিলবাথানের দিকে। পথ ঐ একটাই। তাই চক্ষুলজ্জার বালাই কিছু থাকলেও, তরফদারের বাড়ীর নীচের ডহর দিয়েই হাঁটতে লাগলো লালমিয়া।

বাঁধন যত শক্ত হয়, বাঁধন খোলার প্রয়াসও তত তীব্র হয়। অত্যধিক কড়াকড়িও অধিক দিন টিকেনা। ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে। হলোও শেষে তা-ই। পরীবানুর পেছনে কয়েকদিন ছায়ার মতো এঁটে রইলো দাসদাসী। অন্দর মহলের আঙ্গিনাতেই ঘিরে রাখলো তাকে। এখন তারা আর তার পিছে পিছে ঘুরে না। ফাঁকে থেকেই লক্ষ্য রাখে তার উপর। তার চলাফেরাও আর আঙ্গিনার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। এখন সে অন্দর মহলের বাইরেও মাঝে মধ্যে আসে। বাড়ীর পেছনে অল্পসল্প ঘোরাফেরাও করে।

www.pathagar.com

সকলের অলক্ষ্যে আজও সে বেরিয়ে এলো বাইরে। বাড়ীর পিছে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেলো লালমিয়াকে। লালমিয়াকে দেখেই সে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। দ্রুতপদে অনেক খানি ফাঁকে এসে দাঁড়ালো। এবার লালমিয়াও দেখতে পেলো তাকে। চোখা চোখী হতে হতেই পরীবানু হাত নেড়ে ইশারা দিলো লাল মিয়াকে। ফুল বাগানের পেছনে সেই বনের দিকে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলো তাকে।

এ ইঙ্গিত লালমিয়া অগ্রাহ্য করতে পারলো না। বিরহের যাতনায় কাতর ছিল সেও। পরীবানুকে দেখে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো তারও মন। সে রাতের সেই অপ্রীতি কর স্মৃতি মুহূর্তে উবে গেল প্রেম বহ্নির তাপে। সে বদল করলো গন্তব্য স্থল। এদিক সেদিক ঘুরে এক ফাঁকে সে ঢুকে পড়লো নির্দ্দিষ্ট সেই অরণ্যে।

কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও উৎসাহীদের দৃষ্টি সে এড়িয়ে যেতে পারলো না। ফাঁকি দিতে পারলো না আগ্রহীদের চোখকে। নায়েবের এক শুভাকাঙ্খী এটা লক্ষ্য করা মাত্রই খবর দিলো নায়েবকে। নায়েবের যদিও আর সেই অতি আগ্রহ ছিল না, ফস্‌কে যাওয়া হাতের শিকার সাপে খাওয়াও যা, বাঘে খাওয়াও তাই-

- ব্যাপারটা এখন যদিও এই রকমই তার কাছে, তবু কিছুটা উৎসাহের বশেই পায়ে পায়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল সেও।

লাল মিয়াকে ইঙ্গিত দিয়ে পরীবানু আর দাঁড়ালোনা। এদিক ওদিক চেয়েই সে তখনই ঢুকে পড়লো ফুল বাগানে। ফুল বাগান পেরিয়ে ফলবাগানের ভেতর দিয়ে সে দ্রুত পদে চলে এলো তাদের সেই প্রথম দিনের মিলনের নিবিড়তম স্থানে। অনুমানের জোরেই লাল মিয়াও হাজির হলো সেখানে। লালমিয়া এসে দাঁড়াতেই পরীবানু ছুটে এসে হাত ধরলো লাল মিয়ার। কোন প্রকার ভূমিকায় না গিয়ে সে সরাসরি বললো-"চলো, আমাকে নিয়ে চলো। শিগ্গির!"

বিস্মিতকণ্ঠে লাল মিয়া বললো-"কোথায়?"

ঐ একইভাবে পরীবানু বললো- "যেখানে তোমার ইচ্ছে। নইলে আর আমাকে পাবে না।"

- মানে?

- আমাকে বাপজান বন্দী করে রেখেছে। জোরদারভাবে বিয়ের আয়োজন চলছে। দিনরাত তা নিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। যতদূর বুঝতে পারছি- কোন হৈ চৈ না করে যে কোন দিন যে কোন সময় লাগিয়ে দেবে বিয়ে।

- বলো কি।

- আমার উপর কড়া নজর সবার। পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে কোনমতে পালিয়ে এসেছি এখন। আর তা পারবোনা। এছাড়া, এখনই এটা জানাজানি হয়েও যেতে

www.pathagar.com

পারে। তা যদি হয়, দেরী করলে- আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে বাপজান।

- পরীবানু!

- এবার তাহলে শেকল দিয়েই বেঁধে রাখবে। না-না, আর আমি বাড়ী ফিরে যাবোনা। চলো, সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এলো। এ সময়টুকু বনের মধ্যেই দূরে কোথাও লুকিয়ে থাকি। আঁধার হলেই তোমার যে দিকে ইচ্ছে, নিয়ে চলো আমাকে। নাও, শিগ্গির।

- তা-মানে-।

- দোহাই তোমার। আর কথা বলার সময় নেই। এমন সুযোগ আর পাবে না।

- কিন্তু-

থমকে গেল পরীবানু। তার এই অপরিসীম আগ্রহের পেছনে লাল মিয়ার আদৌ কোন সমর্থন খুঁজে না পেয়ে আঁতকে উঠলো সে। বিস্মিত কণ্ঠে বললো-

- "মানে?"

- এটা সম্ভব নয় পরীবানু। এত নীচে নামা যাবে না কিছুতেই। তুমি এভাবে বেরিয়ে গেলে আর আমি তোমাকে এভাবে বের করে নিয়ে গেলে, তোমার বাপও লজ্জায় ঘৃণায় আত্মহত্যা করবে, আমারও বাপদাদার নাম ডুবে যাবে।

- সেকি! তাহলে তুমি আমাকে আর চাওনা? মানে আমার প্রতি তোমার আর কোন আকর্ষণ-

অন্তরাত্মায় আঘাত লাগলো লাল মিয়ার। সে ব্যথিতকণ্ঠে বললো- "পরীবানু। তুমি এটা বলতে পারলে? তোমাকে আমি চাইনে-এটা স্বপনেও ভাবতে পারো তুমি?"

- কিন্তু-

- চাই। হাজারবার, লক্ষবার চাই। তোমাকেই যদি না চাই, তাহলে এ দুনিয়ায় আর চাওয়ার আমার আছে কি? কিন্তু সেটা এভাবে নয়।

- এভাবে না হলে আর পাবেই না আমাকে। আমি কবুল করি আর না করি, আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে অন্যের হাতে তুলে দেবে।

লাল মিয়ার অন্তরে দূরন্ত লালমিয়া মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। শক্ত হলো পেশী। জ্বলে উঠলো চোখ। সে দৃঢ়কণ্ঠে বললো-" অসম্ভব! দরকার হলে, বিয়ের আসর থেকেই বীরের মতো তুলে আনবো তোমাকে। সবাইকে জানিয়ে দেবো- পরীবানুর বিয়ে অনেক আগেই হয়ে গেছে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে হয়ে গেছে সে বিয়ে। যার সাথে হয়েছে, সে-ই তাকে নিয়ে যাচ্ছে আজ।"

লাল মিয়ার এ আশ্বাসের উপর পরীবানু নির্ভর করতে পারলো না। বললো-

www.pathagar.com

"দোহাই তোমার, পায়ে পড়ি, পাগলামী করোনা।

একই রকম প্রত্যয়ের সাথে লাল মিয়া ফের বললো- "পাগলামী নয় পরী, ইন্‌শা আল্লাহ আমার সাথেই বিয়ে হবে তোমার। আমার ঘরেই যাবে তুমি। আগে সোজা পথে হেঁটে দেখি। বাঁকা পথতো রইলোই। এখন খবর যা পাচ্ছি, তাতে সহজ আর শান্তিপূর্ণভাবেই কাজ উদ্ধার হতে পারে। আমাকে তোমাকে নিয়ে যে ব্যাপারটা রটে গেছে, তাতে নিশ্চয়ই আর কোন বর তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে না। পরিস্থিতি এমন হলে, তোমার বাপ তোমাকে আমার হাতেই দেবেন- এমন আভাস পেয়েছি।"

দ্বিধাগ্রস্ত পরীবানু অসহায় কণ্ঠে বললো-

- "লাল!"

- তুমি যাও লক্ষ্মীটি! তোমার বাপকে বোঝানোর জন্যে অনেক গণ্যমান্য মানুষ এখনও চেষ্টা করছে। কি ফলাফল হয় দেখি। কাজ না হলে সবার চোখের সামনে দিয়েই তুলে আনবো তোমাকে।

- কিন্তু আজই যদি দিয়ে দেয় বিয়ে?

- আমরা সব সময় নজর রাখছি। তেমন হলে আজই আমরা তুলে আনবো তোমাকে। তুমি শুধু প্রস্তুত থেকো। আমি বা আমার কোন লোক গিয়ে তোমাকে ইশারা দেয়ার সাথে সাথেই তুমি দ্রুত পদে বেরিয়ে আসবে বাড়ী থেকে। ভয় পেয়োনা যেন।

- মানে?

- লোক তো আমরা এক দুইজন নই। বিশ ত্রিশজন লোক এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বো ডাকাতের মতো। আতংকের সৃষ্টি করবো। সবাই যখন সে কারণে দিশেহারা হয়ে পড়বে, সেই ফাঁকে আমাদের যে কেউ ডাক দেবে তোমাকে। তখন তুমি কোন দিকে না তাকিয়ে চলে আসবে তার সাথে। ব্যস্! তোমাকে হাতে পেলেই সবার চোখের সামনে দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলে আসবো আমরা।"

দিশেহারা কণ্ঠে পরীবানু বললো-"লাল! লালমিয়া!"

লালমিয়া পরীবানুকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললো-" কোন চিন্তা করো না পরী। তুমি আমার, আমার, ইন্‌শা আল্লাহ আমার।"

বিহ্বল পরীবানু অস্ফুট কণ্ঠে বললো- "প্রিয়তম!"

অল্প একটু আগে নায়েব সাহেব চুপি চুপি এসে অদূরে এক পাতা ঘেরা ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছু দেখতে তিনি পেলেন না। কিন্তু লালমিয়ার পরিকল্পনার কথাটা মোটামুটি শুনতে পেলেন আগাগোড়াই। তিনি বুঝতে পারলেন- ওরা ডাকাতের মতো হামলা করবে বিয়ের দিনে। ইশারা পেলেই বেরিয়ে আসবে পরীবানু। একটু চিন্তা করলেন নায়েব সাহেব। অতঃপর তার মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আনন্দে। এরই মধ্যেই উজ্জ্বল এক আশার আলো খুঁজে পেলেন তিনি। আর একদণ্ড না দাঁড়িয়ে তিনি সেখান থেকে সরে এলেন তৎক্ষণাৎ।

www.pathagar.com

[ষোল]

পরীবানুর সন্দেহটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। হঠাৎ করে বদলে গেল বিয়ের দিন। মাসের জায়গায় মাঝে রইলো একদিনের ব্যবধান। সাঁতোল থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলো হারু সাঁতাল। তার কথায় একটুও কান দেয়নি বরপক্ষ। বরকর্তা বিত্তলোভী মানুষ। বিত্তের চাইতে কোন কিছুই বড় নয় তাদের কাছে। বিষয় পেলে বিষের পেয়ালায় মুখ লাগাতেও রাজী তারা। বিয়ের ব্যাপারে বিষয়টাই অধিক বিবেচ্য তাদের। পাত্র পাত্রীর প্রশ্ন আসে পরে। নিজেরাও তাই করেছেন, ছেলেমেয়েদেরও বিয়ে দিচ্ছেন বিত্ত দেখে, ব্যক্তি দেখে নয়। স্বভাব চরিত্রের প্রশ্নটা তাদের কাছে ঠুনকো। তাদের ঘরের মেয়েদেরও অনেক ইতিহাস আছে। অনেক ঘটনাই তাদের মেয়েরাও ঘটিয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর সবকিছুই তলিয়ে গেছে অম্‌নি অম্‌নি। দিব্যি তারা ঘর করছে অন্যের ঘরে গিয়ে। পরীবানু কনে হিসেবে হাজারগুনে লোভনীয়। লক্ষগুণে লোভনীয় পরীর বাপের সম্পত্তি। সিকি নয়, অর্দ্ধেক নয়, একটা গোটা জমিদারী। দুধেল গরুর লাথিগুতো হজম করে সকলেই। পরীবানুর চরিত্র-দোষ এমন কি আর গুরত্বপূর্ণ দিক। মধু থাকলেই ভোমরা বসে ফুলে। তাই বলে কি কম হয়ে যায় ফুলের দাম? একভাবে না একভাবে ঐ বিষয় বিত্ত হাত করার পর, পরীবানু বাগের মধ্যে না এলে, একবার কেন, দশবার তারা বিয়ে দেবেন ছেলের। পুরুষ মানুষের এমন কিছু এসে যায় না তাতে।

কাজেই হারুর কথায় মোটেই তাঁরা পিছের দিকে হটেন নি। বরং বলা যায়, সামনের দিকে এগিয়ে এসেছেন আরো ক'ধাপ। প্রতিবন্ধকতার আভাস পেয়ে সতর্ক হলেন বরপক্ষ। সম্পর্কটা বানচাল হওয়ার আশংকায় আঁতকেও উঠলেন অনেকে। ফলে, যথাশীঘ্র সম্ভব বিয়েটা সেরে নেয়ার প্রস্তাব সহ তাঁরা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালেন বিল বাথানে।

বিল বাথানের তরফদারও এই একই চিন্তা করছিলেন। পরিস্থিতির তুলনায় বিয়ের তারিখ পেছনে গেছে অনেকখানি। আরো কাছে এগিয়ে আনা উচিত ছিল তারিখটা। এখন যে কোনদিক দিয়ে কি ঘটে, তার ঠিক ঠিকানা কি? মনে তার হাজার রকম দুশ্চিন্তা! মেয়ের এই দুর্নাম শুনে সাঁতোলের বরপক্ষই যে পিছু হটে যাবে না, তা কে বলতে পারে? তাই যদি যায়ই, তা হলে তাঁর করণীয় কি? কুৎসার কথা শুনে যদি আর কোনই ভাল ঘর থেকে বিয়ের প্রস্তাব না আসে, তাহলেই বা কি উপায় হবে? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেও শান্তি তাঁর কোথায়? এতটার পর লালমিয়াকে জামাই করে ঘরে তুলবেন কেমন করে? তা তুললেই বা আর পাঁচজনে বলবে কি? এদিকে আবার পরীবানুও যে কখন কি করে বসে, তারও তো কোন নিশ্চিয়তা নেই! সে পশু নয়, মানুষ। একটা সজ্ঞান মানুষকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় কতক্ষণ? পা যখন

www.pathagar.com

পিছলে গেছে একবার, এখন যে কোন সময় পালিয়ে যেতেও পারে সে। তা গেলে তো আর ঘর ছেড়ে বাইরে আসার মুখ থাকবে না তাঁর।

পুনশ্চঃ তাঁর ভাবনা- তিনি যা করছেন তা সঠিক হচ্ছে কি না! লাল মিয়ার চরিত্রটা যা-ই হোক, পরীবানুর পাশে লাল মিয়াকেই মানায়। এমন জুটি দুটি পাওয়া দুষ্কর। মিল যখন হয়েই গেছে দু'য়ের, তখন জোর করে এই জোড়াটা ভেংগে দেয়া উচিত কিনা আদৌ। তাতে পরীবানুর ভবিষ্যতটা সুখের হবে কিনা। লাল মিয়া কি সত্যি সত্যিই ভালবাসে পরীবানুকে? তা না হলে সে দিন সে পালিয়ে যায়নি কেন? ধরা পড়ার পর সবদোষ সে স্ব-ইচ্ছায় নিজের ঘাড়ে নিতে চাইলো কেন? পরীবানুর জন্যে এত অনুনয় করলো কেন? নাকি সবই তার অভিনয়!

তরফদারের এই দোদুল্যমান মনটাকে মিয়াজান আলী মিয়া আবার শক্ত করে দিলেন। তিনি কিছু দিন নিরুৎসাহ থাকায় তরফদার সাহেবের রোষানল ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছিল। হঠাৎ আবার উৎসাহী হয়ে উঠে সে আগুন তিনি দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিলেন পুনরায়। তরফদারকে জানালেন-পরিস্থিতি একেবারেই নাজুক। অবশিষ্ট মানটুকুও তরফদারের আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। যা ঘটেছে, তা সামান্য। অল্পলোকে জানে। ওটা চাপা পড়বে অল্প দিনেই। কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছে, তা সাংঘাতিক! এটা আর তিনি ইহজনমে চাপা দিতে পারবেন না। আর এর ফলে, তাঁকে উঁচু মাথা নীচু করে জীবনটা কাটাতে হবে চোরের মতো। ঘটনাঃ সেদিনের সেই অপমান ঐ লালমিয়া আদৌ ভুলেনি। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সে এখন মরিয়া। ওর বাপটার মতো তরফদারকে হেয় করতে সেও এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁকে জব্দ করার জন্যেই পরীবানুকে বের করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে উঠে পড়ে লেগেছে। তার গুণ্ডার দল ছাড়াও, চারদিকে সে কারণে লোক লাগিয়েছে প্রচুর। চঞ্চলমতি মেয়েটা ঐ ধূর্তের দুরভি সন্ধি বুঝে উঠতে না পেরে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তৈরী হয়ে। সুযোগ পেলেই শেকল কেটে পালিয়ে যাবে সেও।

এর পরিণামটা যে কি, সে কথাও মিয়াজান মিয়া তরফদারকে ব্যাখ্যা করে শুনালেন। পরীবানুকে লালমিয়ার এই নেয়াটা সংসার করার জন্যে নয়, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। অনেক মেয়েকেই সে এ জীবনে এমন ভাবে নিয়েছে। কিন্তু সে সংসার করেনি একজনকেও নিয়ে। এর নজির আছে ভুরি ভুরি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে কয় দিন ফূর্তি করার পর নর্দমায় ছুড়ে দিয়েছে সব মেয়েকেই। পরীবানু কে দেবে। ফলে, একুল ওকুল হারিয়ে, সব কিছু খুইয়ে, মেয়েটাকে ঘুরতে হবে পথে পথে। এরপর আর মুখ দেখানোর পথ থাকবে না তরফদারের।

এর সমাধানটাও তরফদারকে দিয়ে দিলেন নায়েব সাহেব। যে বিয়ের ব্যাপারে তিনি প্রতিবন্ধকতা করেছেন, সেই বিয়েটাই সত্বর সমাপ্ত করার পক্ষে তিনি সাফাই গাইলেন তোড়জোরে। জানালেন, অতিসত্বর বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেলতে পারলেই সব বিপদই এড়ানো যাবে সহজে। বিয়েটা একবার হয়ে গেলেই সব চাতুরীই বানচাল হবে তাদের। এখন একমাত্র করণীয়, সাঁতোলে লোক পাঠিয়ে যে কোন

www.pathagar.com

একটা অজুহাতে বিয়ের দিন হাতের কাছে এগিয়ে আনা।

সবশেষে নায়েব সাহেব একথাও শুনালেন যে, পরীবানুর বাইরে কোথাও বিয়ে হোক- এব্যাপারে আপত্তি তাঁর বরাবরই। কিন্তু পরিস্থিতি চিন্তা করে এবং হুজুরের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এ সুপারিশ নিজেই তিনি করছেন। হুজুরের মানসম্মানের চাইতে আর কোন কিছুই বড় নয় তাঁর কাছে।

নায়েবের পরামর্শ তরফদার সাহেব চাননি। কিন্তু নায়েবই তাঁর একমাত্র হাতের কাছের লোক। ভালমন্দ সব ব্যাপারেই অল্প বিস্তর কথা বলার একমাত্র অবলম্বন। এ কারণেই কথায় কথায় এসব কথা বার বার তাঁকে শুনানোর সুযোগ পেলেন তিনি। বিভ্রান্ত মনের উপর যেদিকটাই জোর দিয়ে চাপিয়ে দেয়া যায়, সেই দিকটাই গুরুত্ব পায় ক্রমে ক্রমে। এখানেও তাই হলো। নায়েবের কথাই বিশ্বাস করলেন তরফদার সাহেব। নায়েবকে আর অবিশ্বাস করার কারণও তার ছিলনা। পরীবানুর মতিমতি, লালমিয়াদের আনাগোনা-এসব ব্যাপার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেও তিনি বুঝলেন, নায়েবের কথাই ঠিক। যথাশিগ্গির বিয়েটা তার সেরে ফেলতে না পারলে, মান সম্মানটা যে কোন সময় বিপন্ন হবে তাঁর।

কিন্তু নায়েব কাউকে বিনা গরজে পরামর্শ দেন না। বিনা স্বার্থে নায়েব সাহেব হাঁচেনও না পর্যন্ত। তাঁর এই অতি আগ্রহ অকারণে নয়। এর পেছনে কারণ আছে মস্তবড়। মরা গাঙে বান ডেকেছে নায়েবের। হতাশার অন্ধকারে দপদপে আশার আলো তাঁর চোখের সামনে জ্বলে উঠেছে আবার। তাই, ছেড়ে দেয়া হাল খানা লুফে নিয়েছেন তিনি। চেপে ধরেছেন শক্ত হাতে। নায়েব সাহেবের লক্ষ্যবস্তু ঐ একটিই। পরীবানু। এবার তা আর ছেলের জন্যে নয়, তাঁর নিজের জন্যে। অভিষ্ট সিদ্ধির পথটাও এবার স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক।

নায়েব সাহেবের পরিকল্পনা পরিস্কার। লাল মিয়ার পরিকল্পনাই পরিকল্পনা তাঁর। বিয়ের আসরে হানা দেবে লালমিয়ারা। সৃষ্টি করবে আতংক। এরই মাঝে একজন এসে ইশারা দেবে পরীবানুকে। বেরিয়ে আসবে পরীবানু। কিন্তু লাল মিয়ার লোক এসে ইশারা দেয়ার আগেই যদি সেই সময় ইশারা দেয় মিয়াজান মিয়ার লোক, তা হলেও বেরিয়ে আসবে পরীবানু। রাতের অন্ধকারে বাড়ীর বাইরে এলেই তার চোখমুখ বেঁধে তাকে দূরান্তে পাচার করে দিলেই, পরীবানু তাঁর। অপহরণের দায় দায়িত্ব লাল মিয়াদেব। ফাটক খাটবে তারা, মজা লুটবেন তিনি। পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এমন মজাসে মজা লুটার মওকা মিয়াজান মিয়া ছাড়তে যাবেন কোন দুঃখে? আর কি মজা লুটাই শুধু? আরো তো অনেক আশা আছে। ঠেলায় পড়লে বাঘেও যখন ধান খায়, তখন পরীবানু তাঁকে মেনে নিতে কতক্ষণ? মেনে নিলে তো কথাই নেই। বিশনখ তাঁর ঘিয়ে। রাজকন্যা তো হলোই। তরফদারের জীবদ্দশায় নাহোক, তরফদারের মৃত্যুর পর গোটা রাজ্যটাও তাঁর। না মানলেও পরোয়া নেই। কিছু দিন ফূর্তি লুটার পর দুনিয়ার মুখ পরীবানুকে আর দেখতে দেয়া হবে না।

ধূরন্ধর লোক মিয়াজান মিয়া। রাজধানীতে বেগার খাটার কালে এসব কাজে হাত

www.pathagar.com

পাকিয়েছেন ভাল ভাবেই। প্রয়োজন তার অনেক। উপার্জ্জনের পথ ছিল না নির্দ্দিষ্ট। পয়সার লোভে অনেক কুকাজ করেছেন তিনি জীবনে।

সাহেব-সুবা আর আমলা ফোড়েলের মনোরঞ্জনে অনেক নারী ঘটিত কাজের সাথেই সংযোগ ছিল তার। সরবরাহ-গায়েব-গুম, অনেক কিছুতেই তালিম নিয়েছেন তিনি। অতীতের ব্যাপার হলেও অভিজ্ঞতাটা খোয়া যায়নি কিছুই। দেহের বল খাটো হয়ে এলেও মাথার তেজ লোপ পায়নি একটুও। বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে অনেক। তার দুষ্কর্মের দোসরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আজো আছে দূর-দূরান্তে- নানা স্থানে। ইঙ্গিত পেলেই তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে অনেকেই।

একারণেই নায়েব সাহেব পা বাড়িয়েছেন এ পথে। পরিকল্পনা তৈরী করে ইতিমধ্যেই নেমে গেছেন কাজে। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ শেষ হয়েছে তাঁর। পরীবানুকে রাখার মতো উপযুক্ত আশ্রয়ও খুঁজে পেয়েছেন দূরান্তে। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ উৎরানোর লোকজনও হাত করেছেন তিনি। লাল মিয়ারা জেদী লোক এটা তাঁর জানা। বিয়ের আসর বসলেই যে ডাকাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে লাল মিয়ারা, এ সম্বন্ধে তিনি একদম নিশ্চিন্ত। তাই, জালটা তাঁর মোটামুটি কায়দা মতোই বিছিয়ে নিয়ে অধীর আগ্রহে বসে আছেন নায়েব সাহেব। বসে আছেন অনুষ্ঠানটা অতি সত্বর শুরু হওয়ার অপেক্ষায়।

অনুষ্ঠানুটাও এগিয়ে এলো হাতের কাছে। নায়েব সাহেবের পরামর্শে তৈরীই ছিলেন তরফদার সাহেব। সাঁতোল থেকে বরপক্ষের লোক এসে তাঁকে ঐ একই প্রস্তাব দিতেই বর্তে গেলেন তরফদার। পাঁচজনের পাঁচরকম কথায় যে পিছিয়ে যাননি তাঁরা, বরং প্রতিবন্ধকতার গন্ধ পেয়ে অতি সত্বর সেরে নিতে চান কাজ-এটা জেনে হাতে একদম আকাশ পেলেন তিনি। এক কথায় পাল্টে গেল বিয়ের দিন। স্থির হলো- লোকা চার যা করার তা বিয়ের পরও করা যাবে, অনাড়ম্বরভাবে আগামী পরশুই হয়ে যাবে বিয়েটা। সাঁতোলের প্রেরিত লোক ফিরে যাবে আজই। আগামীকাল তৈরী হয়ে পরশুদিনই চলে আসবে বর নিয়ে। এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত করে ফিরে গেলেন সাঁতোলের লোক। মাঝখানে আর মাত্র একটা দিন। তরফদার সাহেবও কোমর বেঁধে লেগে গেলেন আয়োজনে।

শুনে স্তম্ভিত হলো পরীবানু। তার পেছনে কড়া পাহাড়া লাগানো হয়েছে তখন। পাশ ফেরার অবকাশও রাখা হয়নি আর। আপ্রাণ সে চেষ্টা করলো খবরটা লাল মিয়াদের পৌঁছে দেয়ার জন্যে। কিন্তু তরফদারের ভয়ে তার সাহায্যে একটা লোকও এগুলো না ক্ষোভে-দুঃখে হতাশায় সে অবিরাম মাথা কুটতে লাগলো।

পরীবানু পৌঁছে দিতে না পারলেও, লালমিয়াদের কানে গেল খবরটা। শুনে স্তম্ভিত হলো লালমিয়া। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সমজান-বছির-বাহার। আগের দিন খবর নিয়েও এ খবর তারা পায়নি। বিয়ের দিন সকাল বেলা খবর গেল তাদের কানে। এত সতর্কতা সত্বেও এ খবর তারা এর আগে যোগাড় করতে পারেনি। সময় অতি সংকীর্ণ সকলকে এত্তেলা দিয়ে নিয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে জড়ো হলো

www.pathagar.com

বিলবাথানের অরণ্যে। উত্তেজনা বিপুল। পরীবানুকে লুটে আনতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেল সমজান- বছির বাহারেরা। তরফদারের একগুঁয়েমী আর তারা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। এর আগেও তারা পরীবানুকে জোর করেই তুলে আনতে চেয়েছে। কিন্তু রাজী হয়নি লালমিয়া। পরীবানু স্বইচ্ছায় চলে আসার পরও যে লাল মিয়া তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে কয়দিন আগে, এটা শুনেই খুন চাপলো সবার মাথায়। শুধু ওস্তাদ বলেই তার গায়ে তারা হাত দিলো না কেউ, কিন্তু মুখে তাকে যার পরনেই ভৎসনা করলো সকলে। আজ তারা মরিয়া। দু'চারজনকে লাশ হতে কিংবা দু'দশটাকে লাশ বানাতে হলেও তারা পরীবানুকে আনবেই আজ তুলে। তখনই তারা রওনা হবে, কিন্তু আপত্তি তুললো দু'এক একজন। তারা বললো- দিবালোকে হানা দিলে চারদিক থেকে ছুটে আসবে লোকজন। তাতে পরিস্থিতি বিগ্‌ড়ে যেতেও পারে। বর যখন আসেনি আর বিয়ে যখন রাতে, তখন নিরাপদে কাজ উদ্ধার করতে হলে, তাদের ধৈর্য্য সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এই প্রস্তাবই মেনে নিলো সকলে। তারা বসে রইলো সূর্যাস্তের অপেক্ষায়।

অনাড়ম্বর হলেও বিয়ের ব্যাপার একটা। দু'চারজন নিকট-আত্মীয়, দু'পাঁচজন পাইক-পেয়াদা, দু'দশটা কাজের লোক আর দশবিশজন পাড়া প্রতিবেশীর আগমনে সরগরম হয়ে উঠলো তরফদারের বাড়ী। এছাড়া, আড়ম্বর অনাড়ম্বর এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না গ্রামঞ্চলের রমনীকুল। যেমন তেমন বিয়ে একটা পেলেই তারা খুশী। তখন তাদের বুকে উৎলে উঠে বিয়ের গান। বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে। তারা ধরে রাখতে পারেনা। কাজেই বিয়ে পেলে গান তারা গাইবেই। বাধা-নিষেধ মানবে না। অন্দর মহলে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বিয়ের গান। প্রথম দিকে থেমে থেমে, অতঃপর একটানা। গায়িকারা অধিকাংশই রবাহুত। স্বইচ্ছায় এসেই তারা ঢুকে পড়ছে দলে, গলা দিচ্ছে গানে। কেউবা গুণ গুণ করে। কেউবা তার স্বরে। বেলা যতই পড়ে আসছে, গানের আওয়াজ তীব্র হচ্ছে ততইঃ

"কোন কোন ঘরে দেবো বিছানা,
ইও তো আন্ধারী রাত ....."

কিংবা, "বরের বাপের মুনে কয় খাসীর বাল্লা পেলে হয়।
বাহারে বরের বাপ তারিফ করি তোমারে....."।

সন্ধ্যার আগে শোর উঠলো- বর আসছে- বর আসছে"। সূর্য্যাস্ত সামনে নিয়ে বর সহ হাজির হলেন বর পক্ষ। সঙ্গে কিছু বরযাত্রী। বর এসে পৌঁছতেই হৈ-হৈ করে ছুটে এলো ছেলে-ছোকড়ার দল। ছুটে এলেন ময়-মুরুব্বী আর তদবির -কারক। দেখতে দেখতে জমজমাট হয়ে গেল তরফদারের বাহির বাড়ী। মাথায় টুপি দিয়ে ছোট ছোট নিশান হাতে ছুটে চলো বিয়ে ছান্দার দল। বর ও বর যাত্রীদের পথ আগ্‌লে বিয়ে ছান্দার গান ধরলো -"গাওরে মুসলিমগণ নবীগুণ গাওরে,
পরান ভরিয়া সবে সাল্লেয়ালা গাওরে ....."

গান শেষে পাওনা আদায় করে নিয়ে বিদেয় হলো বিয়ে ছান্দার দল। অতঃপর

www.pathagar.com

অতিথিদের আপ্যায়নেই গড়িয়ে গেল সন্ধ্যে। এবার তরফদার সাহেব বসে পড়লেন মোহরানা নির্দ্ধারণে। অন্তরালে তাল ঠুকে বসে রইলেন নায়েব। অন্দর মহলে পরীবানু মাথা কুটতে লাগলো।

হা-রা-রা-রা-রা-!

সাঁঝরাতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো লাল মিয়ার বাহিনী। ডানপিটে বিশ-প্রিশ জন যুবক। হাতে তাদের শক্ত লাঠি। ঢুকেই তারা বাতি লণ্ঠন নিভিয়ে দিলো প্রথমে। এরপর ঘরের টিনে এলোপাথারী বাড়ি ফেলে তারা সৃষ্টি করলো আতংক। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ ডাকাত-ডাকাত চীৎকার তুলে যে যেদিকে পারলো দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগলো সেই দিকেই। বরযাত্রীরা এক ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যঘরে যাচ্ছিল। সমজান গিয়ে বরের একখানা হাত ধরে টান দিতেই সে 'ওরে-বাবারে' বলে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো ভয়ে। হাতখানা ছেড়ে দিয়ে তার পশ্চাৎভাগে লাঠির একটা বাড়ি দিতেই 'খুন-খুন, বাঁচাও- বাঁচাও- বলে টুপি আচকান ফেলে পায়জামার ছেঁড়া ফিতা এক হাতে টেনে ধরে সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলো মাঠের দিকে। 'আগে ধর শালা বরযাত্রীদের'- বলে বছির একটা রসিকতার হাঁক দিতেই "ওরে-মরেছিরে-! পালাও, শিগ্গির সব পালাও-" বলে পগার ভেঙ্গে দৌড় দিলো বরকর্তা, পিছে পিছে বরযাত্রীরা। তারা মাঠ ভেঙ্গে ছুটতে লাগলো অন্ধকারে। বাচ্চা কাচ্চার চীৎকার আর বৃদ্ধদের হাহুতাশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তরফদারের বহিরাঙ্গন।

অন্দর থেকে বাহির বাড়ীর হৈ-চৈটা শুনতে পেয়েই সচকিত হয়ে উঠলো পরীবানু। ইতিমধ্যেই কে একজন অন্দরমহলে দৌড়ে এসে বললো-" যে যে দিকে পারো, পালাও। ডাকাত পড়েছে বাড়ীতে। "

কথাটা কানে যেতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো পরীবানুর মুখমণ্ডল। সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো অন্দর মহলের আঙ্গিনায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো লালমিয়াদের ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

ইঙ্গিতটাও অতিসত্বর এলো। তবে সেটা লাল মিয়ার নয়, মিয়াজান মিয়ার। লাল মিয়ারা অন্দর মহলে না পৌঁছতেই মিয়াজান মিয়ার লোক এসে অন্দর আঙ্গিনায় দাঁড়ালো। সে চাপা কণ্ঠে ডাক দিলো- "পরীবানু- পরীবানু-।"

পাশেই ছিলো পরীবানু। সে তৎক্ষণাৎ নিকটে এসে বললো-" এই যে, তোমরা এসেছো? লাল মিয়া কৈ ? লাল মিয়া?

আগন্তুকটি ঐ একই কণ্ঠে বললো-"লালমিয়া ঐ সামনেই আছে। বেরিয়ে এসো চটপট!"

অন্ধকারে দ্রুতপদে বেরিয়ে এলো পরীবানু। আগন্তুককে অনুসরণ করে বাড়ীর পেছনে আসতেই আরো দুজন লোক এসে হুড়মুড় করে চেপে ধরলো পরীবানুর চোখ মুখ। ঐ ভাবে ধরেই তারা তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে এলো আরো কিছু দূরে, নিরাপদ এক স্থানে। এরপর তাকে 'রা' শব্দটি করার সুযোগ না দিয়ে তার চোখ মুখ আর হাত-পা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললো শক্ত করে। পাশেই ছিলেন মিয়াজান

www.pathagar.com

আলী মিয়া। তিনি কণ্ঠস্বর বদল করে অন্ধকার থেকে চাপাকণ্ঠে বললেন- "ব্যস্! এবার ওকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে সোজা নৌকায় তুলে ছেড়ে দাও নৌকা। যেভাবে বলেছি, ঠিক সেইভাবেই চলবে। কোন রকম অসম্মান যেন না করা হয় ওকে। তেমন কিছু ঘটলে সব দোষ তোমাদের ঘাড়ে দিয়ে ফাঁশিতে ঝুলানো হবে তোমাদের।"

এর উত্তরে এদের একজন বললো-" হুজুর, আমরা গরীব মানুষ। টাকার জন্যে কাজ করছি। কথার বরখেলাপ আমাদের দ্বারা হবে না।"

খুশী হয়ে নায়েব সাহেব বললেন- সাবাস্! এবার যাও। আমাকে সময় মতো ঠিক জায়গাতেই পাবে।"

পরীবানুকে কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো ভাড়াটিয়ারা।

লালমিয়ারা অন্দর মহলে এসে পরীবানুকে পৈঁ পৈঁ করে খুঁজে ফিরতে লাগলো। এ ঘর সে ঘর, অন্দর বাহির সর্বত্র জনে জনে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করার পরও পরীবানুকে খুঁজে কেউ পেলানা। হতভম্ভ লাল মিয়া আর একদফা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে নিজে আবার খুঁজতে লাগলো হন্যে হয়ে। কিন্তু বিফল হলো সবই। সর্বত্র তছনছ করে খোঁজার পরও সবাই আবার ফিরে এলো হতাশ হয়ে। শ্রান্ত ক্লান্ত সঙ্গীরা তার হাঁপাতে হাঁপাতে জানালো আর খোঁজা বৃথা। পরীবানু এখানে নেই। নিশ্চয়ই তাকে এরই মধ্যে সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

অধিকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ায় পালিয়ে যাওয়া পাইক পেয়াদা ও লোকজন প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ক্রমেই দল বদ্ধ হতে লাগলো। ডাকাত পড়ার খবরে মার মার কাট কাট করে চার দিক থেকে আসতে লাগলো গাঁ-ভিন গাঁয়ের লোকজনও। এটা লক্ষ্য করে বছির বললো-" ওস্তাদ, আর এক মুহূর্ত নয়। চার দিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে। আর একটু হলেই ঘিরে ফেলবে আমাদের। এক্ষুনি সরে পড়তে হবে।"

লাল মিয়া ভগ্ন কণ্ঠে বললো- "কিন্তু পরীবানু!"

"তার খোঁজ নিশ্চয়ই আমরা করবো। সে এখানে যে নেই, তা হলপ করে বলতে পারি। অযথা এখানে দেরী করলে মহা বিপদ হবে। আর কথা নয়। চলো-চলো, শিগ্গির।"

লাল মিয়াকে এক রকম ঠেলে নিয়েই তরফদারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো তারা। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

একটু পরেই চারদিক থেকে ধেয়ে এলো লোকজন। ফিরে এলো পালিযে যাওয়া লোকেরাও। তরফদারের বাড়ী আবার ভরে গেল লোকে। ক্ষতির খতিয়ান নিতে গিয়ে দেখা গেল-খোয়া যায়নি কিছুই, নেই শুধু পরীবানু।

হুকুমউদ্দীন দৌড়ে এসে খবর দিলো- অন্দর মহলের সবাই আছে, শুধু পরীবানুকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। ঐ একই খবর পরপর কয়েকজন এসে দিলো।

শুনে ডুকরে উঠলেন তরফদার। ছুটে গেলেন অন্দরে। বাতি-কুপি-মশাল-লণ্ঠন সব কিছু জ্বালিয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে খোঁজ করলে ভেতর বাহির সর্বত্র। কিন্তু

www.pathagar.com

পরীবানুকে পেলেন না। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজ করার পর সকলের এই ধারণাই হলো যে, ডাকাত যখন লাল মিয়ারা, সঠিকভাবে তাদের যখন চিনতে পেরেছে অনেকে, তখন পরীবানুকে অপহরণ করার জন্যেই এই ডাকাতি। পরীবানুকে নিয়ে গেছে তারাই।

এমনই সময় মিয়াজান মিয়া ছুটতে ছুটতে এসে সবার সামনে দাঁড়ালেন এবং হাঁপাতে তরফদারকে বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে হুজুর, সর্বনাশ হয়েছে। ঐ লাল মিয়ারা পরীবানুকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। আমি স্বচোক্ষে দেখলাম!"

এতক্ষণ মিয়াজানকে দেখতে পায়নি কেউ। তিনি এসে হাজির হতেই সে কথা খেয়াল হলো সকলের। তাঁর কথা শুনে তরফদার সাহেব বললেন-" সে কি! তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

একইভাবে ধুকঁতে ধুঁকতে মিয়াজান মিয়া বললেন- "টের পেয়েই আমি ওদের পিছু নিয়েছিলাম হুজুর! কত করে ডাকলাম, কিন্তু একজনও আমার সাহায্যে এলো না। আমি একা একাই ওদের পেছনে ছুটলাম। ছুটতে অনেক দূরে গেলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত আঁধারের মধ্যে কোন দিকে গেলো ওরা, তার আর হদিস করতে পারলাম না।"

অনেকে অবাক হয়ে বললো-" বলেন কি!"

নায়েব সাহেব আফছোস্ করে বললেন-"কি আর বলবো! একে বারে দিনের মতো পরিস্কার ঘটনা। আমার চোখের সামনে দিয়ে ঐ পাষণ্ডেরা পরীবানুকে নিয়ে গেল! এত চেষ্টা করেও আমি কিছুই করতে পারলাম না! হায়-হায়-হায়!"

আক্ষেপের আধিক্যে নুয়ে পড়লো নায়েব সাহেবের মাথা। ক্রোধের আধিক্যে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন তরফদার সাহেব। বললেন- "বটে! এত স্পর্ধা ঐ হারামজাদার! আমি ওকে- আমি ওকে-"

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলে তরফদার সাহেব। মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না।

নুয়ে পড়া মাথাটা তড়াক করে খাড়া করলেন নায়েব। বললেন- "নালীশ ঠুকে দিন হুজুর। ডাকাতির অভিযোগে ব্যাটাদের বিরুদ্ধে একটা কড়া ধরণের নালীশঠুকে দিন। বদমায়েশদের শায়েস্তা করাই হবে এখন আপনার একমাত্র কাজ!"

নায়েবের উস্কানীতে আরো অধিক তেতে উঠলেন তরফদার। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো নায়েব। ব্যাটাদের আচ্ছামতো শায়েস্তা করতে না পারলে আর আমার শান্তি নেই। আমি আজই -এই রাতেই নাটোর যাবো। রাজ কাচারীতে গিয়ে-"

তরফদারকে থামিয়ে দিলেন নায়েব। বললেন- "না- না হুজুর, ঐ কাচারী-টাচারীতে গিয়ে কিছু হবে না। রাজাদের সে ক্ষমতা আর নেই। নালীশ আপনাকে দিতে হবে ইংরেজদের কোর্টে।"

বাধা পেয়ে থেমে গেলেন তরফদার। থতমত করে বললেন- "ইংরেজদের কোর্টে?"

www.pathagar.com

উৎসাহ দিয়ে নায়েব সাহেব বললেন, "হ্যা হুজুর। ইংরেজদের কোর্টে। ওদের কোন এক সাহেবকে ডাকাতেরা মেরে ফেলেছে বলে ওরা চোর-ডাকাতের উপর এখন খুব ক্ষ্যাপা। ডাকাতের নাম শুনলেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠিয়ে ডাকাতদের ধরে এনে শূলে দিচ্ছে একটার পর একটা।"

তরফদার সাহেব এতে আরো উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তখনই তিনি লোকজনকে ডাকাডাকি শুরু করলেন নাটোর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। মিয়াজানকে সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু মিয়াজান মিয়া পরীবানুকে খোঁজ করার নাম করে সকালেই বেরিয়ে পড়ার অনুমতি চেয়ে বসলেন আগেই। জানালেন, সম্ভাব্য স্থানগুলিতে অতিসত্বর খোঁজ করার একান্ত দরকার। দেরী হলে মেয়েটাকে হয়তো গুম করেও ফেলতে পারে বদমায়েশেরা।

এর বিরুদ্ধে তরফদার আর কথা বলতে পারলেন না। মিয়াজানকে রেখে শেষ রাতে নাটোরের উদ্দেশ্যে মহিষের গাড়ী ছেড়ে দিলেন তরফদার সাহেব। তিনি বিন্দুমাত্র জানলেন না, সকালের অপেক্ষায় না থেকে মিয়াজান মিয়া বেরিয়ে গেছেন তাঁর অনেক আগেই।

[সতের]

বিলচলনের অপ্ররপ্রান্তে বিচ্ছিন্ন এক গ্রাম। গ্রামটার এক অংশে পাতলা পাতলা লোকবসতি, অপর অংশে বন। গভীর ও নিবিড়। বনটার খানিকটে বল্লমের ফলার মতো ক্রমে ক্রমে সরু হয়ে সরাসরি ঢুকে গেছে মুক্তমাঠের উদরে। অনেকটা ঠিক উপদ্বীপের আকারে। এ অংশকে লোকে বলে বড় বাগান। পাশ দিয়েই গ্রামান্তরের পথ। উঁচু চওড়া ডহর। মাঠের পথও এটা। রাতের কালে এপথে কেউ সচারাচর চলে না। বিশেষ করে একা একা। দিনের বেলাতেও একা যেতে অনেকেরই শির শির করে গা। বড় বাগানকে নিয়ে একটা কিংবদন্তী আছে। এর অভ্যন্তরে আছে একটা প্রাচীন কালের দীঘি। আম, জাম, তাল-বেল আর হরেক রকম বৃক্ষলতা নিবিড় করে ঘিরে রেখেছে দীঘিটাকে। এই দীঘির এক পাড়ে কেবলই শ্যাওড়া গাছের অরণ্য। একটার পর একটা অসংখ্য শ্যাওড়া গাছে ঢেকে রেখেছে পাড়টা। এরই ভেতর আছে একটা মন্দির। মুণ্ডমালার মন্দির। এক তান্ত্রিক কাঁপালিক নাকি বাস করতো এখানে। সাথে ছিল আরো অনেক দুর্ধষ্য শিষ্য। এই মন্দিরে তারা প্রতি মাসের অমাবস্যাতে নরবলী দিতো। মানুষ বলি হয়ে গেলেই ধড় দিতো দীঘির মধ্যে ফেলে। মাথা রাখতো মন্দিরের চারপাশে মালার মতো ঝুলিয়ে। কালক্রমে লুপ্ত হয়েছে তান্ত্রিকের অস্তিত্ব। আছে শুধু মন্দিরটি। গোলাকার গম্বুজওয়ালা মন্দির। প্রাচীনকালের হলেও বেশ শক্ত আছে গাঁথুনী। কালের স্পর্শে শালকাঠের দরজা-জানালাগুলোও একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েনি। লোকে বলে স্থানটি বড় ভয়ংকর। রাতের অন্ধকারে দীঘি থেকে উঠে আসে মাথাহীন দেহগুলি। 'মাথাকাটা ভূত' রূপে প্রায়শঃই ঘুরে বেড়ায় বড়বাগানের চারপাশে।

www.pathagar.com

ফলে, চলাচলের রাস্তা খানিক পাশ দিয়ে হলেও বড়বাগানের ভেতরে কেউ যায়না। এর ভেতরে কি আছে, সে খবরও এ অঞ্চলের অনেকেই সঠিকআবে রাখে না। মন্দিরটির অবস্থান দীঘিটির সব চেয়ে উঁচু পাড়ের উপর। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে এখান থেকে দেখা যায় রাস্তা- পথের লোক। বিশেষ করে পাতাঝরা গ্রীষ্মে তা দেখা যায় স্পষ্টই। কিন্তু রাস্তা থেকে দেখা যায় না এখানকার কিছুই।

এই মন্দিরেই এনে তোলা হয়েছে পরীবানুকে। মিয়াজানের এক দোসর আছে এখানে। এই গাঁয়েরই লোক। খবর পেয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে সে-ই। এক কানা বুড়ি দুই বেলা খাবার পৌঁছায় গোপনে। পরীবানুকে রাখা হয়েছে তালা দিয়ে। দরজায় তালা ঝুলিয়ে পাহারাদার বসে আছে পাহারায়। মন্দিরটির সাথেই অপর একটি কক্ষ আছে। ভেতর দিয়ে দরজা। মেঝেটা বসে যাওয়ায় খানিকটা ফাঁক আছে দেয়ালের তল দিয়ে। প্রাতঃ ক্রিয়াদি সম্পাদনের সব ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে ঐ ঘরে। কোন কারণেই বাইরে আসার সুযোগ নেই পরীবানুর। মন্দিরের জানালাগুলো আকারেও ক্ষুদ্র, আছেও আবার মাথার অনেক উপরে। মই লাগানো ছাড়া চোখ দেয়ার উপায় নেই সেখানে। একটা বড়সরই ফাটল আছে মন্দিরের দেয়ালে। ঐ ফাটলেই চোখ লাগিয়ে বাইরের জগৎ দেখা ছাড়া, দুনিয়া থেকে পরীবানু একেবারেই বিচ্ছিন্ন।

রাত্রিকালেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে নায়েব সাহেব এখানে যখন পৌছলেন তখন বিকেল। ভাটি স্রোতে ছয় মাল্লার ছিপ নৌকা ভোররাতেই পরীবানুকে পৌছে দিয়েছে এখানে। মিয়াজান মিয়া হাজির হতেই দরজার তালা খুলে দিলো প্রহরীরা। অভ্যন্তরে পরী বানু পড়েছিল হতাশ হয়ে। দরজা খোলার শব্দেই সে ছুটে এলো দরজার কাছে। চীৎকার করে বলতে লাগলো-"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, মিথ্যাবাদী, ঠগ, জুচ্চোর! তোমরা আমাকে এ কোন নরকে আনলে?"

ঘরে ঢুকেই ঘরের দরজা বন্ধ করলেন নায়েব সাহেব। পেছন ফিরে হাসতে হাসতে বললেন-"নরকে নয়, নয়া কুঞ্জে।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো পরীবানু। বন্ধ ঘরের আলো-আঁধারের মধ্যেও সে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো নায়েবকে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকখানা ভরে উঠলো ভরসায়। পরম আগ্রহে সে প্রশ্ন করলো-"কে? নায়েব চাচা? আপনি এসেছেন?"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার আশার প্রদীপ নিভে গেল দপ্ করে। হতাশার পাথারে সে তলিয়ে গেল পূর্ববৎ। তার মুখের কথা শেষ না হতেই নায়েব সাহেব বললেন-"চুপ্! আর চাচা নয়। এখন থেকে আমি তোমার প্রাণ পতি। তোমার স্বামী।"

হতভম্ব হয়ে পরীবানু বললো- চাচা!"

রুষ্ট হলেন নায়েব সাহেব। ধমক দিয়ে বললেন- "খবরদার! ওসব চাচা মামা বলে আর লাভ নেই। হুকুম উদ্দীনকে তোমরা যখন কেউ পছন্দ করলে না, তখন তার বাপকেই এবার স্বামী বলে মেনে নিতে হবে।"

আসল ব্যাপার পরীবানু বুঝতে পারলো এতক্ষণে। বুঝতে পেরেই বিপুল বিস্ময়ে বললো-"আপনি! মানে, আপনি আমাকে চুরি করে আনলেন?"

www.pathagar.com

মিয়াজান মিয়া বক্র কণ্ঠে বললেন- "সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠলে কি আর বাঁকা আঙ্গুল চালাই? এখন যা বলি তা শোনো। মানে মানে আমাকে যদি স্বামী বলে মেনে নাও, তাহলে আর তোমার উপর কোন জোর জুলুম চালাবোনা। তা না হলে, যে জায়গায় তোমাকে এনে তুলেছি, এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে মরলেও একটা কাকপক্ষীর কানেও সে চীৎকার গিয়ে পৌঁছবেনা। আমার যা খুশী তোমাকে নিয়ে তাই করবো। কাজেই এখন চিন্তা করে দেখো, এই ভাবে পচে পচে মরবে, না আমাকে বিয়ে করে সুখের সংসার পাতবে?"

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো পরীবানুর সর্বাঙ্গ। অন্য সময় হলে, এর কিঞ্চিৎ আভাসেও সে মিয়াজান মিয়ার মুখে পয়জার ছুড়ে মারতো। এখন সে তেমন কিছু না করতে পারলেও বন্দিনী সিংহীর মতে গর্জে উঠে বললো-"আমার ধড়ে প্রাণ থাকতে আমি কুত্তার গলায় মুক্তার মালা দেবোনা! নেমখহারাম! হুকুমের গোলাম! তোমার এত স্পর্দ্ধা যে-"

সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠলেন নায়েবও। হুংকার দিয়ে বললেন- "খবরদার। হুশ রেখো, এখন পাশা পাল্টে গেছে। এমন কথা আর একবার বললেন তোমাকে আমি.....।"

কথার মাঝেই থেমে গেলেন নায়েব। তাঁর মনের কোণে ভেসে উঠলো তরফদারের সম্পত্তি। ওটার আশা না করলে এখনই এর বিষ দাঁত ভেংগে দেয়া কিছুমাত্র কঠিন নয় তাঁর কাছে। কিন্তু পরীবানুর দেহটাই একমাত্র কাম্য নয়, পরীর বাপের সম্পত্তিটাই অধিক কাম্য তাঁর। কাজেই তিনি বুঝলেন, পরীবানুকে বেহাত করা সমীচিন নয় আদৌ। ভয় দেখিয়ে, ফুস্‌লিয়ে, যেভাবেই হোক, তাকে হাত করাই হবে তাঁর সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তাই গলার তেজ অপেক্ষাকৃত খাটো করে বললেন, "থাক সে কথা। এখন বেশী মাথা গরম না করে ঠান্ডা মাথায় বুঝে দেখো- পরম সুখে আমার ঘর করবে, না নানা জনকে দেহদান করে কুকুরের মতো মরবে? আমাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে না করলে তোমার রূপযৌবন সবাই মিলে লুটে নিয়ে তোমাকে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে- এ কথাটা সব সময়ই খেয়াল রেখো।"

সে খেয়াল পরীবানুর এর মধ্যেই হয়েছে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে যে এমনই একটা পরিণতি তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেটা সে সহজেই অনুমান করতে পেরেছে। তাই দিশেহারা কণ্ঠে সে পুনরায় বললো- "চাচ!"

আবারও ধমকে উঠলেন নায়েব। বললেন- "চোপ! ও সম্পর্ক তোমাকে এখন বিলকুল ভুলে যেতে হবে। তোমাকে আমি ভেবে দেখার সময় দিয়ে যাচ্ছি। তুমি বেশ করে ভেবে চিন্তে মনস্থির করে নাও। এরপর আবার যখন আসবো, তখন এস্‌পার কি ওস্‌পার-এই দুইয়ের একটা করেই তবে যাবো।"

চতুর লোক নায়েব। পরীবানুর ধাত তিনি জানেন। তার মতো মেয়ে যে তাঁকে মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত, এক কথায় নেবেনা- এটা তিনি বোঝেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে কোন কুল কিনারা না পেয়ে নেতিয়ে পড়ার পর তবেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়াটা তার সম্ভব এটা চিন্তা করে তখনকার মতো বেরিয়ে গেলেন নায়েব।

www.pathagar.com

তিনি বেরিয়ে এসেই তুলে দিলেন শিকল। প্রহরী এসে ঝুলিয়ে দিলো তালা। পরীবানু ছুটে এসে কপাটের উপর করাঘাতের পর করাঘাত করে চীৎকার করে বলতে লাগলো, "আমাকে ছেড়ে দাও- আমাকে যেতে দাও-"

তরফদার গিয়ে ডাকাতির খবর দিতেই হৈ-হৈ করে বেরিয়ে এলো ইংরেজদের সিপাই। আর যার অস্তিত্বই তাদের চারপাশে থাক, ডাকাত দস্যুর নাম-গন্ধও তাদের ত্রিসীমানায় রাখতে তারা নারাজ। অনেক তাদের ভূগিয়েছে এরা। জানের উপরও হাত দিয়েছে ফকির বেশী দস্যুরা। এ ব্যাপারে তরফদারের চাইতে এদের গরজই বেশী। তাই তারা খবর পেয়েই বেরিয়ে এসে হাজির হলো সোনাকোলে। ঘিরে ফেললো গ্রামটা। এধারণা লাল মিয়াদের আগে থেকেই ছিল। তারা গ্রাম থেকে পালিয়ে ছিল আগেই। নির্দিষ্ট ডাকাতদের একজনকেও না পেয়ে, সেখান থেকে সিপাইরা চলে এলো বিলবাথানে। বিলবাথানের আগাগোড়া অনুসন্ধান করে একমাত্র আবেদ আলীকে ছাড়া আর কাউকে তারা পেলো না। আবেদ আলীর নাম তালিকাভূক্ত না থাকায় তাকেও ছেড়ে দিয়ে সিপাইরা চলে গেলো অন্যগ্রামে। অতঃপর ডাকাতের সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুর্নিবায়ুর মতো ঘুরতো লাগলো তারা।

লাল মিয়ারা গ্রাম ফেলে বনবাদারে আশ্রয় নেয়ার পরও নিরাপত্তার প্রশ্ন তাদের প্রকট হয়ে উঠলো। সিপাইদের বেপরোয়া তল্লাশীতে অতিষ্ট হয়ে উঠে তারা স্ব-এলাকা ত্যাগ করে ভিন এলাকায় সরতে লাগলো ক্রমেই। সরতে সরতে শেষ অবধি তারাও এসে হাজির হলো চলন বিলের অপর প্রান্তে। হাজির হলো বড় বাগানের পাশেরই এক গাঁয়ে। একবাড়ীতে এতলোক এক সাথে না উঠে তারা নানা বাড়ীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো। সম্বল তাদের গানের দলের সাজ-সরাঞ্জাম। গানের দলের পরিচয়ই পরিচয় এখন তাদের। এর উপরই ভরসা করে গাঁ ছেড়েছে তারা। রাতখানা নানা বাড়ীতে কাটিয়ে সকালে এক নির্জন স্থানে সবাই এসে হাজির হতে লাগলো। কথায় কথায় বছির বললো-"আমরা যে শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে এলাম ওস্তাদ। এত দূরে না এলেও চলতো বোধ হয়।"

লালমিয়া এরজবাবে বললো-"পাগল! ইংরেজদের সিপাইরা যে রকম হন্নে হয়ে ঘুরছে, তাতে ধারে কাছে থাকলে আর রক্ষে আছে? কেউ না কেউ আমাদের খবরটা দিয়েই বসবে তাদের। শুধু ডাকাতি তো নয়, ডাকাতির সাথে মেয়ে মানুষ গুম্‌করার নালীশ। যে শুনছে, শিউরে উঠছে সেই। খোঁজ তারা দেবেই না বা কেন? সে দিন যদি পরীবানুকে পেতাম আমরা, তাহলে আর কোন কিছুই হতো না। নালীশ দিলে পরীবানুই সাক্ষী হতো। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যের হাতে তাকে জোর করে তুলে দেয়ার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে ইংরেজেরা আমাদের পুরস্কারই দিতো। ডাকাত বলে ধরার কোন প্রশ্নই তখন উঠতো না। আজও যদি পরীবানুকে খুঁজে পেতাম আমরা, তাহলেও আসল চোর বেরিয়ে পড়তো, আমরাও মুক্তি পেতাম।"

শুনে বছিরউদ্দীন বললো- "সেই পরীবানুকে সন্ধান করার পথটাই যে বন্ধ হলো আমাদের। আশে পাশে থাকলে সবাই খুঁজে পেঁতে দেখতে পারতাম।"

www.pathagar.com

- ওদিকে খুঁজে দেখার লোক তো আমাদের আছেই। দবির, জছিম, আবেদ আলীরাই সে দায়িত্ব নিয়েছে। ওদিকে ওরাই খুঁজে দেখবে। আসলে পরীবানুকে সরিয়ে নিয়েছে যারা, তারা নিশ্চয়ই তাকে কাছে কোলে রাখেনি। এত বড় ভুল তারা করবে না।
- নিশ্চয়ই কোন দুবৃত্তেরাই পরীবানুকে নিয়ে গেছে, না কি বলো ওস্তাদ? তরফদারের কোন হাত নেই এতে।
- প্রথমে আমার সেই সন্দেহই হয়েছিল। কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে তরফদারও তাঁর মেয়ের খবর জানেন না। জানলে শুধু ডাকাতির নালীশই দিতেন। মেয়ে গুমের নালীশও দিতেন না বা মেয়ের জন্যে অমন উদ্ভ্রান্ত হয়েও উঠতেন না। ঐ হুটপিটের সুযোগে কোন দুবৃত্তই চুরি করেছে পরীবানুকে।
- চুরি করে নিয়ে যে ব্যাটারা তাকে কোথায় রাখলো-
- নিশ্চয়ই কাছে কোলে রাখেনি। তাদেরও তো ধরা পড়ার ভয় আছে। পরীবানুকে দূর দূরান্তেই নিয়ে গেছে। আমাদের দূর দূরান্তেই খোঁজ করে দেখতে হবে।
- কিন্তু সেই দূর দূরান্ত বলতে যে শুধু এই দিকটাই, এটাই বা কি করে ধরা যায়?
- তা অবশ্য ঠিক। আমরা হয়তো বেঠিক জায়গায় এসেছি। কিন্তু সব জায়গাতেই খুঁজতে হবে আমাদের। সঠিক যখন জানা নেই-

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এমনই সময় ছুটে এলো সমজান আলী। বললো- "ওস্তাদ, আমরা বোধ হয় ঠিক জায়গাতেই এসেছি!"

উপস্থিত সকলে সম স্বরে বললো, "মানে!"

সমজান আলী ঐ একই রকম ব্যস্ত কণ্ঠে বললো-" আমি যেখানে ছিলাম, তার পাশের এক বুড়োর বাড়ীতে তামাক খেতে গিয়েছিলাম। বুড়ো মানুষটার বাড়ীটা একদম বড় রাস্তার ধারে। তামাক খাওয়ার অছিলায় কথায় কথায় আমাদের একটা মেয়ে ছেলে হারিয়ে যাওয়ার কথা তাকে বললাম। আমরা একটা মেয়ে ছেলের খোঁজ করছি শুনে বুড়োটা বললো, কয়েকদিন আগে ভোর রাতে বাইরে বেরিয়ে সে দেখে, চারপাঁচজন লোক একটা যুবতী মেয়েকে ঐ রাস্তা দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। কাপড় দিয়ে মেয়েটার হাত মুখ বাঁধা ছিল। ডাকাত দস্যু হবে ভয়ে বুড়োটা কিছু বলেনি। ওদের কথাবার্তার ধরণ নাকি ঠিক আমাদের এলাকার লোকের মতো। আমাদের এলাকার কথাবার্তার টান নাকি ওর খুব জানা।

শুনে উৎসাহিত হলো সকলেই। বছির অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বললো- "বলো কি! তাহলে তো এখানেই আমাদের থাকতে হয় কিছু দিন!"

অন্য কয়েকজন সমর্থন দিয়ে বললো- "ঐ মেয়ে পরীবানু হওয়ার সম্ভাবনাই প্রায় ষোল আনা। কে ঐ মেয়ে- সে সন্ধান না নিয়ে এখানে থেকে আমরা এক পাও নড়বোনা।

অনেক বললো-" ঠিক ঠিক!"

আব্দুল জব্বার বসে বসে সবার কথা শুন ছিলো। এবার সে চিন্তিতভাবে বললো- "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আসল সমস্যার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না।"

www.pathagar.com

সমজান বললো- 'আসল সমস্যা মানে?"

জব্বার বললো-" মানে যেখানেই যা করতে চাও তোমরা, তাতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু এতলোক থাকি কোথায়, খাই কি?"

সমস্যাটা নিঃসন্দেহে গুরুতর। শুনে পরস্পর সকলেই মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলো। বছির বললো -"বাড়ীতে কাজ করি সকলেই। পাইট খাটার অভ্যাসতো একজনেরও নাই। গানের একটা বায়না টায়না না পেলে-"

বাহার বললো, "পাশেই তো কোথায় একটা রথের মেলা আছে। সেখানে যে লোক পাঠানোর কথা ছিল ওস্তাদ?"

লাল মিয়া স্মিতহাস্যে বললো-" আরে, সে চিন্তা কি না করে এমনি এমনি বসে আছি আমি? সকালেই সে মেলাতে খোঁজ নেয়ার জন্যে মজুকে বলে দিয়েছি রাতেই। এ ছাড়া একটা নয়, আরো অনেক মেলাই আশে পাশে হচ্ছে। অন্য দিকে খোঁজ নিতেও কয়েকজন কে পাঠিয়েছি। ওরা আসুক দেখি, কি খবর আনে। মেলা যখন অনেক, তখন বায়না একটা ইন্‌শা আল্লাহ পাবোই।

এদের কথা বার্তা আর কিছুক্ষণ চলতেই হাসি মুখে হাজির হলো ময়জুদ্দীন মজু। কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই সে উল্লাসের সাথে বললো- "খুব ভাল খবর ওস্তাদ, খাশা খবর!"

লালমিয়া বললো-" কি রকম?"

মজু বললো-"মেলার মালীক গানের দলই খোঁজ করছে কয়দিন ধরে। চার দিকে মেলা, তাই সে কোন দলই যোগাড় করতে পারেনি। আজ আমাদের হাতের কাছে পেয়ে একেবারে বর্তে গেছে সে। সঙ্গে সঙ্গেই বায়না করেছে আমাদের। অন্য কারো বায়না যেন আর না নেই, সে জন্যে সে বার বার অনুরোধও করেছে।"

শুনে হাসির রেখা ফুটে উঠলো সকলেরই চোখে মুখে। বছির উদ্দীন বাহবা দিয়ে বললো- "সাব্বাস ভাই! একটা কাজের মতো কাজ করেছো তুমি।"

বাহার বললো- "কোন গানের বায়না নিলে? আসর দেবে কত?

উত্তরে মজু বললো- "যোগীগানের। যোগী-গান গাওয়া লাগবে। মালীক বললো- যোগীগানের কদরই নাকি এখানে বেশী। ওরা সাতটাকা আসর দেবে। ভাল গাইলে আসর প্রতি আরো আটআনা বেশী দেবে।"

শুনে প্রায় চমকেই উঠলো সকলে। যদিও সাত টাকা আসর এরা এর আগেও দু'একবার পেয়েছে, তবু এই দুর্দিনে এত টাকার বায়না তারা পাবে, এটা কেউ কল্পনাও করেনি। সমজান প্রায় লাফিয়ে উঠলো শুনে। বললো- "বলিস্ কি! সা-ত টাকা।"

মজু বললো, "হ্যাঁ। সাত টাকাই। একেবারে পাকা পাকি বন্দো বস্ত। ওদের পীড়াপীড়ি দেখে আমি আজ রাতেই আসর দেয়ার ওয়াদা করে তিন টাকা আগাম নিয়ে এসেছি।"

সমস্বরে সবাই তাকে বাহবা দিলো আর একবার। অন্যেরা অন্য মেলা থেকে আরো কিছু প্রস্তাব নিয়ে এলেও, সবগুলো বাতিল করে, সবাই মহানন্দে রওনা

www.pathagar.com

হলো ময়জুদ্দীনের বায়না নেয়া রথের মেলায় যোগীগান গাওয়ার জন্যে।

রথের মেলায় সারারাত যোগী গান গাওয়ার পর সকালের দিকে ফিরে এলো লাল মিয়ারা। তারা বড় বাগানের পাশের গাঁয়েই ফিরে এলো আবার। গ্রামটির এক প্রান্তে এক নবাব আমলের কাচারী ছিল। পড়ো-পড়ো ঘর। পড়োবাড়ীর অবস্থাতেই পড়ে ছিল বাড়ীটা। গ্রামবাসীর সমর্থনে তাদের অস্থায়ী আস্তানাটা সেই ঘরেই গেড়ে নিলো লাল মিয়ারা। সাত রাতের বায়না তাদের। রাতে তারা মেলায় যায়। গান গায় সারারাত। দিনে আসে আস্তানায়। রান্না করে, আহার করে, বিশ্রাম করে। বিকেলে সব বেরিয়ে পড়ে চার দিকে। সন্ধান করে পরীবানুর।

সেদিনও তারা বেরিয়ে পড়লো বিকেলে। এক একজন রাস্তা নিলো এক এক দিকে। বড় বাগানের পথ ধরে এগিয়ে এলো লাল মিয়া। কোন দিকে যাবে তা স্থির করতে না পেরে আনমনে ঘুরতে লাগলো বড় বাগানের ডহরে। উস্কোখুস্কো চুল। দুশ্চিন্তায় তার তনুমন দীপ্তিহীন।

মন্দিরের ফাটলে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল পরীবানু। এমনিভাবেই দিনকাটে তার এখন। এরই মধ্যে আবার এসে ফিরে গেছেন নায়েব সাহেব। তম্বিতম্বা করে গেছেন এবারও। অনেক কথা শুনিয়ে গেছেন পরীবানুকে। ভেবে দেখার অজুহাতেই নায়েব সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়েছে পরীবানু। কি করা তার উচিত, সেটা চিন্তা করে দেখার নামেই সময় নিয়েছে সে। আপাততঃ নিস্তার পাওয়ার সময়। নিতান্তই অস্থায়ী এই নিস্তার। যে কোন সময় আবার আসবে নায়েব। শুরু করবে জুলুম। মানসম্মান, রক্ষে করা দুষ্কর হবে এবার।

তাই শোকে দুঃখে মুহ্যমান পরীবানু। পালাবার পথও নেই বিন্দুমাত্র। হাজার রকম চিন্তা তার মাথায়। সমভ্রমে বেঁচে থাকার সীমাহীন সাধ তার অন্তরে। কিন্তু তার সেই বেঁচে থাকার সকল দুয়ার বন্ধ। সামনে তার পথ মাত্র দুইটি। মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর অধিক দূর্ভোগ। কলংকের ডালী মাথায় নিয়ে বাচার নামে মরে থাকা। মৃত্যুর জন্যে আয়োজন তার সমাপ্ত। খেলা করার অজুহাতে বিষাক্ত একটা ফল বন থেকে আনিয়ে নিয়েছে সে। ভাত খাওয়ানো বুড়িটাই তাকে এনে দিয়েছে ফলটি। অলক্ষ্যে এবং সংগোপনে। এটাকে সে একদন্ডও হাতছাড়া করে না। সব সময় কাছে রেখেছে রক্ষে কবজের মতো। কি দিয়ে কি হয়ে গেল সে ভেবেই তা পায় না। এক পলকে এমন একটা বিপর্যয় ঘটবে তার, এটা সে স্বপনেও ভাবেনি। লাল মিয়ারা কোথায় এখন তাই বা কে জানে। লালের কথা মনে আসতেই মনটা তার হু-হু করে উঠলো। পরস্পরের কতই না আশা ছিল পরস্পরকে পাওয়ার। সব আশা সাঙ্গ হলো চোখের এক পলকে।

ফাটলে চোখ লাগিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে এসব কথাই পরীবানু ভাবছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়লো লাল মিয়ার উপর। প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারলো না। চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার সে চাইলো। না, ভুল হয়নি তার। লালমিয়াই বটে।

www.pathagar.com

লাল মিয়াকে দেখেই সে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। ফাটলে মুখ লাগিয়ে সে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকতে লাগলো লাল মিয়াকে। এখানে এই অকস্মাৎ লাল মিয়াকে সে দেখতে পাবে- এটা তার কল্পনারও অতীত ছিল। আশায় তার ভরে গেল বুক। প্রাণ পনে চীৎকার করে সে আওয়াজ দিলো পুনঃপুনঃ কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হলো সবই। চীৎকারে তার শুকিয়ে গেল কণ্ঠনালী, ফেটে গেল গলা, তবু সে চীৎকার তার নিজের কাছেই ফিরে এলো ব্যর্থ হয়ে। ফাটলের সেই ছিদ্র দিয়ে সে আওয়াজ বাইরে তেমন এলোইনা। আস্তে আস্তে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল লালমিয়া। সে স্থানান্তরে এগিয়ে গেল নিজস্ব গতিপথে। রুদ্ধ মন্দিরের মধ্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো পরীবানু। সে দেয়ালের সাথে অবিরাম মাথা কুটতে লাগলো। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সে অবশেষে বসে পড়লো মেঝের উপর। আক্ষেপের সাথে গাইতে লাগলোঃ-

'আগেই তোমায় বলেছিনুরে-
আমায় নিয়ে যাওরে
কপাল গুণে,
কপালগুনে এ জীবনেরে হলো না মিলন॥
এখন কেন ঘুরছো তুমিরে-
উদাসিনী হয়েরে-
কপালগুণে,
কপালগুণে এ জীবনের হলো না মিলন॥
তুমি ধন্ধ আমি বন্দীরে-
পাশের এ মন্দিরে রে-
কপালগুণে,
কপালগুণে এজীবনেরে হলো না মিলন॥
পথে এলে পথে গেলেরে-
না পেলে সন্ধানরে
কপালগুণে,
কপালগুণে এজীবনেরে হলো না মিলন॥'

দরজা খোলার শব্দে আঁতকে উঠলো পরীবানু। বন্ধ হলো বিলাপ। সে চোখের পানি মুছতে লাগলো আঁচল দিয়ে। ঘরে ঢুকলেন মিয়াজান আলী মিয়া। ঢুকেই তিনি বললেন- "ওসব কান্নাকাটি করে কোন ফল হবে না। আজ স্পষ্ট জবাব চাই। বলো, আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজী, না অন্য রকম শুরু করবো? সকলেই তোমার জবাবের অপেক্ষায় বসে আছে।

উভয় সংকট। জলে কুমীর, স্থলেবাঘ। রাজী হলে ঝুলতে হয় এক বাঁদরের গলায়, অন্যথায় তাকে ছিড়ে খায় দশ বাঁদরে মিলে। কি জবাব দেবে তা ভাবতেই নায়েব ফের গরম কণ্ঠে বললেন- "কি হলো? চুপ করে রইলে যে, হ্যাঁ-না, একটা কিছু আজ বলতেই হবে তোমাকে। তোমার ঐ ভরা যৌবন দেখে দেখে ফিরে

www.pathagar.com

যাবো দৈনিক, এটা মনে করোনা। অবশ্য আমাকে সাদী করতে রাজী হলে অন্য কথা। বলো, রাজী?"

প্রস্তাব দুইটির একটিও প্রাণ থাকতে পরীবানু গ্রহণ করতে পারে না। দুইটিই ভয়ংকর। তার চেয়ে মৃত্যুই শতগুণে সুখের। মৃত্যুর জন্যে পরীবানুও প্রস্তুত। সে বুঝে নিয়েছে মরতে তাকে হবেই। এখন মৃত্যুটাকে যতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায় সেইটুকুই লাভ। একটু চিন্তা করলো পরীবানু। বুঝতে পারলো- অপ্রীতিকর হলেও অভিনয় ছাড়া আপাততঃ নিস্তারের আর পথ নেই দ্বিতীয়। মনস্থির করে সে হাসি মুখে বললো-" আমি-মানে আমি রাজী।"

একথা কানে পড়তেই নায়েব সাহেব উল্লাসে ঊর্ধে উঠলেন দশহাত। অতিশয় আবেগের সাথে বললেন- কি বললে! আমাকে বিয়ে করতে রাজী তুমি?"

হাসি হাসি মুখ করে উত্তর দিলো পরীবানু। বললো- "জি, রাজী। ভেবে দেখলাম, বিয়ে তো জীবনে করতেই হবে একজনকে। এই ভরা যৌবন বৃথা যেতে দিয়ে আর লাভ কি? সে বিয়েটা আপনাকেই যদি করি তাতেও তো ক্ষতি নেই কিছু। তার উপর আপনি যখন আমাকে এতখানি পছন্দ-মানে-ভাল বাসেন- আমাকে পাওয়ার জন্যে এত কিছু করছেন-

কপট লজ্জায় মুখ নীচু করলো পরীবানু। আনন্দের আধিক্যে দিশেহারা হয়ে গেলেন নায়েব সাহেব। রাজকন্যার সাথে রাজ্য প্রাপ্তি আর তাঁর অধিক দূরে নয়। বিপুল উল্লাসে বিহবল নায়েব সাহেব- উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন-"মারহারা! মারাহারা!"

- তবে একটা কথা আছে।

- কি কথা? বলো-বলো?

- বিয়ে সাদী আমোদফুর্তির ব্যাপার। দুঃখের মধ্যে হয়না। হঠাৎ এই টানা হেঁচড়ায় পড়ে আমি খুব মনমরা হয়ে আছি। মনটা আমার ঠিক করে নেয়ার জন্যে খানিক সময় দেয়া লাগবে।

এ প্রস্তাব পছন্দ হলো নায়েবের। তিনিও তাই চান। কারণ ঝোঁকের মাথায় দেয়া তার এই সম্মতি দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। মুক্তি পেয়ে সে আবার পালিয়ে যেতেও পারে। মত যদি পাল্টে যায় তাহলে আবার তাকে নিয়ে ঘর করতে যাওয়াটাও বিপদ। সেখানে জানের হুমকিও আছে। বন্যকে পোষ মানাতে সময় লাগে, নায়েব তা জানেন। আস্তে আস্তে পোষ মানাতে হয়। অপরপক্ষে, যে দুর্গম স্থানে এনে রাখা হয়েছে পরীবানুকে, সেখান থেকে তার উদ্ধার পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। মাসের পর মাস, এমন কি বছর কেটে গেলেও পরীবানুর সন্ধান কোন জনপ্রাণীই পাবে না। বরং এই নিঃসঙ্গ পরিবেশে থাকলেই তার মন মানসিকতার পরিবর্তন অতি সহজেই ঘটবে। পরীরবাপের জমিদারীটা পেতে হলে পুরোপুরী পেতে হবে পরীবানুকে। অন্যথায় নয়। পরীবানুর এই প্রস্তাবে উত্তরে তাই নায়েব সাহেব খুশী হয়ে বললেন-"আরে -এ আর এমন কি কথা! তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী

www.pathagar.com

থাকলে তোমার কোন আব্দারই আমি অপূরণ রাখবোনা। যত সময় লাগে তা নাও। তুমি যেদিন খুশী মনে বলবে, সে দিনই আমি বিয়ের আয়োজন করবো, তার আগে নয়।

- আমার গায়ে কিন্তু তার আগে হাত দিতেও পারবোনা। ধর্মতঃভাবে আমার স্বামী হওয়ার আগে আমার গায়ে হাত দিলে কিন্তু বেজায় রাগ করবো আমি।

একটুখানি থমকে গেলেন নায়েব। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলেন, আপসে-আপ্ পথে আসার গতিটাকে বাড়াবাড়ি করে থামিয়ে দেয়া ঠিক নয়। জুলুম করে এ মেয়েকে জয় করা যাবেনা। তাই তিনি এ প্রস্তাবেও রাজী হয়ে হাসি মুখে বললেন- " আচ্ছা -আচ্ছা। তাই সই। তুমি আমার হলে তোমার কোন কথাই আমি অমান্য করবোনা।"

ঝোপবুঝে কোপ মারলো পরীবানু। বললো-" আমাকে কিছু গয়না পাতি দেবেন না? একেবারেই নাড়া অবস্থায় বিয়েতে কিন্তু আনন্দ পাবো না আমি।"

প্রেমের হাটে যুবক বৃদ্ধের পার্থক্য নেই। প্রেমের সুরমা চোখে লাগলে, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই একইভাবে আব্ছা দেখে চোখে। দেওয়ানা হয়ে যায়। মিয়াজান আলী মিয়াতো আগে থেকেই এ বাজারের চেনাজন। একনিষ্ঠ না হলেও অসংখ্য খণ্ডপ্রেমের তিনি এক বিশিষ্ট নায়ক। কাজেই, পরীবানুর এই আব্দারে নায়েব সাহেবের বিষয় বুদ্ধি উবে গেল এক পলকে। ক্ষনিকের জন্যে মোমের মতো গলে গেলেন তিনি। গদগদ কণ্ঠে বললেন- "অবশ্যই অবশ্যই। আমার প্রাণের পাখীরে আমি কি নাড়া রাখতে পারি? সোনা দিয়ে সারা গা ঢেকে দেবে তোমার -হে-হে-হে! দেখে নিও, তোমার কোন আশাই আমার কাছে অপূরণ থাকবে না- হে-হে-হে!"

নির্বোধের মতো হে হে করে হাসতে লাগলেন বিষয়বুদ্ধির বটবৃক্ষ মিয়াজান আলী মিয়া। পরীবানুর ইচ্ছা পালনে তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন তখনই। বেরিয়ে গেলেন আর ঘন ঘন না আসার ঢালাও ওয়াদা করে।

[আঠার]

রথের মেলায় আজও রাতে গান জুড়েছে লাল মিয়ারা। যোগী গান। আসর ঘিরে বসে আছ অগনিত শ্রোতা। ইতিমধ্যেই লাল মিয়াদের নাম হয়েছে খুব। প্রতিরাতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ভিড়। যোগী গান চলন বিলের অন্যতম আদি গান। এক অবস্থাপন্ন গৃহস্বামী আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ বয়সে সংসার ধর্মত্যাগ করে। গৃহ ছেড়ে পথে নামে সন্ন্যাসী বা যোগী হয়ে। ঘুরতে থাকে দেশ বিদেশ। ভূত্তুরদাস নামে তার এক বিশ্বস্তভৃত্ত প্রভুর উদাসিনতা লক্ষ্য করে সঙ্গ নেয় প্রভুর। শেষ পর্যন্ত সেও তার চেলা হয়ে প্রভুর সাথে ঘুরতে থাকে সর্বত্র। যোগীটির কাঁচা বয়সের বউ ছিল বাড়ীতে। স্বামীর বিরহে সে কাতর হয়ে পড়ে। স্বামীকে তার কোন মতেই গৃহে ফেরাতে না পেরে, স্বামীর খোঁজে যোগিনী হয়ে পথে নামে সেও। সন্ন্যাসিনীর বেশে

www.pathagar.com

সে স্থানান্তরে খুঁজতে থাকে স্বামীকে। বাল্লকদাস নামে আর এক ভৃত্য ছিল তাদের। বাল্লকদাস কে চেলা করে সঙ্গে নেয় যোগিনী। তার সাহায্যেই দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়ানো সহজ ও নিরাপদ হয় যোগিনীর। যোগিনীকে যোগ্যানী বলে গানের ভাষায়। কালক্রমে যোগীর সাথে সাক্ষাত ঘটে যোগ্যানীর। পরস্পরকে আবছা আবছা চিনতে পারে পরস্পরে। গানের মাধ্যমে ছত্তয়াল-জবাব করে উভয়ে পরীক্ষা করে উভয়কে। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার পর মিলন ঘটে উভয়ের।

এই কাহিনীর যোগীগান জমে উঠেছে আজও। যোগী সেজেছে লাল মিয়া। ময়জুদ্দীন যোগ্যানী সমজান আলী ভূত্তুরদাস। বছির সেজেছে বাল্লকদাস। সংসারত্যাগী যোগী বিভোর হয়ে মনস্তত্ত্বের গানগাইছে আসরে। ধূয়া ধরছে দোহার-বাইনরূপী লালমিয়ার

যোগী ঃ ওরে মন পাগেলা ঘোড়ারে-
তুমি কোথা থেকে কোথা নিয়ে যাও-
পাগেলা ঘোড়ারে-।
সঙ্গীরা ঃ 'ঐ'
যোগী ঃ ওরে মন হলো ঘোড়ারে তার পবন হলো জীন-
সঙ্গীরা ঃ বাপুহে পবন হেলা জীন-
যোগী ঃ এক এক চাবুকে ঘোড়া ছুটে রাতি দিন।
সঙ্গীরা ঃ পাগেলা ঘোড়ারে-
তুমি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাও-
পাগেলা ঘোড়ারে॥
যোগী ঃ ওরে কেবা তোমার রাঁধে বাড়ে, ওরে কে সে খানা খায়
সঙ্গীরা ঃ বাপুহে কে সে খানা খায়-
যোগী ঃ কারে নিয়ে শুয়ে থাকো কেবা নিদ্রা যায়।
সঙ্গীরা ঃ পাগেলা ঘোড়ারে, তুমি কোথা হতে কোথা নিয়ে যাও,
পাগেলা ঘোড়ারে॥"

বাল্লকদাসকে নিয়ে আসরে ঢুকলো যোগ্যানী। সে ভূতুরদাস কে জিজ্ঞেস করলো- এদিকে কোন যোগী আছে কিনা। সেই সাথে সে জানালো, বার বছর আগে তার স্বামী যোগী হয়ে ঘর ছেড়েছে। সেই স্বামীকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। উত্তরে ভূত্তুরদাস বললো-তোমার সেই যোগী দেখতে কেমন, পরণে কি আছ, সাথে কে আছে, এসব আগে বলো, পরে উত্তর দেবো। যোগ্যানী এবার গেয়ে গেয়ে নিখুঁতভাবে এসব বিবরণ দিলো। যোগ্যানীকে দেখেই যোগী অনুমান করতে পেরেছিল। তার বিবরণ শুনে এবার সে উৎফুল্ল হয়ে বললো- "আমি, আমিই তোমার সেই যোগী, আমিই তোমার স্বামী। এসো- আমার সাথে এসো। এখন থেকে আমরা এক সাথে সাধনা করি।"

www.pathagar.com

কিন্তু সে তার সত্যি সত্যিই স্বামী কিনা, যোগ্যানী তা বিনা পরীক্ষায় মেনে নিতে চাইলোনা। গানের মাধ্যমে শুরু হলো পরীক্ষা। যোগ্যানী আর বাল্লকদাস দ্বৈতকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগলো। যোগী আর ভুত্তুরদাস দ্বৈতকণ্ঠে উত্তর দিতে লাগলো। সঙ্গীরা ধূয়া ধরতে লাগলোঃ-

যোগ্যানী ও বাল্লকদাসঃ
"আবে, শুনতো যোগী শুণ গোঁসাইজী,
শুনেক হামার এক বাত-
সঙ্গীরা ঃ আচ্ছা কহো-কহো তুম্ ভালো।
যোগ্যানী ও বাল্লকদাসঃ
চার কালো দেখাতে পারো যদি
যাবো তোমার সাথ,
সঙ্গীরাঃ হায়-হায় যাবো তোমার সাথ।
যোগ্যানী ও বাল্লকদাসঃ
চার কালো না দেখাতে পারলে
কাটাবো ঘোড়ার ঘাস-
সঙ্গীরাঃ কি ঐতো মেরা আবাল কালের যোগী,
কি নয়নের কাজল॥
যোগী ও ভূতুর দাসঃ
আবে, শুনতে চাইলি, শুন যোগ্যানী
শুনেক হামার এক বাত-
সঙ্গীরাঃ আচ্ছা কহো-কহো তুম ভাল।
যোগী ও ভূত্তুর দাসঃ
আবে, একতো কালো কাউয়া কোকিল,
আর তো ফিঙের বেশ-
সঙ্গীরাঃ হায়- হায়- আর তো ফিঙের বেশ-
যোগী ও ভূত্তুরদাসঃ
চার কালো দেখাতে পারি
যোগ্যানীর মাথার কেশ।
সঙ্গীরাঃ কি ঐতো মেরা আবালকালের যোগী,
কি নয়নের কাজল।
যোগ্যানী ও বাল্লকদাসঃ
আবে, শুনতো যোগী, শুন গোঁসাইজী,
শুনেক হামার .....।"

চরমভাবে জমে উঠেছে গান। বাদ্যযন্ত্রের মূর্চ্ছনা ঝুরে পড়ছে চার দিকে। তন্ময় হয়ে শুনছে বিহবল শ্রোতারা। নিস্তব্ধ চতুর্দ্দিক। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। এমন

www.pathagar.com

সময় আসরের মধ্যে সবেগে ছুটে এলো আবেদ আলী। যোগীরূপী লালমিয়া জাপ্‌টে ধরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল সাজঘরে। হতবুদ্ধি লাল মিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো- "পালাও, তোমরা যে যেখানে আছো, এক্ষুনি সব পালাও।"

- মানে?

- গোরা সেপাইরা এই দিকেই আসছে। কে যেন তাদের খবর দিয়েছে- তোমরা এখানে যোগীগান করছো।

- বলিস কি!

- হ্যাঁ, আমি সে সন্ধ্যান পেয়েই কলিমদ্দির ছিপ নৌকায় উঠে পড়েছি দুপুরে। ওরা গঞ্জে এলো জরুরী এক কাজে। সাত সাতখান বৈঠা মেরে এলো বলেই আগে আসতে পারলাম। নইলে ধরাই পড়তে তোমারা। তা যাক। শিগ্গির তোমরা পালাও। ওরা যে কোন সময় এসে পড়বে।"

যোগীবিহীন অবস্থাতেই আসরে গান চলছে তখনও। হঠাৎ এই ছন্দপতনে শ্রোতৃকুল কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠলেও, পরে আবার সবাই আস্তে আস্তে মন দিলো গানের দিকে। সাজঘরে সবাই এবার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলো। এরই মধ্যে আসরের এক প্রান্তে আওয়াজ উঠলো-"গোরা সিপাই ঢুকেছে।"

সঙ্গে সঙ্গেই আসর থেকে লাফিয়ে উঠলো শ্রোতারা। গোরা সেপাইয়ের নামে গ্রামবাসীরা তখনও খুব তটস্থ। সবাই ভাবলো, অকারণে সিপাইরা এই দূর এলাকায় আসেনি। ওরা নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটাবে আজ এখানে। দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তারা চার দিকে ছুটতে লাগলো পড়িমরি অবস্থায়।

সিপাই এর নাম শুনে আসর থেকে পালিয়ে এলো লাল মিয়ার সঙ্গীরাও। চারদিকের হৈহুল্লোড়ের মাঝে লালমিয়া সহ সবাই তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল দর্শকদের ভিড়ে মিশে। লাল মিয়াসহ অনেকেই দূর থেকে শুনতে পেলো কতকগুলি অশ্বপদ শব্দ। আসরের কাছে এসেই থেমে গেল শব্দগুলো। এর পর অনেকেরই কানে পড়লো গোরা সিপাই-এর হুংকার-"যোগীয়া কি ধার? যোগীয়া?"

বৈঠকখানায় বসে আছেন তরফদার সাহেব। চুপচাপ বসে আছেন জরাগ্রস্থ অবস্থায়। নিদারুন হতাশায় তাঁর মুখমন্ডল দ্যুতিহীন। এত দিনও পরীবানুর সন্ধান করতে না পেরে ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। দুর্বৃত্তদের কিছুমাত্র বিহিত করতে না পেরে দমে গেছেন চরম। আর তাঁর আস্থা নেই কারো উপর। এমন কি তাঁর নিজের উপরও না। ইংরেজদের সিপাইরা যে এত বড় অপদার্থ-এটা তিনি জানতেন না। তুচ্ছ

www.pathagar.com

কয়টা গেঁয়ো-ভূতকে আজও তারা বাগে আনতে পারবে না-এটা তিনি কল্পনাও করেননি। মিয়াজানের কথাতেই তাদের কাছে গেছেন তিনি। মিয়াজানও এখন প্রায় বাইরে বাইরেই থাকে। খোঁজ করার অজুহাতে কাচারীতে বসেইনা। খোঁজ যে কেমন করে তা মিয়াজান মিয়াই জানে। মাঝে মাঝে এসে খরচাটাই নেয় কেবল। তার উপরও আর আস্থা নেই তরফদারের। তার মতো বিচক্ষণ লোকও যে কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না, এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর। তার ছেলের সাথে পরীবানুর বিয়ে হলোনা বলে যে সে ফাঁকে গিয়ে বসে বসে রঙ্গটাই দেখছেনা, তা কে বলতে পারে? মানুষেরই তো মন।

বৈঠকখানায় বসে বসে এসব কথাই ভাবছেন তিনি। মিয়াজান মিয়া নিজেও যে পরীবানুকে অপরহরণ করতে পারে- এতখানি অবিশ্বাসী মন নয় তরফদারের। তাই, ও কথাটা একবারও মাথায় তাঁর আসছে না। অবসন্ন মনে তিনি আবোল তাবোল চিন্তা করছেন একা একা, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিয়াজান আলী মিয়া। মিয়াজান মিয়া সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন-"কোন খোঁজ খবর করতে পারলে মিয়াজান?

বরাবরের মতোই মিয়াজানও উৎসাহের সাথে বললেন-"হ্যাঁ হুজুর, আমি ওদের পেছনে পেছনেই আছি! আসলে ওরা জাত ডাকাত তো, তাই সামনে যেতে পারছিনে। পেছনে থেকে সিপাই দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। ওদিকে আবার ফিরিঙ্গি সিপাইরাও যা বলি তা ঠিক মতো বোঝেনা। একদিক বললে আর একদিকে যায়। এসব কারণেই দেরী হচ্ছে কিছুটা।"

তরফদার সাহেব এরকম কথা বরাবরই শুনছেন। তাই গম্ভীর হয়ে বললেন-"হুঁ! কিন্তু সেই কিছুটা আর কত দিন?"

জোরদারভাবে উত্তর দিলেন নায়েব। বললেন-"না হুজুর, আর মোটেই দেরী নেই। আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাটাদের ধরিয়ে দিয়ে পরীবানুকে কেড়ে নিয়ে আসছি।"

- হুঁ।

- পরীবানু তো ইচ্ছে করেই ওদের সাথে আছে হুজুর! ছিনিয়ে না আনলে তো সে নিজ ইচ্ছায় আসবেনা।

- বটে!

- নিজের ইচ্ছায় এলে কি আর এতদিন তাকে আটকে রাহতে পারে ? আসলে আমার যা সন্দেহ হচ্ছে, তাতে হয়তো ব্যাটাদের ধরিয়ে দেয়ার পরও তাকে ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

তরফদার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন-"আগে হদিস্‌টাই বের করোনা দেখি! ফিরে আসা-না-আসা সেটা পরে দেখা যাবে। ইচ্ছে করেই সে যদি আর না আসে, ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। ঐ দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে পারলেই আমার হলো।"

www.pathagar.com

নায়েব সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিয়ে বললেন- "হ্যাঁ হুজুর! আমিও তাই বলি। যে গেছে তাকে আর জোর করে টেনে লাভ কি? ঐ ব্যাটাদের শায়েস্তা করাই হবে এখন আপনার সব চেয়ে বড় কাজ।"

- সেই শায়েস্তাটা করি আমি কি করে? সবাই যদি এতবড় অপদার্থ হয়-

- আর সামান্য কয়দিন অপেক্ষা করুন হুজুর। জাল যে ভাবে বিছিয়েছি, তাতে বাছাধনেরা আর যাবে কোথায়? ধরা এবার পড়তেই হবে। এখন শুধু প্রয়োজনীয় খরচটা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারলেই ব্যস্।

- এবার আবার কত চাও?

- মোটা টাকাই লাগবে হুজুর। অনেক লোককে কাজে লাগাতে হচ্ছে-

- হুঁ!

- হুজুর?

- বসো দেখি কত কি করতে পারি।

খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরো কিছু টাকা এনে নায়েবকে দিতেই অতি সত্বর কাজ হাছিলের ওয়াদা করে বেরিয়ে গেলেন নায়েব সাহেব।

মেলা থেকে পালিয়ে এসে চুপচাপ কয়েকদিন বসে ছিল লালমিয়ারা। কোন দিকেই কেউ বড় একটা বেরোয়নি। উপার্জিত অর্থ তাদের ফুরিয়ে এলো ক্রমেই। উপার্জনের চিন্তা আবার প্রকট হয়ে উঠলো। রথের মেলা শেষ হয়েছে ইতিমধ্যেই। নিরাপদও ছিল না আর রথের মেলায় গান গাওয়া। ফিরিঙ্গীদের আনা গোনা এড়িয়ে এড়িয়েই চলতে হবে তাদের। পরীবানুর খোঁজখবরও করতে হবে এই ভাবেই। অধিক দিন এক এলাকায় থাকলেও তাদের চলবেনা। এখান থেকেও যেতো তারা এতদিন। শুধু সমজান আলীর খবরটাই ধরে রেখেছে তাদের। সেই বৃদ্ধের দেখা ঘটনাটার সুরাহা চাই একটা। ওটা পরীবানু না অন্য কেউ- এটা নিশ্চিত হওয়ার দরকার। সে কারণে আরো কয়দিন থাকতে হবে এখানে। আছেও তাই আজও।

কিন্তু পেটের ধান্দায় আবার তাদের গানের বায়না খুঁজতে হচ্ছে। যোগীর বায়না পাওয়া যাচ্ছে নানা দিকেই। কিন্তু যোগীগান আর গাইতে তারা নারাজ। ঐ নামেই ফিরিঙ্গীরা খুঁজে ফিরছে তাদের। রথের মেলার এলাকায়ও বায়না তারা নেবে না। ও ঝুঁকি আর নিতে চায়না তারা।

বিকেল বেলা গঞ্জ থেকে ফিরে এলো বছির। খবর দিলো-বায়না একটা পেয়েছে সে সেখানে। মাদার গানের বায়না। মোটা মুটি এটাও একটা ভাল টাকার বায়না। আগামী কালই আসর দেয়ার চুক্তি করেছে সে।

www.pathagar.com

অনেকটা মনমরা হয়ে বসেছিল সকলে। এ খবরে সবাই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। পরের দিন সন্ধ্যের আগেই সবাই গিয়ে হাজির হলো গঞ্জে।

পীর মাদার কিংবদন্তীর কামেল পুরুষ একজন। আর পাঁচজন খ্যাতনামা কামেল পীরের মতোই মাদার একজন ডাকসাইটে মারুফতী পীর। খেয়ালী ও পাগল। কিংবদন্তী অনুসারে হারুত-মারুত নামক দুই ঐশ্বরিক দূত আল্লাহর হুকমে আসে দুনিয়ায়। কিছুদিন পরই দুনিয়ার আচরণ দেখে ইশ্‌কের ভাব উদয় হয় উভয়ের অন্তরে। এই ইশ্‌কেরই এক পর্য্যায়ে জন্ম হয় মাদার পীরের। তার জন্মের পরই হারুত মারুত ত্যাগ করে এ দুনিয়া। থাকে শুধু শিশুটি। হজরত আলী (রাঃ) শিকারে এসে কুড়িয়ে পান মাদারকে। তিনি তাকে পালন করেন পুত্র বৎ। কালক্রমে কঠোর সাধনা করে অলৌকিক শক্তির অধিশ্বর হয় মাদার পীর। সে শক্তি সে দেশে দেশে জাহির করে বেড়ায়। এক এক স্থানের ঘটনা নিয়ে এক এক পালা এগানের। একটি একটি করে বারটি চমকপ্রদ পালা আছে এ গানের। এর একটি পালা বড়পীর সাহেবকে নিয়ে। তাঁর সাথে মাদার পীরের মারুফতী লড়াই এর পালা। এই পালাই শুরু করেছে লাল মিয়া।

মহিশূরের টিপু সুলতানের তাজের মতো তাজিয়া একটা মাথায় দিয়ে, হাতে তেলকুচকুচে আশা (ছোট লাঠি) নিয়ে, আপাদলম্বিত কালো আলখেল্লা পরিধান করে মাদার সেজেছে লাল মিয়া। মাদারের শিষ্য জুমল সেজেছে বাহার। আসরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে পালাগাইছে লালমিয়া। এ গিয়ে চলেছে কাহিনী। বড়পীর সাহেবের সাথে পাল্লা দিতে যাওয়ার জন্যে শিষ্য জুমলকে নিয়ে খাড়া হয়েছে মাদারপীর। এ বিষয়ে হাঁক ছেড়ে গান ধরেছে লালমিযা। আসরের মাঝখানে জটলা করে বসে খোল করতাল বাজিয়ে ধূয়া ধরছে সঙ্গীরাঃ

লাল ঃ "(ওরে) দম ভরেতে খাড়া হলো-
সঙ্গীরা ঃ দম ভরেতে খাড়া হলো-
লাল ঃ ওরে- আলীর পালক বেটা
সঙ্গীরা ঃ আ- আ- আ-
মাদার ঃ ডান হাতে তুলিয়া নিলো পাগল
মাদারিয়া ছটা গো-
সঙ্গীরা ঃ আরে - ও - ও - ও।
লাল ঃ হাতে ছটা, মাথে জটা, ওরে-
সঙ্গীরা ঃ হাতে ছটা মাথে জটা,
লাল ঃ ওরে পৃষ্ঠে বাঘের ছাল-
সঙ্গীরা ঃ আ- আ- আল্
লাল ঃ দম্‌দম্ শবদে পাগল বলো
সদাই বাজায় তাল গো-
সঙ্গীরা ঃ আরে- ও- ও - ও-।

www.pathagar.com

লাল ঃ এ নগর হইতে পাগল ওরে-
সঙ্গীরা ঃ এ নগর হইতে পাগল-
লালা ঃ ওরে- ও নগর যায়
সঙ্গীরা ঃ আ- আ- আয়
লাল ঃ দেরাখ তলে যেয়ে বলো বাবা
উপস্থিত হয় গো-
সঙ্গীরা ঃ আরে ও- ও- ও-"

জমে উঠেছে গান। শ্রোতারাও মসগুল হয়ে শুনছে। এমনই সময় আবার তাদের ভাঙ্গতে হলো আসর। গঞ্জে ঢোকার সদর রাস্তায় পাহারায় ছিল ময়জুদ্দীন মজু। পাহারা রেখেই গান জুড়েছে আজ তারা। সেখান থেকে ছুটে এলো ময়জুদ্দীন। লাল মিয়াকে এককোণে ডেকে নিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো- "ওস্তাদ, এখনই পালাতে হবে।"

তার ব্যস্ততার ধরণ দেখেই পরিস্থিতি আঁচ করলো লালমিয়া। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সে প্রশ্ন করলো- "মানে?

- ঐ ব্যাটা নায়েব নিজে এসেছে সিপাই নিয়ে। বাজারে ঢোকার মোড়ে সে তাদের সাথে কথা বলছে।

- সে কি!

- হ্যাঁ। আমি স্বচোক্ষে দেখলাম আর শুনলাম। নায়েব ঠিক মতো সেপাইদের বোঝাতে পারছেনা বলেই তাদের দেরী হচ্ছে। নইলে এতক্ষণ এসে পড়তো এখানে। নায়েব বলছে- যে লোক মাদার সেজেছে সে-ই আসল ডাকাত। ওকেই আগে ধরো। ফিরিঙ্গীরা বলছে -কেঁউ? মাদার কেঁউ? হাম লোগ মাদার-ফাদার নেহি জান্‌তা। যোগীয়া কৌন্? যোগীয়া ?

- সর্বনাশ!

আর এক মুহূত্ত না দাঁড়িয়ে সবাইকে এতেলা দিলো লাল মিয়া। সঙ্গীসাথী নিয়ে সে সেখান থেকে সরে পড়লো এক পলকে।

হতভম্ভ দর্শকরা একটু পরেই শুরু করলো চীৎকার। তারা ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুছে উঠার আগেই হৈ-হৈ করে ছুটে এলো ফিরিঙ্গীরা। কৌ হ্যায় মাদারিয়া? বাতাও জলদি'- বলে হুংকার দিয়ে ফিরতে লাগলো তারা। লাল মিয়াদের কাউকেই সেখানে না দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন মিয়াজান আলী মিয়া।

কিছুক্ষণ এধার ওধার খোঁজ করার পর সেপাইরা ফিরে এলো সক্রোধে। আসামীদের লেশমাত্র অনুসন্ধান না পেয়ে তারা বাঘের মতো চড়াও হলো মিয়াজান মিয়ার উপর। অকারণেই তাদের এমন হয়রান করার অপরাধে তাকে বুট দিয়ে কয়েকজন গুতো মারলো কয়েকটা। অতঃপর অনেকক্ষণ ধরে অকথ্য ভাষায় গালী বর্ষণ করার পর গঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল সিপাইরা। লাথিগুতোর ধকলটা কোনমতে সামলে নিয়ে গঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলেন মিয়াজান আলী মিয়াও।

www.pathagar.com

গঞ্জ থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ীর দিকে গেলেন না। রাত্রির অন্ধকারে গা মিশিয়ে দিয়ে চুপি চুপি-হাজির হলেন সাঙ্গাত্‌দের আখড়ায়। অল্পের জন্যে লালমিয়াদের ধরিয়ে দিতে না পেরে ফের তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লাল মিয়ারাই একমাত্র পথের কাটা তাঁর। পরীবানুকে নিয়ে কোন বিপদ ঘটে যদি, এরাই তা ঘটাবে। পরীবানুর সন্ধানও কেউ মরিয়া হয়ে করে যদি, এরাই তা করবে। তিনিই যে পরীবানুকে সরিয়ে এনে রেখেছেন, এটার এরা তিল পরিমান আভাস পেলে প্রকট হয়ে উঠবে তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্নও। প্রভুর হয়ে ডাকাতদের ধাওয়া করা আর পরীবানুকে নিজেই তাঁর সরিয়ে রাখা, এদের কাছে একটুখানি অপরাধ নয়। এর জন্যে এরা তাঁকে খুন করতেও পারে। এতদিক থাকতে যে এ ব্যাটারাও শেষ পর্যন্ত এই দিকেই আসবে, এটা তিনি কল্পনাও করেন নি। মাত্র এই কয়দিন আগে এই খবরটা কানে গিয়েছে তাঁর। আর এটা তাঁর কানে যেতেই ভীষণভাবে আঁতকে উঠেছেন তিনি। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি সেই থেকেই লেগে আছেন পরীবানুকে স্থানান্তরে সরিয়ে নেয়ার কাজে। এদের সিপাইদের হাতে ধরিয়ে দিতে পারলেই আজ চুকে যেতো সব ল্যাঠা। বিপদের আর লেশমাত্র আশংকাও থাকতোনা। অনেক খোঁজ খবর নিয়েই তিনি জালটা আজ বিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু মাথামোটা ফিরিঙ্গীদের নির্বুদ্ধিতার দরুণই ফস্‌কে গেল দাঁওটা আর ভূগ্‌তে হলো তাঁকে। এখন পরীবানুকে সরাতেই হবে এখান থেকে। এতে যদিও ফের রুষ্ট হবে, পরীবানুকে পোষ মানানো কঠিন হবে, তবু তিনি নিরুপায়!

সাঙ্গাত্‌দের সাথে বসে এসব নিয়ে অনেক কথাই হলো তাঁর। মোটা টাকা খরচ করে যে সব ভাড়াটিয়াদের কাজে রেখেছেন তিনি, তাদের কর্মতৎপরতা জোরদার করার ব্যাপারে অনেক কথাই কিছুক্ষণ ধরে বললেন। সবশেষে ভাড়াটিয়াদের একজনের হাতে আরো কিছু টাকা দিয়ে বললেন- "এই যে টাকা নাও। পরীবানুকে এখানে রাখা কিছুতেই আর ঠিক নয়। কাল সন্ধ্যার আগেই পরীবানুকে একখানা গরুর গাড়ীতে করে গঞ্জের দিকে নিয়ে যাও। গঞ্জের পাশে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে তাকে নৌকায় তুলো। সেখান থেকে নৌকা ছেড়ে সোজা মাঝ গাঁয়ের পুরানো কাচারী বাড়ীতে ভেড়াও। সব ব্যবস্থা করা আছে সেখানে। কাচারী ঘাটে নৌকা ভিড়লেই যা করার তা ওখানকার লোকেরাই করবে। সম্ভব হলে আমিও ওখানে থাকবো।"

নায়েব সাহেব থামতেই ভাড়াটিয়াদের এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো-" বেলা থাকতে কি এই নড়ানড়ি ঠিক হবে? সব কিছু ফাঁস যায় যদি?

এর উত্তরে নায়েব সাহেব বললেন- "ফাঁস হবার কোন কারণ নেই। পরীবানুর চোখ-মুখ আর হাত-পা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেবে। সে যেন কথা বলতে বা নড়তে চড়তে না পারে। গাড়ী আর নৌকার ছই আগাগোড়া কাপড় দিয়ে ঢেকে নেবে। বাইরে থেকে কেউ যেন কিছু দেখতে না পায়, ব্যস্! এছাড়া নদীর ধারে যেতে যেতেই সন্ধ্যে হবে। শুধু গাড়ী থেকে নৌকাতে তোলার সময় একটু সতর্ক

www.pathagar.com

হয়ে তুললেই হলো। জানাজানির কোন প্রশ্নই আসে না।"

- তবু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে? যদি জানতে চায় ছই এর মধ্যে কে যায়?

এ ব্যাপারেও নায়েব সাহেব বুদ্ধি এঁটে রেখেছেন। বললেন- "বলবে, মেয়ে মানুষ। পাগল এবং অসুস্থ মেয়ে মানুষ। নূরার গাড়ার শেখ সাহেবের আত্মীয়া। চিকিৎসা করার জন্যে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফুরিয়ে গেল। বেশী কথার দরকার কি? কাল সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ো। তাতে সারারাত নিরাপদে নৌকাপথে যেতে পারবে। আমি এখন উঠি। এখনই আমি গঞ্জে আবার ফিরে গিয়ে নৌকা ধরে মাঝগাঁয়ে রওনা হচ্ছি।"

কিছু ঝক্কি-ঝুঁকি মেনে নিয়েই এই কাজে হাত দিয়েছে ভাড়াটিয়ারা। কাজেই নায়েবের এই নির্দেষণার পর আর বলার মতো কিছুই তাদের রইলো না। নায়েব সাহেব উঠে পড়লেন তখনই। যাবার আগে সবাইকে আবার হুঁশিয়ারী দিয়ে জানালেন যে, যাকে এই টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে সে শুধু তরফদারের মেয়েই নয়, তাঁর ভবিষ্যতের স্ত্রী। অতএব, তাকে যেন ইজ্জতের সাথে নাড়াচাড়া করা হয়।

সেদিন শেষরাতেই শুরু হলো বর্ষণ। বর্ষণটা আজ কয়দিন ধরেই মাঝে মধ্যে হচ্ছে। কিন্তু এ বর্ষণটা চলতে লাগলো একটানা আর মুশলধারে। শেষ রাত থেকে শুরু করে পরের দিন প্রায় নাস্তার বেলা পর্যন্ত অবিরাম বর্ষণে টলমল হয়ে গেল বিল-চলনের পথ প্রান্তর। এরপর আরো খানিক টিপ্‌টিপানীর পর রোদ বেরোলো দুপুর বেলায়। গঞ্জ থেকে লাল-মিয়ারা আস্তানায় ফিরে এসে সারারাত সন্ত্রস্তভাবে কাটালো। অবিরাম বৃষ্টির জন্যে পরের দিনও ভরদুপুর আটকে রইলো আস্তানায়। আসর ভেঙ্গে পুনঃপুনঃ এভাবে পালিয়ে এসে এখানে যে অবস্থান আর নিরাপদ নয়, এটা তারা বুঝে নিয়েছে সকলেই। ইংরেজদের নজর যখন এদিকে একবার পড়েছে, বিশেষ করে মিয়াজান মিয়া তাদের হদিশ একবার যখন পেয়েছে, তখন যে কোন সময় এই আস্তানাতেও আসতে পারে সিপাই। এছাড়া, এ অঞ্চলের লোকজনও এখন সন্দেহ করবে তাদের। সিপাই যাদের হরহামেশাই তাড়া করে ফিরছে, তাদের আর এ অঞ্চলে স্থান দেবেনা কেউ। কাজেই, পরীবানুকে আরো খানিক খুঁজে দেখার প্রয়োজনটা থাকলেও, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এখন সরতে হবে এখান থেকে। ধরা পড়লে ফেঁসে যাবে সকলেই। পরীবানুকে সন্ধান করার প্রশ্নই আর থাকবে না।

তাই, তারা রোদ বেরোনোর পর পরই সোচ্চার হয়ে উঠলো। এক জায়গাতে না থেকে নানা দিকে সবাইকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলো লালমিয়া। বলে দিলো, সন্ধ্যের পর সবাই আবার জড়ো হবে আস্তানায়। রাত্রির অন্ধকারে তারা এ অঞ্চল ত্যাগ করবে সকলের অজ্ঞাতে।

বেলাটুকু কোনমতে কাটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এক একজন বেরিয়ে পড়লো এক এক দিকে। নিজ নিজ খেয়াল খুশী অনুসারেই বেরিয়ে পড়লো তারা। লাল মিয়াও হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো বড় বাগানের ডহরে। মন্দিরটির সামনাসামনি একবার

www.pathagar.com

সে দাঁড়িয়ে গেল একারণেই। অতঃপর আবার সে এগিয়ে চললো সামনে। গ্রামান্তরের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো একমনে। দু'এক গাঁ ডিঙ্গিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো খোলা এক মাঠের মধ্যে। আনমনে আরো কিছুটা এগুতো সে। কিন্তু সামনেই ভীষণ কাদাপাঁক। উচুঁ ডহরটার অনেক খানি ভেঙ্গে চুরে বসে গেছে এখানে। বৃষ্টির পানি জমে আর গোবাদী পশুর চলাচলে কাদা পাঁকে ভর্তি হয়ে গর্তের আকারে পড়ে আছে রাস্তার এ অংশটুকু। বিশ-পচিশ হাত লম্বা। কাজেই সে আর এগুলোনা। রাস্তার এক পাশেই ছিল উঁচু একটা ঢিপি। রাস্তা থেকে অল্প একটু দূরে। ঢিপির উপর ছোট বড় কয়েকটা কদম গাছ। জায়গাটা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। একটু আড়ালও বটে। ডহর থেকে নেমে জমির আইল বেয়ে হেঁটে এই কদম তলায় চলে এলো লালমিয়া। ইতস্ততঃ কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর আনমনে সে বসে পড়লো সেখানেই। বসলো এক কদম গাছের নীচে। বসে রইলো চুপ চাপ।

ক্রমে ক্রমে গড়িয়ে গেল বেলা। সূর্য্যাস্তের মুহূর্তে উঠি উঠি করতেই সে দেখতে পেলো ঐরাস্তা বেয়ে এগিয়ে আসছে একখানা গরুর গাড়ী। গাড়ীটার ছইখানা আগাগোড়া লাল কাপড়ে ঢাকা। গাড়ীটা এগিয়ে এলো গর্তের কাছে। ক্যাঁ-কুঁ-শব্দ করে গাড়ীর চাকা নেমে গেল গর্তের মধ্যে। কিছু দূরে যাওয়ার পরই আটকে গেল চাকা। অনেক কসরত করার পরও বলদ দুটি কাদা পেরিয়ে গাড়ীটাকে আর সামনে নিতে পারলো না। চেয়ে চেয়ে দেখছে এসব লালমিয়া। গাড়োয়ানটা বৃদ্ধ। মাথা জোড়া টাক। মুখ ভরা চাপদাড়ি। পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়ে টেকো মাথায় হাত বুলাচ্ছে সে। গাড়োয়ানের পাশেই একজন যাত্রী ছিল বসে। সে নেমে পড়লো কাদায়। দুই হাতে চাকামেরে সে অনেক খানি এগিয়ে নিলো গাড়ীটা। কিন্তু একবারেই আটকে গেল নীচু থেকে শুকনো রাস্তায় উঠার কালে। সে প্রাণপণে চাকা ঠেলতে লাগলো। কিন্তু মানুষ সে একা। এক চাকা উঠেতো আর এক চাকা উঠে না। বোঝা গেল, আর একখানা শক্তিশালী হাত ছাড়া ও চাকা আর উঠবে না। গাড়োয়ানটা নেমে এলে বলদ দুটি হাঁটেনা। দুজনে তারা অনেকভাবে চেষ্টা করলো অনেকক্ষণ। কিন্তু কিছুতেই তারা গাড়ীখানা শুকনায় তুলতে পারলো না। সূর্য্যের তখন অর্দ্ধেকটাই তলিয়ে গেছে দিগন্তে। ডহরটা আগা গোড়াই নির্জন। আশে পাশে জন প্রানীর চিহ্ন নেই কোথাও। হতাশ হয়ে এদিক ওদিক চাইতেই তারা দেখতে পেলো লাল মিয়াকে। নিরুপায় হয়ে তাকেই তারা ডাকতে লাগলো সবিনয়ে। তাদের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করতে না পেরে এগিয়ে এলো লালমিয়া। হাত লাগালো চাকাতে। দুই দিক থেকে দুইজনে প্রাণপণে ঠেলা দিতেই উঠে গেল গাড়ীটা। গাড়ীর মধ্যে অবিরাম শব্দ হচ্ছে গোঙ্গানীর। কে যেন প্রাণপণে কাতরাচ্ছে গাড়ীর মধ্যে। লাল মিয়া কথা বলতেই বিপুল বেগে বৃদ্ধি পেলো গোঙ্গানী। নড়াচড়াও বৃদ্ধি হলো ছইএর মধ্যে। লালমিয়া প্রশ্ন করতেই যাত্রী লোকটি হাসিমুখে জানালো, একজন পাগলী জেনানা আছে ভেতরে। শেখের বাড়ীর পর্দানশীন মেয়ে। তার তলপেটে অসম্ভব রকম ব্যথা। চিকিৎসার জন্যে তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই

www.pathagar.com

উপকারের জন্যে সে লালমিয়াকে এক কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়তে বললো। গাড়োয়ান তাড়া দিলো গরুকে। ডাঙ্গা পেয়ে দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলো বলদ দুটি। গড়গড় করে সামনের দিকে এগিয়ে চললো গাড়ী। তৈলবিহীন গাড়ীর চাকার সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ এক হয়ে মিশে গেল রমণীকণ্ঠের করুণতম আর্তনাদের সাথে। গোধুলীর আধো আলো আধো আঁধারের মাঝে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হলো গাড়ীটা। বেখেয়ালে কিছুক্ষণ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রইলো লাল মিয়া। এর পর সে ফিরে এলো কাদা ভেঙ্গে। পাশের এক খালে নেমে হাত পা ধূয়ে দিয়ে আবার সে পা বাড়ালো বড় বাগানের গাঁয়ের দিকে।

পাগলী রুগীটার কথা আনমনে ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলেছে লালমিয়া। বড় ঘরের পাগলী মেয়ে। যুবতী বলেই মনে হয়। তলপেটে ব্যথা। শহর বহুত দূরে। যেতে সময় লাগবে অনেক। ভাবতে ভাবতে একবার তার মনটা খুব টন টন করে উঠলো। যতই সে গাড়ী ঠেলে মেয়েটার আর্তনাদ বৃদ্ধি পায় ততই। নিশ্চয়ই গাড়ীর ঝাঁকুনীটা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কষ্টটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে মেয়েটার। আহা বেচারী!

হাঁটতে হাঁটতে বড় বাগান পেরিয়ে এলো লালমিয়া কি যেন কি ভেবে সে আস্তানায় না গিয়ে অন্য রাস্তায় চলে গেল পূবপাড়ায়। অকারণেই নানাস্থানে দীঘ সময় কাটিয়ে অনেক রাত করে সে যখন ফিরে এলো আস্তানায়, তখন সেখানে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গেছে। লাল মিয়াকে দেখেই সবাই হৈহৈ করে ছুটে এলো তার কাছে। ব্যগ্র কণ্ঠে ময়জুদ্দীন মজু বললো- "ওস্তাদ, ওস্তাদ- পরীবানুর সন্ধান পাওয়া গেছে।"

চমকে উঠলো লালমিয়া। সে উদ্গ্রীব কণ্ঠে বললো- "কোথায়?"

মজু ঐ একইভাবে বললো- "ঐ বড় বাগানে। এতদিন ঐ বড় বাগানেই ছিল। আজকেই তাকে সরিয়েছে।"

আঁতকে উঠলো লালমিয়া। বললো-" সে কি!"

ছুটতে ছুটতে নিকটে এলো সমজান আলী। সে হাহুতাশ করে বললো- "সর্বনাশ হয়ে গেছে ওস্তাদ, একেবারে মাথায় বাড়ি হয়ে গেছে। চোখ থাকতে আমরা এতদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম!"

লালমিয়া বললো-"মানে!"

সমজান বললো- "ঐ বড় বাগানের মধ্যে একটা মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের মধ্যেই এতদিন আটক ছিল পরীবানু।"

- বলো কি! কি করে তা জানলে?

- যে বুড়ি তাকে ভাত খাওয়াতো, সেই বুড়ির মুখেই শুনলাম। দক্ষিণ পাড়ায় বুড়ির বাড়ী। লোক বসতি নেই ভেবে ওদিকে আমরা যায়নি এতদিন। আজকেই সে সন্ধান পেয়ে বুড়ির কাছে গেলাম। তাকে হাতে পায়ে ধরতেই সে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব ঘটনা বললো। পরীবানুর নাম-ধাম, পয়পরিচয়, সব কিছু। বুড়িটারও নাকি খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল পরীবানুর দুঃখ দেখে। ভয়ে সে বলতে পারেনি

www.pathagar.com

কাউকে কিছু।"

- তারপর?

- বুড়ি বললো, এক মাঝবয়সী ভদ্দরলোক নাকি ধরে এনেছে তাকে। সাথে অনেক ভাড়া করা লাঠিয়াল আছে। আজকেই নাকি পরীবানুর হাত-পা আর চোখ-মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ঐ মন্দির থেকে সরিয়ে এক গরুর গাড়ীতে করে গঞ্জের দিকে নিয়ে গেছে।

বিপুল বেগে নড়ে উঠলো লাল মিয়ার হৃদপিণ্ড। সে চীৎকার করে বলে উঠলো- "ওরে চল্-চল্, শিগ্গির গঞ্জের দিকে চল্।

উন্মাদের মতো ছুটতে গেল লাল মিয়া। তাকে দৌড়ে গিয়ে টেনে ধরলো সমজান আলী। বললো-" আরে থামো- থামো। একটু থামো। খবর শুনেই বছির, তফেল, আসকান, জামলা, কছের, সামাদ- এরা সবাই গঞ্জের দিকে ছুটে গেছে। খবর নিয়ে কেউ না কেউ এখনই এখানে আসবে। আমরা আবার একদিকে বলে আর এক দিকে গেলে যোগাযোগ আর থাকবেনা।"

তবু লালমিয়াকে ধরে রাখা কষ্টকর হলো সকলের। এক অব্যক্তব্য যন্ত্রণায় সে অবিরাম ছটফট করতে লাগলো। খানিক পরই গঞ্জ থেকে ফিরে এলো বছিরেরা। কেউ একা নয়, সকলেই এক সাথে। তাদের দেখেই ছুটে এলো লালমিয়া। প্রশ্ন করতেই বছির আফছোস করে বললো-" পারলামনা ওস্তাদ! আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কোন দিকে পরীবানুকে নিয়ে গেল বদমায়েশেরা, গঞ্জে গিয়ে তার কোন সন্ধানই পেলামনা। ফেরার পথে গাড়ীটারও সন্ধান পেলাম বটে, কিন্তু অনেক আগেই পরীবানুকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়েছে ওরা।"

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো- "মানে?"

বছির বললো-" মানে, গাড়ীটা নদীর ধারে গেলেই চার পাঁচজন লোক এসে গাড়ী থেকে পরীবানুকে নামিয়ে নিয়ে নৌকার দিকে যায় এবং গাড়োয়ানকে তার পাওনা দিয়ে বিদেয় করে তখনই। নৌকাটা কেমন, উজানে না ভাটিতে গেল, এসব গাড়োয়ানকেও দেখতে দেয়নি, আমরাও গিয়ে আর হদিস করতে পারলাম না। সন্ধ্যের খানিক পর পরই নাকি নাও ছেড়েছে ওরা। আর আমরা তো গেলাম এই অনেক রাতে।"

শুনে সমজান বললো-" তাহলে ঐ গাড়োয়ানটাকে ছাড়লে কেন? ঐ ব্যাটাকে চাব্কালেই তো সব সন্ধান পাওয়া যেতো।"

বছির বললো-" সে চেষ্টা কি আমরা করিনি? কিন্তু দেখলাম, গাড়োয়ানটা আসলেই একটা গোবেচারা। গঞ্জের একজন দৈনন্দিন ভাড়া বওয়া লোক। ভাড়ার জন্যেই গাড়ী বেয়েছে সে। ওদের কেউ নয়। নানাভাবে যাচাই করে দেখলাম, ভেতরের খবর সত্যিই সে জানে না। পাগল একজন রুগী মানুষকে গঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে- এই বলেই বদমায়েশেরা ওর গাড়ী ভাড়া করেছিল। পর্দানশীন মেয়ে বলে রুগীকে গাড়ীতে তোলার সময় গাড়োয়ানকে থাকতে দেয়নি গাড়ীর কাছে। আঁধারের

www.pathagar.com

মধ্যে নামানোর সময়ই ও আবছা আবছা দেখতে পেয়েছে- মেয়েটার চোখ-মুখ হাতপা কাপড় দিয়ে বাঁধা।"

শুনে বাহার বললো-"কিন্তু-"

বছিরের এক সঙ্গী আরো জোর দিয়ে বললো- "কোন কিন্তু নেই। গাড়োয়ানটা ঐ গঞ্জের পাশেই থাকে। প্রায় লোকই ওকে চেনে। খোঁজ করলে ঐ গঞ্জেই আবার পাওয়া যাবে তাকে। আসলে পরীবানুকে নামিয়ে নেয়ার আগে সে ব্যাপারটা অনুমান করতেই পারেনি। চোখ মুখ বাঁধা দেখেই সন্দেহ হয় তাঁর। কিন্তু তখন সব কিছুই তার আয়ত্তের বাইরে। গাড়োয়ানটা বললো- ছইটাও ওরা লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল সে গাড়ীতে উঠার আগেই। পর্দানশীন মেয়ে বলেই সন্দেহ হয়নি তার। গাড়ী চালানোর সময়ও সে দেখতে পায়নি রুগিনীকে। এছাড়া এক জন পাহারাদারও ছইয়ের সামনে বসে ছিল সব কিছু আড়াল করে।"

লালমিয়ারা গলা তখন শুকিয়ে গেছে পুরো-পুরি। থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে তার সর্বাঙ্গ। সে প্রাণপন চেষ্টা করে ঢোকচিপে বললো-"গাড়ীটা কি বড় বাগানের ডহর দিয়ে গিয়ে ছিল?"

বছির বললো- "হ্যাঁ, গাড়োয়ানটা তাই বললো। সন্ধ্যে হয় হয় সময়ে ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়েছে।"

লাল মিয়া আবার বললো-"গাড়োয়ানের মাথায় টাক, মুখে চাপদাড়ি?"

বছির অবাক হয়ে বললো-"হ্যাঁ- হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি কি করে জানলে?"

উদ্ভ্রান্তের মতো চীৎকার করে উঠে সে কোন মতে বলার চেষ্টা করলো- "ওরে- আমি নিজ হাতেই ঠেলে দিয়েছি গাড়ীটা! আমার মাথায় তোমরা-"

কথা সে শেষ করতে পারলো না। বিকারগ্রস্ত রুগীর মতো ছটফট করে উঠে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তখনই। হতবাক সঙ্গীরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরে মাথায় তার পানি ঢালতে লাগলো। কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর লাল মিয়া খানিক সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে ধরাধরি করে সবাই সেই রাতেই ত্যাগ করলো এ অঞ্চলের আস্তানা।

[উনিশ]

বাইরের সমস্যা সামলাতে ঘরের সমস্যা প্রকট হয়েছে মিয়াজান মিয়ার। দীর্ঘদিন ঘরের খবর নারাখায় ছোট বউ গুলাপজান আর ঘরে তার থাকেই না। যখন যেখানে ইচ্ছে, দুদিন- পাঁচদিন দশদিনও সে বাড়ী ছেড়ে ঘুড়ে বেড়ায় বাইরে বাইরে। ইদানিং এক কাঁচা বয়সের ইয়ার জুটেছে গোলাপজানের। নায়েবের ঘর ছেড়ে এই ইয়ারের ঘর করার জন্যে কোমর বেঁধে খাড়া হয়েছে সে। মেঝো বউ অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ি দিয়েছে বাপের বাড়ী। বড় বউ এসব নিয়ে বাকবিতন্ডা করায় তাকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন নায়েব সাহেব। বাক বিতণ্ডা ছাড়াও, এর পেছনে কারণ আছে আর একটা। পরীবানুকে নিয়ে ঘর বাঁধতে হলে নির্ঝঞ্ঝাট ঘরই তাঁর প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মাঝে একদিন এসে কথায় কথায় বড় বউকে অমানুষিক প্রহার করে তাকেও তালাক দেয়ার পাকাপোক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে গেছেন তিনি। বড় বউ অসহায়া। একেবারেই আশ্রয়হীনা। এ বয়সে এমনটি তার মৃত্যুর চেয়েও অধিক। তাই সে এখন প্রতিদিনই পানি ফেলে দুই চোখের। মায়ের এই দুঃখ দেখে ক্ষেপে গেছে হুকুমউদ্দীন। বাপের এই বেপরোয়া আচরণে তার মতো হুশবুদ্ধিহীন মানুষেরও বিষিয়ে গেছে মন। বিদ্রোহের অনল এখন অবিরাম জ্বলছে তার অন্তরে। ধিকি-ধিকি, একটানা।

এই আগুন একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আকস্মিক এক ঘটনায়। সিপাই নিয়ে নায়েব সাহেবের গঞ্জে যাওয়ার আগের দিনই ঘটলো এই ঘটনা। পরীবানুকে মাঝগাঁয়ে সরানোর ব্যাপার নিয়ে এক লোকের সাথে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন নায়েব সাহেব। বাড়ী থেকে অনেকখানি ফাঁকে এক নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তারা চাপাকণ্ঠে কথাবার্তা বলছিলেন। ঘটনাচক্রে হুকুম উদ্দীনও ঐ দিক দিয়েই আসছিল। ফিস্-ফাস্, শব্দ একটা কানে যেতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল প্রথমে। পরে একপা দুপা করে সামনের দিকে এগুতেই সে চিনতে পারলো বাপের গলা। কি যেন কি ব্যাপার নিয়ে বাপ তার অতিশয় ব্যস্ত আছেন আজকাল। ঘটনা কি জানার জন্যে সে চুপি চুপি আড়ালে এসে দাঁড়ালো। একেবারেই নিরিবিলি স্থান। তাদেরই বাড়ী সংলগ্ন এটা একেবারেই মফস্বল দিক। অন্য লোকের চলাচল বা জনপ্রানীর সাড়াশব্দ কিছুই নেই এখানে। কাজেই, কান পাততেই সব কথা তার স্পষ্টভাবেই কানে আসতে লাগলো। অনেক কথার সাথে পরীবানুকে দু'একদিনের মধ্যেই মাঝগাঁয়ে সরিয়ে আনার কথা এবং সেখানেই তাকে নায়েব সাহেবের বিয়ে করার কথা নির্ভুলভাবে শুনতে এবং বুঝতে পারলো হুকুমউদ্দীন। সব কথা শুনার পর এটুকুও বুঝতে তার অসুবিধা হলো না যে, পরীবানুকে লাল মিয়ারা নিয়ে যায়নি চুরি করে, নিয়ে গেছে তার বাপ মিয়াজান আলী মিয়াই।

আলোচনার শেষে লোকটাকে বিদেয় করে সরে পড়লেন নায়েব সাহেব। আড়ালে দাঁড়িয়ে বিপুল আক্রোশে ফুলতে লাগলো হুকুমউদ্দীন। বাপের প্রতি তার আর তিল পরিমান শ্রদ্ধা বিশ্বাস রইলোনা। বরং প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠলো সে। কিভাবে এই প্রতিশোধটা নেবে, শুধু এই কথাই ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরলো হুকুমউদ্দীন।

সে রাতে তার সুষ্ঠভাবে আহার-নিদ্রা হলো না। পরের দিনও কেটে গেল ঐ একই কথা ভাবতে ভাবতে। পরীবানুর সাথে তাকেই বিয়ে দেবে-এই কথা বাপ তার এতদিন বলে বলে, সেই বাপই আজ বিয়ে করছে পরীবানুকে- তালাক দিচ্ছে তার মাকে- এটা সে বরদাস্ত করতে পারলো না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে তার মনের মধ্যে অহর্নিশ তোলপাড় হতে লাগলো। এক পর্য্যায়ে সে এমনই ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো যে, একটা বাঁশ হাতে সে ছুটে গেল বাপের ঘরে। কিন্তু ঘর তখন শূন্য। বাপ তার বেরিয়ে গেছে আগের রাতেই। হতাশ হয়ে বাঁশখানা ফেলে দিয়ে ঘটনাটা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো সে। পরীবানুকে লাল মিয়া বা অন্য যে কেউ বিয়ে

www.pathagar.com

করে করুক, তার বাপ বিয়ে না করতে পারলেই সে খুশী। তার মায়ের তালাক না হলেই সে সন্তুষ্ট।

এখন সমস্যা দেখা দিলো-কথাটা সে বলে কাকে? তরফদারকে ভয় করে হুকুম উদ্দীন। অন্য লোকও পাত্তা দেয় না তাকে। তার কথা বিশ্বাস করবে কে? এ ভেবেও আর একটা দিন কেটে গেল হুকুমউদ্দীনের। অবশেষে হাজির হলো আবেদ আলীর বাড়ীতে। হারু সাঁতালও বসেছিল সেখানে। কথায় কথায় সব কথা সে খুলে বললো তাদের। পরীবানুকে মাঝগ্রামে পাওয়া যাবে এখন, এ কথাও সে বার বার জোর দিয়ে জানালো।

শুনে লাফিয়ে উঠলো হারু সাঁতাল। লাফিয়ে উঠলো আবেদ আলী। "হাঁপে ছালে বজ্জাত আদমী"-বলে হারু সাঁতাল দৌড় দিলো লাল মিয়াদের খোঁজে। আবেদ আলী বেরিয়ে পড়লো ঘটনাটির অনুসন্ধানে। তরফদারের কানে দেয়ার আগে এ ব্যাপারে আরো অধিক নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন। হুকুমউদ্দীনকে চার পয়সার দাম দেন না তরফদার। সে নিজে তার বাপের বিরুদ্ধে বললেও, এতবড় কথা তাঁকে এক কথায় বিশ্বাস করানো শক্ত। যদিও ঘটনাটি এমন হওয়াই স্বাভাবিক, তবু পথঘাট ভাল করে না বেঁধে তাঁকে সরাসরি এমন কথা বলতে যাওয়াও দায়। তাই আবেদ আলী বেরিয়ে পড়লো আরো অধিক প্রমাণাদির সংগ্রহে।

[বিশ]

অঝরে পানি ঝরছে লাল মিয়ার চোখে। অঝরে ঝরে পড়ছে আষাঢ়ের মেঘ। ভর ভর নদী নালা। আস্তানা থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিবাদলা মাথায় করে দুদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল মিয়ারা। ভরানদীর কুল বেয়ে তারা এলোপাতাড়ি খুজে বেড়াচ্ছে পরীবানুকে। অবস্থা তাদের নিতান্তই করুণ এখন। তারা প্রায় নিঃস্ব। একেবারেই নিরাশ্রয়। মুড়ি-মুড়কীর জোরে আর বাড়ী বাড়ী চেয়ে খেয়ে দিন কাটছে তাদের। বোঝার উপর শাকের আটির মতো লাল মিয়াকে নিয়েও আবার বিপদ হয়েছে আর একটা। সে এখন উদাসীন ও বেখেয়াল। এক অস্ফুট কান্নায় তার চোখ দুটো ভেজা থাকে সব সময়। কান্নার সুরে অবিরাম সে গান গায় গুণ গুণ করে। কোন দিক যেতে কোন দিক যায়, আদৌ সে খেয়াল তার আর থাকে না। কাজেই, তাকেও সামলে নিয়ে চলতে হচ্ছে এদের। লাল মিয়ার সর্দারী শেষ হয়েছে একেবারেই। সে সামর্থ তার লোপ পেয়েছে পুরোপুরি। তার সব দায়দায়িত্ব এখন সমজানের ঘাড়ে পড়েছে। সমজানকেই এখন চালাতে হচ্ছে দল। নির্দেশনা দিতে হচ্ছে পরিকল্পনায়। নিজেদের নিরাপত্তা আর পরীবানুকে খোঁজ করার পরিকল্পনায়।

একটিমাত্র গোলমালে আজ তাদের এই দুর্গতি। পরীবানু-গায়েব না হলে কিছুই তাদের হতো না। সে-ই ছিল রক্ষে-কবজ তাদের। সেই রক্ষে-কবজ হারিয়ে ফেলে এই দুর্দ্দশা তাদের আজ।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে অনেক রাতে উঠলো তারা শূণ্য এক হাটখোলায়। রাতের মতো আশ্রয় নিলো হাট খোলারই চালাঘরে। শূয়ে বসে কোন মতে রাত কাটানোর

www.pathagar.com

পর সকালে ফের বসলো তারা পরিকল্পনায়। পরীবানুকে খুঁজে বেড়ানোর পরিকল্পনায়। দু'এক কথার মাঝেই তারা লক্ষ্য করলো, লালমিয়া সেখানে নেই। কোন ফাঁকে সে উঠে গেছে তা কেউ খেয়াল করেনি। সচকিত হয়ে এদিক ওদিক চাইতেই তারা দেখতে পেলো লাল মিয়াকে। শুনতে পেলো গানের নামে তার মর্মস্পর্শী বিলাপ। অনেকখানি ফাঁকে এক খেজুর গাছের নীচে বসে গান গাইছে লাল মিয়া। গানের নামে কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ছে বার বারঃ

"আরে ও, ও-ও দারুণ বিধিরে-
হায়রে বিধি এই ছিলরে তোর মনে-
(এযে) আপন হাতে, আপন নিধিরে-
হায়রে আল্লাহ ঠেলিলাম আগুনে,
আহারে-।
আমি কি করিব, কোথায় যাবোরে-,
হায়রে দেবো কোন দরিয়ায় ওরে ঝাঁপ-
(ওরে) কোন পাষাণে ঠুকিলে মাথারে-
হায়রে আমার খণ্ডন হবেরে পাপ-
আহারে-!

সুরের চেয়ে কান্নাটাই ঝুরে পড়ছে চারদিকে। ব্যথিত চিত্তে কান পেতে চেয়ে রইলো সকলে। খানিক পর চোখ মুছে সবাই আবার মন দিলো আলোচনায়। ময়জুদ্দীন মজু গেল লাল মিয়াকে তুলে আনতে। সমজান আলী ধরা-গলায় বললে- " এটা আর দেখা যায় নারে বছির, আর সহ্য করাও যায় না। আমাদের কি হবে সেটা পরের কথা। পরীবানুকে অতি সত্বর খুঁজে পাওয়া না গেলে, ওস্তাদকে আর বাঁচানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আধ-পাগল তো হয়েছেই, অল্পদিনের মধ্যেই ও ঘোর উন্মাদ হয়ে পথে ঘাটে বেঘোরে প্রাণ দেবে।"

এর জবাবে বছিরের সাথে সকলেই একবাক্যে জানালো যে, প্রাণ যদি যায়ও তাদের তাও কবুল, ধরা যদি পড়তেও হয় তাও স্বীকার, এবার তারা ছড়িয়ে পড়বে গাঁয়ে গাঁয়ে। এক সাথে সকলেই দল বেঁধে না ঘুরে, চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়বে তারা। গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ী বাড়ী খোঁজ করবে ঘুরে ঘুরে। যেভাবেই হোক পরীবানুর সন্ধান তারা বের করবেই সত্বর।

এই সিদ্ধান্তই স্থির হলো অল্প কথায়। লালমিয়াকে ইতিমধ্যেই তুলে আনলো মজু। এক এক জন এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তোড়জোরে সকলেই প্রস্তুত হতে লাগলো। স্থির হলো, সমজান আর মজু ঘুরবে লালমিয়াকে আগ্‌লে নিয়ে। এসব শুনে কি না কি বলার জন্যে লালমিয়া মুখ খুলতেই পড়িমরি অবস্থায় ছুটে এলো হারু সাতাল। সে লাল মিয়াদের দেখেই চীৎকার করে বলে উঠলো-" হেই বাবা! তু আদমী ছোব্ ইখানে অচিস্ বটেক! সারা দুনিয়া হামি টুঁর টাঁর করি হয় রান! দিনরাত হামি কোতো গেরামে গেইচি, কোতো জনরে কইঁচি, কেহু তুহারে

www.pathagar.com

ছন্ধান দিবার পারলেক লাই।"

হারুকে দেখে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সিপাইদের খবরটবর আনছে হয়তো ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েও উঠলো। অনেক দিনপর লাল মিয়ার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করলো-" আরে! মোহন্ত তুমি! কি খবর?"

হারু সাতাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললো- "উ বদ্ মায়েব লায়েব পরীবানুরে চুরি করি লেই গেঁইচে। উ বজ্জাত আদমী পরীবানুরে উঠাই লই গেইচে বটেক!"
শুনে চমকে উঠলো সকলে। বললো-" সে কি!"

হারু বললো- "উর বেটা হুকম উদ্দীন ছোব্ কুতা ফাঁছ করি দেইচে। হুকুমউদ্দীন কইঁচে, উ ছয়তান লায়েব পরীবানুরে আখুন মাঝ গেরামে লই গেইচে। উখানেই উ পরীরে বিহা করবেক বটে!"

দাউ দাউ করে আগুন ধরলো সকলেরই মাথায়। জ্বলে উঠলো চোখ। লাল মিয়া অবিরাম ছটফট করতে লাগলো। সমজান আলী বললো-" কি বললে? মাঝ গাঁয়ে
- হুঁ। উ গেরামেই বটেক।
- মাঝগাঁ তো এখান থেকে দূরে নয়! নিকটেই! দুপুরের মধ্যেই যাওয়া যাবে মাঝ গাঁয়ে।
- হুঁ বাবু। তু আদমী ছোব জলদি জলদি চলি যা উ মাঝ গাঁয়ে। পরীবানুরে বাঁচাই আন বটেক। হামি যাই, জমিন্দার বাবুরে ছোব্কুতা শুনাই দি আখুন।

লাল মিয়ার চেহারা দেখে কেঁদে ফেললো হারু সাঁতাল। চোখ মুছতে মুছতে সে রওনা হলো বিল বাথানের উদ্দেশ্যে। কাল বিলম্ব না করে এরা সবাই ছুটে চললো মাঝগাঁয়ের দিকে।

[একুশ]

অঝরে পানি ঝরছে পরীবানুর চোখেও। সেই যে গরুর গাড়ীতে শুরু হয়েছে কান্না, আর তা থামেনি। লালমিয়া নিজের হাতে ঠেলে দিলো গাড়ী, গাড়ীর মধ্যে সে অবিরাম মাথা কুট্লো প্রাণপণে, আওয়াজ দিলো মর্মভেদী- তবু লাল মিয়া তার কিছুই বুঝতে পারলো না! নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয় ছাড়া এমন কখনও হয়? মুক্তির আর আশা তার কোথায়? কাজেই তার কান্না আর বাগ মানছে না কিছুতেই।

মাঝগাঁয়ের কাচারীবাড়ী জনবসতির একপাশে। বেশ খানিকটা ফাঁকে। বনবাদারে ঘেরা এক পুরান আমলের কাচারী বাড়ী। মোঘল আমলের ঘর। অনেক তার প্রকোষ্ঠ। এর একপাশের এক প্রকোষ্ঠে এক ফেরারী লোকের বাস। অনেক অকাম কুকাম করে সে ত্যাগ করেছে স্ব-এলাকা। স্থান নিয়েছে এখানে। প্রায় বছর খানেক ধরে সে এখানেই বাস করছে বউ বাচ্চা নিয়ে। বদমেজাজী মানুষ। নেশাভাঙ্গও দস্তুর মতো করে। দু'চারজন বদচরিত্রের লোকই শুধু মাঝে মধ্যে তার বাড়ীতে আসে। দোস্তী করে, ফূর্তি করে, নেশা ক'রে গোলমাল করে। আশ পাশের অন্য কেউই তার

www.pathagar.com

বাড়ীতে যায় না। তার সাথে মেশেনা। এ দিকের পথ ঘাটও কেউ মাড়ায় না।

এক সাঙ্গা'তের মাধ্যমে এই লোককেই হাত করেছেন মিয়াজান মিয়া। একে হাত করেই তিনি পরীবানুকে এখানে এনে তুলেছেন। রেখেছেন এই কাচারী ঘরের দুর্গম এক প্রকোষ্ঠে।

পরীবানুকে পোষ মানানোর আশাটা এখন ছেড়ে দিয়েছেন মিয়াজান মিয়া। তার কান্না দেখেই তার মনের গতি আঁচ করেছেন তিনি। বুঝে নিয়েছেন, এ কখনও পোষ মানার নয়। এসে অবধি কাঁদতেই আছে পরীবানু। এক মূহুর্তের জন্যেও তার চোখের পাতা শুকায়নি। তাকে নানাভাবেই বুঝিয়েছেন মিয়াজান মিয়া। ফুস্‌লিয়েছেন, ধমকিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুতেই। কান্না ছাড়া একটা কথাও মুখ দিয়ে তার বেরোয়নি।

তাই, আপাততঃ রেহাই দিয়ে ফাঁকে আছেন নায়েব। কান্নাটা তার থামলেই তিনি শেষ চেষ্টা করবেন। কাজ না হলে জোর করেই বিয়ে করবেন তাকে। সম্মতি সে দিক না দিক, কবুল সে করুক না করুক, তিনিই যে তার বিবাহিত স্বামী, এটা তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই একতরফাভাবে বিয়ের কাজটা সেরে নেবেন আগে। তারপর, স্বামীর হকটাও তিনি আদায় করবেন জোর করেই। ইজ্জত হানীর পর উদ্ধত ফণা তার মুজে আসবে আপ্‌সে আপ্। আর কোন পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে স্বামী বলে মানতেই হবে নায়েবকে। প্রথম প্রথম না মানলেও, শেষ পর্যন্ত এই পথেই আসতে হবে তাকে। নিতান্তই না এলে তো পরিণাম তার আছেই। নরম পথে কাজ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই দেখে এই চরম পথই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন নায়েব। তরফদারের জমিদারীটা পাওয়ার তার এইটেই শেষ চেষ্টা।

আষাঢ় মাসের শেষের দিক। বান ডেকেছে বিপুল বেগে। উদ্দাম জলস্রোত পাক খেয়ে খেয়ে ছুটছে উন্মত্ত অবস্থায়। নদীনালা ঢেলে পড়ছে চলন বিলের বুকে। ভরে উঠছে বিল। ডুবে যাচ্ছে মাঠ। সাপ ব্যাঙ্গ কীট পতঙ্গ ক্রমে ক্রমে সরে আসছে লোকালয়ের দিকে। ভিড় করছে জনবসতির আশেপাশে। হরেক রকম অসংখ্য সাপের ভূমি চলন বিল। ঢোড়া, বোড়া, আলাদ, গোখরো- বেগুমার ছড়িয়ে থাকে চলন বিলের মাঠে ক্ষেতে। বর্ষার আগমনে লোকালয়ে উঠে আসছে তারা। বৃদ্ধি পেয়েছে সাপখোপের উৎপাত। স্বর্পদংশন লেগেই আছে হেথা হোথা। মরছে কেউ দংশনের পর। কেউ বাঁচছে ওঝা-কোবজের চেষ্টায় আর মা মনসার কৃপায়। এইটেই জনগণের বিশ্বাস। বিষঝাড়া মন্তরে হাঁক মাঝে মধ্যেই ভেসে আসছে এ দিক সেদিক থেকেঃ "ওমা পদ্মা, কৃপা করে সেবক রক্ষে কর।" শিষ্য সাগরেদ নিয়ে ধূয়া গেয়ে বিষ নামাচ্ছে ওঝারা। মা মনসার মনোরঞ্জনে মনসা পূজার হিড়িক পড়েছে এখন। মনসা মঙ্গলের আসর বসছে হিন্দু বস্তির পাড়ায় পাড়ায়। সর্পাঘাতের বড় চিকিৎসা মনসার নামে মানত করা। ওঝা- কোবরেজ মায়ের কৃপার বাহন মাত্র। তাই, কোনরুগী বেঁচে উঠলেই মানত পালনের পালা আসে। ভক্তি ভরে পূজা হয় মা মনসার। যারা পূজো-আচ্চায় যায় না, তারা আসর বসায় পদ্ম পুরাণের।

মাঝগাঁয়ের বিনোদপাল ধনাঢ্য লোক। তার বাড়ীতে শুরু হয়েছে মনসা পূজা।

www.pathagar.com

মায়ের কৃপায় দুদিন আগে বেঁচে গেছে তার ছেলে। জাত কেউটের ছোবল খেয়েও বেঁচে উঠেছে সে। বিনোদ পালের মানতটা গ্রহণ করেছেন দেবী। পূজোর সাথে দুই আসর পদ্মপুরান গানের মানত। শুরু হয়েছে পূজা। গানের দলও বায়না করাই ছিল। কিন্তু ঠিক কাজের সময় ডুবিয়ে দিয়েছে গানের দল। বেশী পয়সার বায়না পেয়ে তারা চলে গেছে অন্যত্র। শুনে বাজ পড়েছে বিনোদ পালের মাথায়। সে হন্যে হয়ে খুজে ফিরছে গানের দল। একটা নড়বড়ে দল আছে পাশের গাঁয়ে। নিরুপায় বিনোদপাল তাদের খোঁজে যেতেই পথের মধ্যে দেখতে পেলো লালমিয়াদের। সাথে তাদের গানের দলের সাজ সরঞ্জাম দেখেই সে ছুটে গেল তাদের কাছে। পদ্মপুরান গানের দল অল্পলোকের দল। এত লোক দেখে সে ঘাবড়েই গেল প্রথমে। তবু সাহসের উপর ভর করে সে কথা বললো তাদের সাথে। জানতে চাইলো-তারা গানের দল কিনা, পদ্মপুরান গান তাদের জানা আছে কিনা এবং জানা থাকলে আজকেই তারা আসর দিতে রাজী আছে কিনা।

কোন গানই নাজানা নেই লাল মিয়া বা তার সঙ্গীদের। বছির তো আবার এই পদ্মপুরান গানের পাকা ওস্তাদ একটা। কিন্তু গান বাজনার মানসিকতা আর তাদের ছিলনা। তাই প্রথমে তারা অস্বীকার করতেই চাইলো। কিন্তু গাঁ'টার নাম শুনে তারা শেষ অবধি ভেবে দেখলো, এই আমন্ত্রণের সদ্ব্যবহার করাই তাদের উচিত। মাঝগাঁ খুব বড় গাঁ কয়েকটা তার পাড়া। এত লোক হুড়মুড় করে গিয়ে খোঁজ করবে কোন পাড়ায়। সন্ধান নেবে কার কাছে? আর নিজেদের পরিচয়ই বা দেবে কি? এ ছাড়া, বেলা প্রায় দুপুর তখন। আহার আশ্রয়ের প্রয়োজনটাও আছে। ভেবে চিন্তে বিনোদ পালের আমন্ত্রণই গ্রহণ করলো তারা। চলে এলো বিনোদ পালের বাড়ীতে।

পাতিল পোড়ানো বিরাটকায় পুনের ঘরের মধ্যে লাল মিয়াদের স্থান দিলো বিনোদ পাল। চিড়েগুড় আর দই দিয়ে অতিথি সৎকার করে, বিকেল বেলাই গানের আসর দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে, বিনোদ পাল চলে গেল পূজোর যোগান দিতে।

উপযুক্ত প্রমানাদি সংগ্রহ করার পর তরফদারের কাছে তুলে ধরলো আবেদ আলী। তরফদারের মনেও এমন একটা সন্দেহ ইদানিং উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো। মিয়াজান মিয়ার বিশ্বাস্ততার অনেক কিছু ঘাটাতি ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে তাঁর। মিয়াজান মিয়ার আচরণেও কেমন একটা ছন্দপতন ইদানিং লক্ষ্য করছেন তিনি। পরীবানুর সন্ধান কল্পে তার মাত্রাধিক ছুটোছুটি আর সীমাহীন উৎকণ্ঠা সামঞ্জস্যতা ছাড়ায়ে গেছে একেবারেই। এসব দেখে তরফদার ক্রমেই চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' এমন একটা অনুভূতি অন্তরে তাঁর মাথা চাড়া দিচ্ছিল। তবু, এতটা সম্ভব হয় কি করে, এটা ভেবেই অতিকষ্টে চুপচাপ ছিলেন তিনি। আজ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেয়ে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন তরফদার সাহেব। এর উপযুক্ত প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন গোরা সেপাইদের কাছে। আসল ডাকাত মিয়াজান মিয়া, সব অপরাধ তার, তারই সাজা প্রয়োজন-এসব কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সিপাইদের লেলিয়ে দিলেন মাঝগাঁয়ে। অতঃপর ফিরে এসে বারোমাল্লার পান্‌শি নিয়ে নিজেও তিনি রওনা হলেন মাঝগাঁয়ের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

[বাইশ]

বিকেলবেলা দুই দলে ভাগ হলো লাল মিয়ার সঙ্গীরা। বছির সহ সাত আটজন গানের জন্যে রয়ে গেল বিনোদ পালের বাড়ীতে। অবশিষ্ট সকলেই পরীবানুর সন্ধান কল্পে সন্তর্পনে ছড়িয়ে পড়লো মাঝগাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায়। লালমিয়াও বেরিয়ে এলো এদের সাথে। সমজান আলীর সঙ্গেই সে ঘুরতে লাগলো আপাততঃ

বিনোদপালের পূজো আঙ্গিনায় আসর বসলো খানিক পরেই। পদ্মপুরান গানের আসর। বছিরই আজ গায়ক। পদ্মপুরান গান একটা সাদামাটা বৈঠকী গান। অতি অল্প আয়োজনেই যখন তখন বসানো যায় পদ্মপুরাণ গানের আসর। কবি গানের মতোই পয়ার মিলিয়ে গাইতে হয় এই গান। এ গানও চলন বিলের এক আট পৌরে প্রিয় গান। পূজামানত ছাড়াও চলন বিলের গ্রামগঞ্জে যখন তখন আসর বসতো এ গানের। সাপের দেবী মনসার গুণ কীর্তনের গান। এই মনসার অপর নাম পদ্মা। এই নামের ভিত্তিতেই কালক্রমে এই গান পদ্মপুরান গান নামে পরিচিত হয়েছে। ভাসানযাত্রা গানেরই অপভ্রংশ এটা। চাঁদ্ সওদাগর পূজো দেয় না মনসার বা পদ্মার। চাঁদের হাতের পূজো নেয়ার জিদেই তার ছয় ছয়টি পুত্রসহ চাঁদের সপ্তডিঙ্গী মধুকর কালীদহে ডুবিয়ে দিয়েছে মনসা। পূজো দিতে বাধ্য করার জন্যেই চাঁদের শেষ সন্তান লক্ষীন্দরের প্রাণ নাশে প্রবৃত্ত হয় মনসা। সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটায় লক্ষীন্দরের। লক্ষীন্দরের লাশ সহ ভেসে ভেসে দেবরাজ্যে হাজির হয় লক্ষীন্দর-পত্নীবেহুলা। শেষ পর্যন্ত দেবরাজের নির্দেশে অনিচ্ছা সত্বেও মনসার বা পদ্মার পূজো দেয় চাঁদ সওদাগর এবং বিনিময়ে ফিরে পায় তার সন্তানদের।

এই নিয়ে পদ্মপুরান গান। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পালা শুরু করেছে বছির। নাগনাগিনীদের লোহার বাসরে প্রেরণ করার পর্ব। হেঁকে হেঁকে পয়ার গাইছে সে। ধূয়া ধরছে সঙ্গীরাঃ-

বছির ঃ "আরে ও-
নাগ সাজিলোরে-
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-
বছির ঃ নাগ নাগ বলিয়া পদ্মা করিল স্মরণ-
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ কালীদহে নড়ে উঠে নাগের সিংহাসন।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-
বছির ঃ বড় বড় নাগ আর লোদা লোদা পেট
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ চাঁদের কথা শুনে সবাই মাথা করে হেট্।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ নাচিতে নাচিতে ঢোঁড়া করিল গমন-

www.pathagar.com

সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ পদ্মাদেবীর কাছে গিয়ে দিলো দরশন।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ চৌদ্দ তোলা বিষ পদ্মা ঢোড়ার মুখে দিলো।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-
বছির ঃ নাচিতে নাচিতে ঢোঁড়া তখনই চলিল।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ আষাঢ় শ্রাবণে কৈল ইন্দ্র বরিষণ-
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ বাঁধাল বাঁধিয়া চাঁড়াল পেতেছে খোল্‌ষ্যান্।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ মৎস দেখি ঢোঁড়ানাগের প্রাণ নাইকো ধড়ে-
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ চৌদ্দ তোলা বিষ ঢোঁড়া রাখিল গোবরে।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ হংসবাহনে পদ্মা দেখে নিরখিয়া-
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।
বছির ঃ ঢোঁড়া নাগটি মারা গেল খোল্‌ষ্যানে পড়িয়া।
সঙ্গীরা ঃ নাগ সাজিলোরে-।"

জমে উঠেছে গান। এমন সময় হাজির হলো ময়জুদ্দীন মজু। তাকে দেখেই থেমে গেল বছির। অন্য একজন তার জায়গায় পয়ার গাইতে লাগলো। চলতে লাগলো গান। বছির ও মজু বসে নীচুগলায় শুরু করলো আলাপ। বছির বললো-" খবর কি?"

মজু বললো-"খবর খারাপ। সমজানের সাথে হাঁটতে হাঁটতে ওস্তাদ তার খেয়াল মতো কোন দিকে চলে গেছে, এখন আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছেনা।"

- সে কি!

- পূর্ব দিকে যেতে নাকি এখানকার দু'একজন দেখেছে। কিন্তু পাগল মানুষতো ! পূর্ব দিক যেতে যেতে আবার ঘুরে কোন দিকে যায় তার ঠিক কি?

- তাই তো! এ যে এক বিপদে আর এক বিপদ হলো!

- বিপদ নয়? পরীবানুকে নায়েব যখন এই গাঁয়েই এনেছে, তখন তার দলবলও এই গাঁয়েই আছে। তাদের মুখোমুখী পড়লে তো বিপদ একটা হতেই পারে।

- তাহলে?

- ওটা আমরা দেখছি। এখন আরো কিছু লোক দাও আর তোমরাও সজাগ থেকো। এখন আর একা একা খোঁজ করা যাচ্ছে না। দল বেঁধে খোঁজ করতে হচ্ছে। সমজান ভাই একদল নিয়ে পূর্ব পাড়ায় ছুটেছে। বাহার আর একদল নিয়ে দক্ষিণ পাড়া হয়ে পূর্ব পাড়ায় ওদের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু আমরা মোটে তিনজন।

www.pathagar.com

আরো দু'তিনজন ছাড়া ঐ বদমায়েশদের সামনে পড়লে বেকায়দা হবে খুব।

আসর থেকে তৎক্ষণাৎ আরো দু'তিনজনকে তুলে দিলো বছির। বললো-"তেমন আভাস পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দেবে কাউকে দিয়ে।"

এদের নিয়ে বেরিয়ে গেল মজু। অবশিষ্ট লোক নিয়েই বছির উদ্দীন আসর চালাতে লাগলো।

আবার অশ্রুর বান ডেকেছে পরীবানুর দুই চোখে। মাঝে কিঞ্চিৎ স্মিমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু মিয়াজান মিয়ার দৌরাত্মে কান্নাটা তার বিপুল বেগে বৃদ্ধি পেয়েছে আবার। এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন মিয়াজান মিয়া। কান্নাটা তার স্তিমিত হওয়া দেখে তিনি খানিক আগেই এসেছিলেন শেষ চেষ্টা করার জন্যে। এসেই তিনি সরাসরি বিয়ে কথা পাড়েন। বিয়েতে মত না দিলে সবাই মিলে আজকেই তার ইজ্জতের উপর হামলা করার হুমকি দেন। হাত পা বেঁধে নদীতে তাকে ভাসিয়ে দেবেন- এ কথাও বলেন। কিন্তু ফল হয়নি কিছুতেই। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজকেও তার তরফ থেকে তিনি কোন উত্তরই আদায় করতে পারেননি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তাকে বিয়ের জন্যে তৈরী থাকার হুকুম দিয়ে এই মাত্র বেরিয়ে গেলন নায়েব। জানিয়ে গেলেন- মোল্লা ডাকতে যাচ্ছেন তিনি। মোল্লা এনে বিয়ের কাজটা সেরে নেবেন এখনই। এখানেই এবং এই ঘরেই বাসর উদ্‌যাপন করবেন তিনি আজ রাতেই।

জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দুই চোখের পানি ফেলছে পরীবানু। এ জীবনে চাওয়া-পাওয়ার শেষ মূহুর্ত তার এখন। নায়েবের হাতে ইজ্জত দেয়ার চেয়ে মৃত্যুই তার শতগুণে কাম্য। সেই মৃত্যুর জন্যেই তৈরী হয়েছে পরীবানু। নায়েব আবার আসার আগেই সব জ্বালা জুড়াতে সে স্থির প্রতিজ্ঞ। বড় বাগানের মন্দির থেকে আনা সেই বিষফলটি হাতে নিয়ে এ জীবনের শেষ কান্না কেঁদে নিচ্ছে সে। বড় কৌশল করে বিষফলটি সঙ্গেই সে রেখেছিল। এইটিই তার ইজ্জতের রক্ষে-কবজ এখন। কত সাধই ছিল তার এই অন্তরে। জমিদারের মেয়ে সে। কত আশাই মনে মনে পোষণ করেছে আজীবন! লাল মিয়াকে ঘিরে কত মধুর স্বপ্নই না দেখেছে সে দিন রাত! সেই সব সাধ-স্বপন কিভাবে আজ ধুলিস্মাৎ হয়ে যাচ্ছে নিঃশেষে!

লাল মিয়ার কথা মনে আসতেই হু-হু করে উঠলো তার অন্তর। জীবনের এই শেষ সময়ে তাকে এক নজর দেখার জন্যে অস্থির হলো আত্মা। সে ছটফট করে উঠে দাঁড়িয়ে উম্মাদের মতো এদিক ওদিক চাইতে লাগলো অকারণেই। তার কক্ষটার পেছন দিকের জানালাটা বাইরে থেকে আটকানো। কাঠের ডাঁশার উপর কাঁটা মেরে বন্ধ করা। সেই জানালাতে সে উম্মাদের মতো মাথা কুটলো কিছুক্ষণ। হতাশ হয়ে ফিরে আসতেই কিসের একটা শব্দ হলো বাইরে। চমকে উঠলো পরীবানু। মিয়াজান মিয়া আসছে ভেবে বিমিল্লাহ বলে তৎক্ষণাৎ সেই বিষফলের অর্দ্ধেকটাই সে গিলে ফেললো এক কামড়ে। আর অর্ধেকটা হাতে নিয়ে সে থপ্ করে বসে পড়লো মেঝেতে। সে বুঝে নিলো আয়ু তার অতি সংকীর্ণ এখন। লাল মিয়ার স্মরণে তাই বিলাপ করে গাইতে লাগলো শেষ বারের মতোঃ

" আরে ও, ও - ও সোনা বন্ধুরে

www.pathagar.com

পেলাম না আর বন্ধুর দেখা আমার নিদান কালে।
মনে ছিল বড়ই আশা -, আ- আ
বন্ধুর সাথে বাঁধবো বাসা।
আরে ও, ও - ও সোনা বন্ধুরে,
পেলাম না আর বন্ধুর দেখা আমার নিদান কালে।
কি সাঁতে বাড়ালাম পথে, এ-এ-
পড়িলাম দুষমনের হাতে।
আরে ও , ও- ও সোনা বন্ধুরে,
পেলাম না আর বন্ধুর দেখা আমার নিদান কালে।

---"

গানের মধ্যেই শুরু হলো বিষের ক্রিয়া। ঘুরে উঠলো মাথা। জ্বলে উঠলো পেট। ঠিক এমনই সময় তার কানে পড়লো লাল মিয়ার উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠ- "পরীবানু-পরীবানু-পরী-"

এই কাচারী বাড়ী মাঝ গাঁয়ের পুব পাড়াতেই। একা একা হাঁটতে হাঁটতে নিজ খেয়ালেই এই পূর্ব পাড়ায় চলে আসে লাল মিয়া। লোক বসতি এড়িয়ে নিজ খেয়ালেই ঘুরতে থাকে বন বাদারের কোল ঘেঁষে। তাকে পেয়ে বসেছে বড় বাগানের মন্দির। বনজঙ্গলে-ঘেরা সেই মন্দিরই সে খুঁজে ফিরছে খেয়ালে। পূর্ব পাড়াতে এসেই সে দেখতে পায় এই কাচারী বাড়ীর বনবাদার। বন বাদারের কাছে আসতেই দেখতে পায় এই পতিত বাড়ী। জঙ্গল ঠেলে এগুতেই সে শুনতে পায় কান্নার শব্দ। আর কিছুদূর এগুতেই সে শুনতে পায় কান্নার শব্দ। আর কিছুদূর এগুতেই সে চিনতে পারে পরীর গলা। ওখান থেকেই সে চীৎকার করে আওয়াজ দেয়-" পরীবানু -পরীবানু-পরী-"

সৌভাগ্যক্রমে ঐ বাড়ী তখন পুরুষমানুষ কেউ ছিল না। পরীবানুকে বিয়ে করার আয়োজনে- তাকে নিয়ে বাসর করার আনন্দে- ভাড়াটিয়াদের এক একজনকে এক একাজে পাঠিয়েছিলেন নায়েব। অবশ্য তা হাতের কাছেই। নিজেও তিনি ফাঁকে এসে ব্যস্তছিলেন কাজে। দুয়ারের পাহারাদারও দরজায় তালা ঝুলিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জঙ্গলে যায় বদনা হাতে। ঠিক এই সময়ই আওয়াজ দিলো লালমিয়া। লাল মিয়ার কণ্ঠ শুনেই পরীবানু চীৎকার দিলো প্রাণপণে-"লাল মিয়া-লাল- আমি এখানে! এই বন্ধ ঘরে-"!

ইতিমধ্যেই ঐ কক্ষটির পেছনের জানালার কাছে পৌঁছে গেছে লালমিয়া। পরীবানুর সাড়া পেয়েই তার দেহে এলো মত্ত হস্তীর বল। সে মড় মড় করে উপড়ে ফেললো কাঠের ঐ ডাশাটা। জট্‌কা মেরে খুলে ফেললো জানালা। গজ বিহীন জানালা। সে এক লাফে প্রবেশ করলো কক্ষের মধ্যে। পরীবানু চীৎকার দিয়েই লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। ঐ অবস্থায় পড়ে থেকে সে কাত্‌রাচ্ছিলো তখন। লাল মিয়া ছুটে গিয়ে তাকে দুই- হাতে তুলে নিলো কোলের উপর। ব্যস্ত কণ্ঠে বললো- "পরী, আমার

www.pathagar.com

পরীবানু! কি হয়েছে? তুমি এভাবে পড়ে আছো কেন?"

পরীবানু কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে বললো-" লাল! প্রিয়তম! তুমি এসেছো? আহ! কি শান্তি!"

- পরীবানু।
- সেই এলেই তো আর একটু আগে এলে না কেন? আমি যে- আমি যে-
- তুমি? তুমি কি?
- আমি বিষ খেয়েছি।

লাল মিয়া উম্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলো। বললো- "সে কি!"

পরীবানু অতিকষ্টে বললো, "ইজ্জতরক্ষের জন্যেই আমি বিষফল খেয়েছি। ঐ বদমায়েশ নায়েবের হাত থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্যেই আমি- আহ! আমার শেষ সময় উপস্থিত! চোখ মুখ আঁধার হয়ে আসছে। পেটের মধ্যে অসহ্যযন্ত্রণা! তুমি- তুমি আমার কাছেই থেকো-।"

দিশে হারা লাল মিয়া পরীবানুর শুশ্রূষার জন্যে কক্ষের মধ্যে পানির খোঁজ করলো। এক ফোঁটা পানি সেখানে না পেয়ে পরীবানুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু বাইরে থেকে দরজাবন্ধ। অগত্যা সে পরীবানুকে এক হাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ঐ জানালা দিয়েই লাফিয়ে পড়লো বাইরে। পড়া সাথেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একটু খানি। তখনই আবার উঠে পরীবানুকে দুইহাতে তুলে নিয়ে সে পানির খোঁজে ছুটতে লাগলো বনজঙ্গল ভেঙ্গে। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সে মাঠের মধ্যে দেখতে পেলো নদী। পরীকে নিয়ে ঐ নদীর দিকেই ছুটতে লাগলো লাল মিয়া।

কাচারী বাড়ীর অপর কক্ষে বসবাসকারী ফেরারীটার বউ ছিল বাড়ীতে। লাল মিয়া জানালা ভাঙ্গা শুরু করলেই সে চীৎকার করে ডাকতে থাকে সবাইকে। খানিক পরেই চীৎকার শুনে ছুটে এলেন মিয়াজান মিয়া। ছুটে এলো পাহারাদার ও ভাড়াটিয়ারাও। ছুটে এলো ফেরারীটাও। পরীবানুকে কোলে নিয়ে লাল মিয়া তখন খোলা মাঠে। দেখতে পেয়েই আগুন ধরলো মিয়াজান মিয়ার মাথায়। ভাড়াটিয়াদের হাঁক দিয়ে তিনি লাঠি হাতে ধাওয়া করলেন লাল মিয়াকে। ভাড়াটিয়া গুন্ডারাও লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লো মিয়াজান মিয়ার সাথে সাথেই। মুক্ত মাঠের ঘটনা। আশপাশের অনেক লোকই দেখতে পেলো স্পষ্টই। চিনতে পারলো ধাওয়াকারী বদমায়েশদের অনেককেই। এতটা তারা সহ্য করতে পারলো না। চারদিক থেকে বেরিয়ে পড়লো তারাও। ইতিমধ্যেই পূর্ব পাড়ায় হাজির হলো সমজান বাহার মজুর তিনজনের তিনদল। দেখতে পেয়েই মার মার করে ধেয়ে এলো তারা। সবাই একটু দূরে। মিয়াজান ও তাঁর গুন্ডারা লাল মিয়ার খুব নিকটে।

নদীর প্রায় কাছাকাছি লাল মিয়া এসে পৌছুতেই মিয়াজান মিয়া আঘাত করার চেষ্টা করলেন লাল মিয়াকে। পরীবানুকে নিয়েই এক পলকে ঘুরে দাঁড়ালো লালমিয়া লাফিয়ে উঠে সজোরে সে লাথি মারলো মিয়াজান মিয়ার পাঁজরে। কঁকিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়লেন মিয়াজান। দাঁত কপাটি লেগে তিনি পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছুটতে লাগলো লাল মিয়া। জ্ঞান ফিরতেই মিযাজান মিয়া উঠে দাঁড়ালেন আবার। লাল মিয়াকে ধাওয়া করলেন

www.pathagar.com

টলতে টলতে। পেছনের দিকে নজর নেই তখন মিয়াজান মিয়ার। নজর নেই তার গুন্ডাদেরও। লাল মিয়াও তখন পানির খোঁজে দিশেহারা! ছুটতে ছুটতে নদীর তীরে উঠে পড়লো লাল মিয়া। নীচেই ভরানদী। খাড়া নদীর পাড়। পানি দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। পরীবানুকে কোলে নিয়ে নীচু হয়ে সাবধানে পাড়ের নীচে নামতেই পেছন থেকে অতর্কিতে ভাড়াটিয়ারা লাঠি দিয়ে সজোরে বাড়ি মারলো লাল মিয়ার মাথায়। পর পর বাড়ি মারলো কয়েকজন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো লাল মিয়া। পরীবানুকে বুকে নিয়েই সে নদীর মধ্যে পড়ে গেল সশব্দে। তলিয়ে গেল অথৈ পানির তলে।

ইতি মধ্যেই চারদিক থেকে ছুটে এলো লাল মিয়ার সঙ্গীরা। ছুটে এলো আশেপাশের জনতা। সংখ্যায় তারা অগনিত। এই পৈশাচিক কান্ড দেখে আগুন ধরলো প্রত্যেক লোকের মাথায় তারা মিয়াজান ও তার ভাড়াটিয়াদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো সঙ্গে সঙ্গে। শুরু করলো গনপিটুনী। লাল মিয়ার সঙ্গীরা হায় হায় রবে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। উদ্ভ্রান্তের মতো খুঁজতে লাগলো লাল মিয়া আর পরীবানুকে।

আষাঢ় মাসের ভরানদী। ভয়ংকরী ও খর স্রোতা। পাক খেয়ে খেয়ে স্রোত ছুটছে একুল ও কুল ভেঙ্গে। স্রোতের টানে চাপ চাপ ধ্বসে পড়ছে মাটি। এই প্রমত্তা নদীর তলে কোথায় যে হারিয়ে গেল লাল মিয়া আর পরীবানু- সবাই মিলে ডুবুরীর মতো খুঁজেও সে সন্ধান তারা পেলোনা।

ফুরিয়ে এলো বেলা। বার মাল্লার পানশী নিয়ে তরফদার সাহেব হাজির হলেন এই সময়। শুনেই তিনি সশব্দে আর্তনাদ করে উঠলেন। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলেন পানশীর উপর। খবর শুনে মাঝিমাল্লারাও ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। ঝাঁপিয়ে পড়লো আশ-পাশের লোকজনও। জেলে এনে জাল ফেলেও খোঁজা হলো দীর্ঘ সময়। খোঁজা হলো ঘটনাস্থল ও ভাটি-স্রোতের দীর্ঘ এলাকা জুড়ে। কিন্তু নিষ্ফল হলো সবই। লাল মিয়া বা পরীবানু কাউকেই পাওয়া গেল না।

সূর্য্যাস্তের মূহূর্তে হাজির হলো সিপাইরা। গণপিটুনীর ফলে তখন মাটির সাথে মিশে গেছে মিয়াজান ও তার ভাড়াটিয়াগুন্ডারা। ভেঙ্গে গেছে হাতপা। মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে চাপ চাপ রক্ত। আর করার কিছু নেই দেখে, মিয়াজান মিয়ার দুই পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল সিপাইরা। আধমরা মিয়াজান মিয়ার বিধ্বস্ত দেহ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে। বিশ-ত্রিশ হাত এগুতেই মিয়াজান মিয়ার ক্ষীণপ্রাণ বাতাসে মিলিয়ে গেল আপছে আপ। ফেরারীটার লাশ এনে উৎক্ষিপ্ত জনতা ফিকে দিলো ফেরারীটার বউ-বাচ্চার সামনে।

তরফদার সাহেব পানশী নিয়ে নদীর মধ্যেই ঘুরতে লাগলেন সারারাত। কুলে কুলে ঘুরতে লাগলো সঙ্গীসাথী সকলেই। মাঝে মাঝেই ডুবে ডুবে খুঁজতে লাগলো লাশদুটি।

পেরিয়ে গেল রাত। পরের দিন দুপুর বেলায় কে একজন খবর দিলো-ভাটির বাঁকে এক খালের মুখে জেলেদের বাঁধের সাথে লেগে আছে দুইটি লাশ। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুজনেরই কাঁচা বয়স।

খবর পেয়েই পানশী নিয়ে সবাই সেখানে ছুটলো। তখন খালের মুখে ভিড় জমেছে অগনিত মানুষের। লাশ দু'টি দেখছে আর হায় হায় করছে সকলেই।

www.pathagar.com

লাশের কাছে পানশী গিয়ে পৌঁছতেই তারা চিনতে পারলো লাশ দু'টি। লাল মিয়া আর পরীবানুর মৃতদেহই বটে। অঙ্গে অঙ্গে মিশে তারা শুয়ে আছে পানির উপর। এককে ফেলে অন্যে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। দেখতে পেয়েই ডুকরে উঠলো পানশী ভরা সকলেই। তাদের মর্ম- ভেদী আর্তনাদে আচ্ছন্ন হলো দশদিক। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো লালমিয়ার সঙ্গীরা। ঝাঁপিয়ে পড়লো মাল্লারা। তারা লাশ দুটি তুলে এনে পাশাপাশি শুইয়ে দিলো পানশীর উপর। লাশ দুটিকে ঘিরে নিদারুণ হাহুতাশে ভেঙ্গে পড়লো তারা। তরফদার সাহেব মুহূর্মুহু মুর্চ্ছা যেতে লাগলেন।

এক সাগর শোক নিয়ে ফিরে চললো তরফদারের পানশী। ভরা নদীর তীর ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো পানশীখানা। লাশ দুটিকে ঘিরে তখন পানশীর লোক পাথর। বাক হারিয়ে সকলেই বসে আছে চুপ চাপ। বসে আছে বিষন্ন বদনে।

এগিয়ে চলেছে পানশী। তাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একখানা বাইচখেলা ছিপ নৌকা। নৌকাবাইচের গান ধরেছে মাঝি। বৈঠামারার তালে তালে ধূয়া ধরছে তার সঙ্গীরাঃ

মাঝি ঃ "(আর-) ঐ দেখা যায় ট্যাকের মুড়া,
সঙ্গীরাঃ হাঁইয়ো মারো রে ও ভাইয়েরা।
মাঝি ঃ (আর-) লাগাও টান জুয়ান-বুড়া,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
মাঝি ঃ (আর-) চলন বিল আর কলম গাঁও,
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।
মাঝি ঃ (আর-) একটানে যায় সাধুর নাও।
সঙ্গীরা ঃ হাঁইয়ো মারোরে ও ভাইয়েরা।

লাল মিয়ার সঙ্গীরা সব সচকিত হয়ে সেই দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তাকালো তারা লাল মিয়ার লাশের দিকে। ছিপখানা অদৃশ্য হয়ে যেতেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো সকলেই। তাদের সাথে কাঁদতে লাগলো আকাশ বাতাস। কাঁদতে লাগলো জল স্রোত। সবকান্না এক হয়ে মিশে গেল লাল মিয়া আর পরীবানুর বেদনা বিধুর দীর্ঘ কান্নার সায়রে।

এই হত ভাগ্য যুবক-যুবতীর বঞ্চিত বেদনায় বিদীর্ন হলো বিলচলনের বুক! সেই কান্নায় আচ্ছন্ন হলো চলন বিলের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর! আজও এই চলন বিলের একান্তে কান রাখলে কানে আসে এক বেদনাসিক্ত সুর! বাতাস বয়ে আনে এক মর্মভেদী হাহুতাশ! জল স্রোতে উত্থিত হয় সুদূর অতীতের সেই বিরামহীন মর্মান্তিক বিলাপ!

চলন বিলের জল ধারায় জোড়ালাশ ভাসতে দেখলেই এ অঞ্চলের আপামর জন সাধারণ আজও আফছোস্ করে বলে- আহারে! ঠিক যেন লাল-পরী!

== সমাপ্ত ==

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

নাম ঃ শফীউদ্দীন সরদার

জন্ম ঃ ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা ঃ স্কুলপট্টি, পোঃ+জেলা- নাটোর, ফোন- ২৯০।

শিক্ষা ঃ ১৯৫০ সনে ম্যাট্রিকুলেশন।
অতঃপর- আই.এ.; বি.এ. (অনার্স);
এম. এ. (ইতিহাস); এম. এ.
(ইংরেজী); বি.এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন্‌এড্ (লন্ডন)।

কর্মজীবন ঃ প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

সখ ঃ প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও,
বাংলাদেশের নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্য ঃ উপন্যাস (ঐতিহাসিক)

১। বখতিয়ারের তলোয়ার - প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনারগাঁ - প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায় - প্রকাশিত
৪। বিদ্রোহী জাতক - প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ - প্রকাশিত
৬। রাজবিহঙ্গ - প্রকাশিত
৭। শেষ প্রহরী - প্রকাশিত
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা - প্রকাশিত
৯। বিপন্ন প্রহর - প্রকাশিত
১০। সূর্যাস্ত - প্রকাশিত
১১। পথ হারা পাখি - প্রকাশিত
১২। বৈরী বসতি - প্রকাশিত
১৩। অন্তরে প্রান্তরে - প্রকাশিত
১৪। দাবানল - প্রকাশিত
১৫। ঠিকানা - প্রকাশিত
১৬। বোহিনী নদীর তীরে - প্রকাশিত

উপন্যাস (সামাজিক)

১। শীত বসন্তের গীত - প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা - প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী - প্রকাশিত
৪। পাষানী - প্রকাশিত
৫। দুপুরের পর - প্রকাশিত
৬। রাজ্য ও রাজকন্যারা - প্রকাশিত

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com